কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫১
রকিব হাসান
ANIK
সেবা
প্রকাশনী
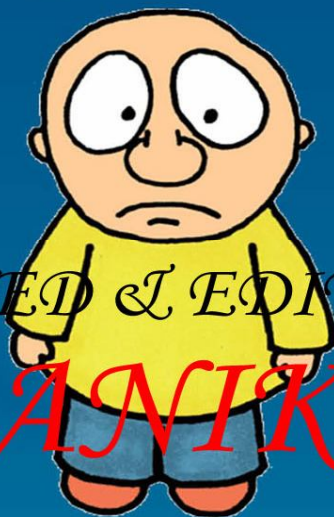
তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৫১

রকিব হাসান

ভলিউম-৫১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান
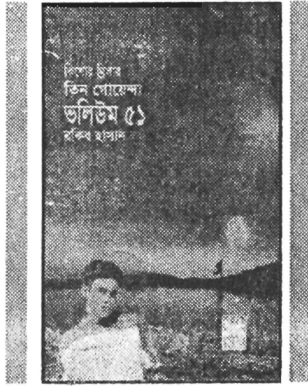
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1474-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০২
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-51
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

চৌষট্টি টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৬১/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৬২/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৬৪/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্ণদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্রাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুষ্ট মানব+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ছিন্নবেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনস্টোনে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ন গোয়েন্দা+[illegible]+পুতুল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য বন্দি+গোপন ডায়েরি)
তি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+জাল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২ (কদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৩ (খনিতে বিপদ+[illegible]-রহস্য+কিশোরের নোটবুক) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৮৪ (মৃত্যুগুহার বন্দি+বিখ্যাত জোকার+শুঁটকি রাজকুমার) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮৫ (গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৮৬ (পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি) ৪৮/-
তি. গো. ভ. ৮৭ (মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+অলিকা-রহস্য) ৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮৮ (পিছনে কে+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)
তি. গো. ভ. ৮৯ (বোম্বেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৯০ (হিমগিরিতে সাবধান+সাগরে শত্রু+খেপা জাদুকর) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৯১ (ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভুতুড়ে বাড়ি) ৪১/-

পেঁচার ডাক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

রবিনকে খবরটা দিল দুধওয়ালা। 'কাল রাতে মিস্টার হুবারের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, শুনেছ খবরটা?'

রবিনদের পাশের বাড়ির পরের বাড়িটা হপ্তা দুই আগে ভাড়া নিয়েছে কনি হুবার। একা থাকে।

'কি কি নিয়েছে?'

'জানা যায়নি। মিস্টার হুবার বাড়ি নেই।'

'কে বলল আপনাকে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রবিন। ওদের বাড়ির এত কাছে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, আর সে কিছুই জানে না!

'সকালে দুধ দিতে গিয়ে দেখি দরজা খোলা। একটা জানালা ভাঙা। মিস্টার হুবারের নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম। বেরোলেন না। হলঘরের দরজা দিয়ে উঁকি দিলাম। ভেতরে জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে আছে। সন্দেহ হলো। ঘরে ঢুকে তক্ষুণি পুলিসকে ফোন করলাম।'

'ওহ্! তারমানে ঝামেলা এসে দেখে চলে গেছে সব!' ওদের আগেই ফগর্যাম্পারকট এসে সূত্র খুঁজে নিয়ে চলে গেছে ভেবে হতাশ হয়ে পড়ল রবিন।

'হ্যাঁ। নোটবুক বের করে কি কি সব টোকাটুকি করল। ভাবসাব দেখে মনে হলো শার্লক হোমসের বাপ। আমাকে হুকুম দিল যাতে এ খবর কাউকে না বলি। ঝামেলাটা চিরকালই একটা হাঁদারাম। আমাকে ছাগল পেয়েছে আরকি। ওর কথায় আমি মুখ বন্ধ রাখি। আমার সব কাস্টোমারকে বলে দিয়েছি। যা পারে ও করুকগে এখন।'

'আপনি বাড়ির আশেপাশে কিছু দেখেছেন নাকি?'

'না। আশেপাশে ঘোরার সময়ই পাইনি। যখনই মনে হলো, বাড়িটাতে কিছু ঘটেছে, পুলিসকে ফোন করলাম। ভেতরে আমার মনে হয় কোন কিছুতে হাত দেয়া হয়নি। তোমরা তো গোয়েন্দাগিরি করো, নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি কিসের কথা বলছি।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

দুধওয়ালা চলে যাওয়ার পর আর দেরি করল না সে। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোরকে খবরটা দেয়ার জন্যে।

কিশোরও আগ্রহী হয়ে উঠল। দুজনে মিলে রওনা হলো মুসাদের বাড়িতে। না না, তিনজনে মিলে। টিটুও চলল কিশোরের সাইকেলের ঝুড়িতে সওয়ার হয়ে। বাড়ি থেকে মুসা আর ফারিহাকে ডেকে নিয়ে চলে এল ওরা কনি হুবারের বাড়িতে।

হুবার ফেরেনি।

কিশোর বলল, 'সূত্র খোঁজো সবাই। পায়ের ছাপ, পোড়া সিগারেটের গোড়া,

জানালার কাঁচে হাতের ছাপ—এ সব। যে যা পাবে নোটবুকে লিখে রাখবে।'

কিশোরকে ঘুরে আরেকদিকে রওনা হতে দেখে ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখব।'

জানালার পর্দা টানা। ভেতরে দেখা সম্ভব হলো না।

এক এক করে ছোট বাড়িটার জানালাগুলোয় উঁকি দিতে শুরু করল সে। কিন্তু একটা জানালা দিয়েও ভেতরে তাকানো গেল না।

সামনের দরজাটা বন্ধ। পেছনেরটাতেও তালা দেয়া।

পেছনের ভাঙা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। রান্নাঘরের জানালা। চোরই আসুক বা ডাকাত, এদিক দিয়েই ঢুকেছিল।

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পর্দাটা সরাল কিশোর। ঝড় বয়ে গেছে যেন ঘরের মধ্যে। ড্রেসার, টেবিলের প্রতিটি ড্রয়ার খুলে জিনিসপত্র মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আলমারিগুলো খোলা। ওগুলোর জিনিসও সব মাটিতে।

কিছু একটা খোঁজা হয়েছে।

কি জিনিস?

রান্নাঘর থেকে হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল না কিসের। কান পাতল সে। আবার শোনা গেল শব্দটা। ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মিআও! মিআও!' ডাকল চোখের মালিক।

'বেড়াল,' কিশোর বলল। 'কি ভয় পেয়েছে দেখো। পেটে মনে হচ্ছে খিদে। খাবার দেয়ার কেউ নেই। বেচারা!'

বাড়ির কোণ ঘুরে এগিয়ে এল অন্যরা। হাতে নোটবুক।

কিশোর বলল, 'ঘরের মধ্যে একটা বেড়ালের বাচ্চাকে ফেলে দরজা আটকে দিয়ে গেছে। কি করা যায়?'

'বের করে নিয়ে এসো,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ফারিহা।

'কি করে?' মুসার প্রশ্ন। 'সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ।'

'এই জানালাটা ভাঙা,' দেখাল কিশোর। 'রুমাল জড়িয়ে নিলে ভাঙা কাঁচের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। ছিটকানি খুলতে পারলে বের করে আনা যাবে বাচ্চাটাকে। এ ভাবেই জানালা খুলেছে চোর।'

'খোলো না তাহলে,' রবিন বলল। 'ঝামেলা মনে হয় এখন আর আসবে না।'

পকেট থেকে বড় একটা সাদা রুমাল বের করল কিশোর। আঙুলে শক্ত করে জড়াল। ভাঙা কাঁচের ফোকর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল হাতটা। ছিটকানিটা খুঁজে পেয়ে বলল, 'পেয়েছি।'

শার্সি খোলা এখন অতি সহজ। খুলে ফেলল ওটা।

চৌকাঠে উঠে বসল সে।

সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।

ধমক দিয়ে কিশোর বলল, 'এই, থামাও তো পাজিটাকে। ওর চিৎকারে কেউ কি হয়েছে দেখতে এলেই আর ঢুকতে পারব না।'

তাড়াতাড়ি সবাই মিলে চেষ্টা চালিয়ে চুপ করাল টিটুকে।

কিশোর ঢুকে পড়ল ভেতরে। বেড়ালের বাচ্চাটা আলমারির একটা তাকে বসে আছে জড়সড় হয়ে। সে এগোতেই আরও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই ভয়টা কেটে গেল যখন একবাটি দুধ এনে ওর সামনে রাখল কিশোর। ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে লপাত লপাত করে জিভ দিয়ে চেটে শেষ করে ফেলল দুধটা। তারপর পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করতে লাগল। কিন্তু যেই সে ধরতে গেল, ঘাবড়ে গেল আবার। এক দৌড়ে পালাল। ছুটে চলে গেল দরজা দিয়ে হলঘরে।

'আই, পুষি, পুষি। আয়, আয়,' ডাকল কিশোর।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'পালিয়েছে।'

'তাড়াতাড়ি ধরো না। কেউ চলে এলে মুশকিল হবে।'

'খুঁজে বের করতে হবে তো আগে ওটাকে। তারপর না ধরা।'

হলঘরে ঢুকল কিশোর। ওলটপালট হয়ে আছে জিনিসপত্র। কোট, জুতো, প্যান্ট, শার্ট এ সব জিনিস আলমারি আর একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার থেকে বের করে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে মেঝেতে। বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না। কোথায় যে গিয়ে লুকিয়েছে ওটা কে জানে। ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে লাগল সে।

নিচে তিনটে ঘর। ওপরে তিনটে। সব কটার জিনিসপত্রের একই অবস্থা। ফায়ারপ্লেসের নিচে কালি পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গেল যে-জিনিস খুঁজতে এসেছিল লোকটা, ওটার জন্যে চিমনির মধ্যেও ঢুকেছিল।

একটা বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই লাল জিনিসটা চোখে পড়ল ওর। তুলে নিল। দস্তানা। ছোটদের।

বিড়বিড় করল আনমনে, 'এখানে ছোট বাচ্চা এল কোত্থেকে? হুবার থাকে তো একা।'

সন্দেহ হলো—কোনও শিশুকে কিডন্যাপ করে এনে এখানে লুকিয়ে রাখেনি তো হুবার, যার খোঁজে এসেছিল লোকটা?

আপনমনেই মাথা নাড়ল আবার। না, যত ছোট শিশুই হোক, তাকে ড্রয়ার কিংবা চিমনিতে খুঁজবে না লোকটা।

ছোটদের আর কোন পোশাক আছে কিনা খুঁজতে লাগল কিশোর। কিছুই নেই। যা আছে সব বড়দের, পুরুষ মানুষের।

দস্তানাটা পকেটে রেখে দিল সে। সূত্র। এক জোড়ার একটা। আরেকটা গেল কোথায়?

ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল ওর কাছে। গতরাতে একটা শিশু ছিল এ বাড়িতে। মনে হয় তাড়াহুড়োয় কাপড় পরানো হয়েছে ওকে। একটা দস্তানা ভুলে পরানোই হয়নি। কিংবা ঠিকমত লাগেনি বলে খুলে পড়ে গেছে।

এই সময় কানে এল মুসার চাপা ডাক, 'কিশোর, জলদি বেরিয়ে এসো! ঝামেলা আসছে!'

দুই

কিশোর নিচতলায় নামার আগেই কানে এল ফগর‍্যাম্পারকটের ধমক, 'ঝামেলা! এই, তোমরা এখানে কি করছ? যাও, ভাগো!'

তারপর শুরু হলো টিটুর চিৎকার, হই-চই। মুচকি হাসল কিশোর। নিশ্চয় এখন ফগের গোড়ালির পেছনে লেগেছে টিটু।

কোনদিক দিয়ে বেরোনো যায় ভাবল কিশোর।

বাড়ির পেছন দিকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে ফগের, 'পুলিসের কাজে নাক গলাতে এসেছ তোমরা! আইনের বিরোধিতা করছ। ভাল চাও তো যাও এখান থেকে। উফ্, ঝামেলা!'

'কে বলল নাক গলাচ্ছি?' প্রতিবাদ করল রবিন। 'পড়শীর বাড়িতে চোর ঢুকেছে শুনলাম, দেখতে এসেছি। এতে নাক গলানোর কি দেখলেন?'

জবাব খুঁজে না পেয়ে খানিকক্ষণ আমতা আমতা করল ফগ। তারপর ধমকে উঠল, 'আবার কৈফিয়ত দেয়া হচ্ছে, না? জলদি সরাও ওই শয়তানটা কুত্তাটাকে! নইলে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব বলে দিলাম!'

নিশ্চয় গোড়ালি কামড়াতে চাইছে টিটু। ফগের চেহারা কি হয়েছে এখন কল্পনা করে হাসিতে পেট ফেটে যাবার অবস্থা হলো কিশোরের। অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। আবার ভাবল, বেরোবে কোন পথে? ও যে ঘরে ঢুকেছে এটা দেখাতে চায় না ফগকে। তাহলে পেয়ে বসবে সে। নাক গলানোর ছুতোয় ওকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

'তোমাদের বড় বিচ্ছুটা কোথায়?' আচমকা প্রশ্ন করল ফগ। এতক্ষণে খেয়াল করেছে কিশোর নেই ওখানে। নিজে নিজেই জবাব দিল, 'জ্বর নাকি? বাড়িতে পড়ে আছে? নিশ্চয় তাই। নইলে ওটারই তো আগে এসে এখানে হাজির হওয়ার কথা। সবার শেষে ধরল ওকে, তাই না? ভাল হয়েছে। ওরকম শয়তানদের বিছানায় পড়ে থাকাই উচিত। আচ্ছা শিক্ষা হয় তাহলে। এখন যাও সবাই এখান থেকে। ভাগো। নইলে বাড়িতে গিয়ে নালিশ করব। ঝামেলা!'

বাড়িতে নালিশ করার হুমকিটা কাজে লাগল। মায়ের বকা খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মুসার। রবিনেরও না। মানে মানে সরে পড়ল তাই। কিশোরকে নিয়ে ভাবল না। ওর ব্যবস্থা ও করে নিতে পারবে। ফগকে ফাঁকি দিয়ে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে ঘর থেকে।

কিন্তু অত সহজে পার পেল না কিশোর। সামনের দরজা খুলে বেরোতে যাবে, এই সময় তালা খোলার শব্দ শুনল। ফগ খুলছে। সরার সময় পেল না। পাল্লা খুলে গেল। সামনে কিশোরকে দেখে এমন ভঙ্গি করল ফগ মনে হলো মাথায় বাজ পড়েছে। হাঁ হয়ে গেল মুখ।

'গুড মর্নিং, মিস্টার ফগ,' মসৃণ গলায় বলল কিশোর। 'আসুন, ঘরে আসুন।'

আচমকা ফেটে পড়ল ফগ, 'ফগর‍্যাম্পারকট! তুমি এখানে কি করছ?

ঝামেলা!'

'না, কোন ঝামেলা করছি না। বাইরে থেকে শুনলাম একটা বেড়ালছানা খিদেয় কাঁদছে। ওটাকে বাঁচানোর জন্যে ঢুকেছি।'

'অন্যের বাড়িতে লুকিয়ে ঢোকাটা বেআইনী। এর জন্যে আমি তোমাকে হাজতে ঢোকাতে পারি, জানো?'

'কিন্তু বেড়ালছানা…'

'মিথ্যে বলে পার পাবে না!' গর্জে উঠল ফগ। 'তোমাকে এবার বাগে পেয়েছি আমি, ছাড়ব না। বেড়াল-টেড়াল কিচ্ছু না। আসলে বাড়ি খালি পেয়ে চুরি করতে ঢুকেছিলে তুমি…'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই 'মিআউ' করে কিশোরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল ছানাটা। প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করল ফগকে। কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে হিসিয়ে উঠল।

হেসে বলল কিশোর, 'দেখলেন তো, মিথ্যে আমি বলিনি। বেড়ালটাই সাক্ষি।'

বেড়ালটার দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে রইল ফগ। ধমকে উঠল, 'যাও, এবারের মত ছেড়ে দিলাম। ভাগো ওটাকে নিয়ে। আমার জরুরী কাজ আছে এখানে। আর আসবে না, বলে দিচ্ছি।'

বেড়ালের বাচ্চাটাকে নিয়ে সোজা মুসাদের বাড়ি রওনা হলো কিশোর। আশা করল, ওখানেই পাওয়া যাবে সবাইকে।

মুসাদের বাগানের ছাউনিতে অপেক্ষা করছে সবাই। কিশোরের সাড়া পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল টিটু। কোন কুকুরই বেড়াল দেখতে পারে না। টিটুও পারল না। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ধমক দিয়ে ওকে চুপ করাল কিশোর। বাচ্চাটাকে তুলে দিল ফারিহার হাতে।

ছাউনির ভেতরে একটা বাক্সে ছানাটাকে বসিয়ে দিল ফারিহা, এমন জায়গায় যেখানে টিটু ওর নাগাল পাবে না।

ছাউনিতে ঢুকে একটা বাক্স টেনে সবার মুখোমুখি বসল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখেছ তো সবাই?'

মুসা, ফারিহা, রবিন, তিনজনেই মাথা ঝাঁকাল।

'সূত্র পেয়েছ?'

একপাতা কাগজ বের করল রবিন। বলল, 'খুব বেশি কিছু না। এই যে, রিপোর্ট।'

কাগজটা দেখল না কিশোর। 'মুখেই বলো। শুনি।'

'বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখেছি আমরা সবাই। কোনদিক দিয়ে চোর এসেছে, দেখেছি। সামনের গেট দিয়ে ঢোকেনি। বাগানের পেছনের দেয়াল টপকে এসেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'জুতোর ছাপ পেয়েছি। গভীর হয়ে বসে গেছে মাটিতে। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেই কেবল ওরকম দাগ পড়ার কথা।'

'হতে পারে। বলে যাও।'

'ওই একই জুতোর ছাপ এগিয়ে গেছে একটা ঝোপের ধার পর্যন্ত। ভেতরে

লুকিয়ে বসেছিল। বুঝলাম, কারণ অনেকগুলো ছাপ দেখেছি ওখানে। ওখানে বসে নিশ্চয় বাড়ির দিকে চোখ রেখেছিল লোকটা।'

'ছাপের নকশা এঁকে এনেছ?'

'নিশ্চয়ই,' মুসা বলল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। 'অনেক বড় পা লোকটার। এগারো নম্বর সাইজ। এই দেখো। নাইকি কোম্পানির জুতো। সোলের তলার নকশা আমার জুতোর মতই। একই জুতো। আমারটার সাইজ ওর চেয়ে অনেক ছোট।'

'আর কি পেলে?'

পকেট থেকে একটা সিগারেটের গোড়া বের করে দিল রবিন। 'এটা। মাটিতে পাতার নিচে পড়ে ছিল। সেজন্যেই ফগ দেখতে পায়নি।'

'ফগ ওখানে গিয়েছে কি করে জানলে?'

'অনেক জায়গায় ওর জুতোর ছাপ দেখেছি। সারা বাড়িতেই ঘুরেছে। ওর পা বিশাল। চোরটার চেয়েও বড়। দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেছে। না চেনার কোন কারণ নেই। যাই হোক, আমার ধারণা, এ রকম সিগারেটের গোড়া আরও ছিল ওখানে। সে পেয়ে নিয়ে গেছে। এটা পাতার নিচে ছিল বলে দেখতে পায়নি।'

'তুমি পেলে কি করে?'

'আমি না। টিটু পেয়েছে। পাতার কাছে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল।'

হাসল কিশোর। 'ও তো দেখি বড় গোয়েন্দা হয়ে গেছে।'

নিজের নাম শুনে কান খাড়া করে ফেলেছে টিটু।

ওর দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছিস তুই।'

প্রশংসা বুঝতে পারল টিটু। লেজ নাড়তে লাগল।

রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'হ্যাঁ, আর কিছু?'

'ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়েছে পায়ের ছাপ। ভাঙা জানালার নিচে গিয়ে থেমেছে। সুতরাং ওই জুতোর ছাপের মালিকই যে জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, এটা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। একটা ইঁটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছি জানালার নিচে। ওটা দিয়ে বাড়ি মেরেই কাঁচ ভেঙেছে সম্ভবত।'

'ভাঙতে পারে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'এ ভাবে ভাঙলে শব্দ হবেই। কেউ শুনে থাকতে পারে। ঠিক আছে, খোঁজ নেয়া যাবে। বলো, আর কি পেয়েছ?'

'পায়ের ছাপ আরও আছে। তবে ওগুলো এমন সব জায়গায়, চোরের বলে মনে হলো না। সাইজেও মেলে না।'

'কোন্ কোন্ জায়গায়?'

'সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফুলের বেড মাড়িয়ে পেছন দিকে চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি। সামনের গেটের দিকেও যায়নি।'

'তারমানে কোন কারণে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর কেউ তো ও বাড়িতে থাকে না, সুতরাং এই ছাপগুলো কনি হুবারের হওয়ারই সম্ভাবনা।'

'ব্যস, এইই,' কাগজটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল রবিন।

তিন

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। এর অর্থ গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে। সূত্রগুলো নিয়ে ভাবছে।

এই সময় ওপরের বাক্সে নড়েচড়ে উঠল বেড়ালছানাটা। সেদিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।

বিরক্ত হয়ে ধমক লাগাল কিশোর, 'আহ্, বড় বেশি বিরক্ত করিস! ও তোর কি করল যে ওকে ধমকাচ্ছিস?'

চুপ হয়ে গেল টিটু।

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর, 'যা বোঝা যাচ্ছে, হুবারের বাড়ি থেকে কেউ কোন জিনিস চুরি করে নিতে এসেছিল কাল রাতে।'

'কিন্তু নিজের বাড়ি থেকে হুবার ওভাবে পালাল কেন?' মুসার প্রশ্ন।

তর্জনী তুলে নাড়ল কিশোর, 'তাড়াহুড়ো কোরো না। আসছি সেসব প্রশ্নে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাল রাতে একটা লোক হুবারের বাড়িতে ঢুকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ও ভেবেছিল ওই সময় হুবার ঘুমিয়ে আছে। অসচেতন অবস্থায় পেয়ে যাবে ওকে। ঘুম থেকে ডেকে তুলে পিস্তল দেখিয়ে হুমকি দেবে। আদায় করে নেবে যেটা নিতে এসেছে।

'কিন্তু কোন কারণে হুবারকে চমকে দিতে পারেনি লোকটা। হতে পারে কাঁচ ভাঙার শব্দে জেগে গিয়েছিল হুবার। বিপদের গন্ধ পেয়েছিল। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাল্লাটা খোলা রেখেই অন্ধকারে পাগলের মত ছুটে পালিয়েছে...'

'কাল রাতে চাঁদ ছিল,' মনে করিয়ে দিল ফারিহা। 'অন্ধকার ছিল না।'

'তা ঠিক, থ্যাংক ইউ। জ্যোৎস্নার মধ্যে পাগলের মত ছুটে পালিয়েছে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে লোকটা যে জিনিস নিতে এসেছিল সেটা। তারপর লোকটা ঘরে ঢুকে যখন দেখল পাখি পালিয়েছে, জিনিসটার জন্যে সারা ঘর তছনছ করে ফেলল।'

'জিনিসটা কি?'

'এখনও জানি না। তবে খুব বড় কিংবা ভারী কিছু নয়। তাহলে নিয়ে ছুটে পালাতে পারত না।'

'কি জিনিস অনুমানও করতে পারো না?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা। কিশোরের বুদ্ধির ওপর ওর বড় বেশি আস্থা। তার ধারণা, ঠিকই অনুমান করে ফেলতে পারবে কিশোর।

'ঘরে ঢুকে একটা জিনিস পেয়েছি,' পকেট থেকে লাল দস্তানাটা বের করল কিশোর।

জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। টিটু এগিয়ে এসে শুঁকতে লাগল।

ফারিহা বলে উঠল, 'এ তো পুতুলের দস্তানা! নাকি কোন বাচ্চার?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম হুবার কোন শিশুকে কিডন্যাপ করে এনেছে। পরে বাদ দিয়েছি সম্ভাবনাটা। বাড়িতে এমন কিচ্ছু পেলাম না যাতে বোঝা যায় ওখানে

কয়েকদিন একটা বাচ্চাকে রাখা হয়েছিল। শুধুই এই দস্তানাটা।'

দস্তানাটা নেড়েচেড়ে দেখল রবিন। 'ঝকঝকে পরিষ্কার। বছর দুয়েকের কারও হাতে লাগবে বড়জোর। ফারিহা, তোমার বড় পুতুলটা কোথায়? ওই যে, পাঁচ বছরের জন্মদিনে পেয়েছিলে?'

'বাক্সে ভরে রেখে দিয়েছে,' মুসা বলল। 'ও আর এখন পুতুল নিয়ে খেলে না।'

'আনব?' উঠে দাঁড়াল ফারিহা।

'নিয়ে এসো,' কিশোর বলল। ফারিহা বেরিয়ে গেলে মুসা আর রবিনের দিকে ফিরল, 'চুরি করে ঢুকেছিল যে লোকটা তার পায়ের ছাপ এঁকে এনেছ তোমরা। কিন্তু হুবারের ছাপ আনলে না কেন?'

হাসল মুসা। গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'এনেছি। তোমাকে দেখাতে ভুলে গিয়েছি।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল। 'ছাপগুলো ছোট। কেমন চ্যাপ্টা আর অস্পষ্ট।'

নীরবে ছবিটা দেখল কিশোর। 'বেডরুম স্লিপার পরেই পালিয়েছে হুবার। দেখো, গোড়ালি নেই। জুতো পরারই যখন সময় পায়নি, আমার ধারণা, কাপড় বদলানোরও সময় পায়নি। তারমানে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া।'

'হ্যাঁ, ছাপ দেখে আমারও মনে হয়েছে স্লিপার,' একমত হলো মুসা।

পুতুল নিয়ে ঢুকল ফারিহা। অনেক বড়।

ওটার হাতে দস্তানাটা পরানোর চেষ্টা করল কিশোর। আপনমনে বলল, 'যদি কোন শিশুরও হয়ে থাকে এটা, সে তোমার এই পুতুলটার চেয়ে বড় নয়, ফারিহা। বুঝতে পারছি না, এই দস্তানাটা ফেলে গেল কিভাবে লোকটা?' জিনিসটা আবার পকেটে রেখে দিল সে। 'থাকগে, পরে ভেবে দেখব।'

কাজের মেয়েটাকে দিয়ে মুসা আর ফারিহাকে ডেকে পাঠালেন মুসার আম্মা। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমরাও বাড়ি যাই। রবিন, যাবে না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

মুসা জানতে চাইল, 'আমাদের মীটিং আবার কখন বসছে?'

'বিকেল সাড়ে তিনটায়। অবশ্য যদি তোমার আম্মা তোমাদেরকে জোর করে শুইয়ে না রাখেন। হয়তো বলতে পারেন—সবে জ্বর থেকে উঠলে, রেস্ট নাও।'

'তোমাকেও তো তোমার চাচী আটকে রাখতে পারেন?'

'পারবে না। পালিয়ে আসব।'

'তাহলে আমরাও পালিয়ে আসব,' বুক ফুলিয়ে বলল ফারিহা।

ওপর থেকে মিআউ করে জানান দিল বেড়ালের বাচ্চাটা, 'আমার কথা ভুলে গেলে নাকি?'

খউ খউ করে উঠল টিটু, যেন বলতে চাইল, 'আরে না, সবাই ভুললেও আমি ভুলিনি!'

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এটার কি হবে?'

'কিছুই হবে না। আমি ওকে পুষব,' ফারিহা বলল।

'যদি মা আবার বকাবকি শুরু না করে,' বলল মুসা।

মুসার আম্মা যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে পারেন না, এ কথা সবাই জানে। রবিন বলল, 'করলে আর কি করব। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। একটা বাচ্চাকে না খাইয়ে রেখে মেরে তো আর ফেলা যায় না।'

চার

বিকেলে আবার মীটিং বসল মুসাদের ছাউনিতে। মুসার আম্মা কিংবা মেরিচাচী কেউই বাধা দেননি। ফলে বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকা লাগেনি ওদের। বেঁচেছে।

আলোচনা শুরু করল কিশোর, 'লোকটা কিভাবে কাল হুবারের বাড়িতে ঢুকেছিল, জানি আমরা। কিন্তু কি করে বেরিয়ে গিয়েছিল, জানি না। কেউ কিছু অনুমান করতে পারো?'

'পারি,' জবাব দিল মুসা, 'সোজা সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেছে।'

'একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, চাঁদনী রাতে প্রচুর ছোটাছুটি করেছে দুজন লোক। একজন বেরিয়েছে সামনে দিয়ে, আরেকজন পেছন দিয়ে দেয়াল টপকে। সামনের দরজা খোলা রেখে গেছে কোন একজন। বাতাসে খুলে আর বন্ধ হয়ে বাড়ি লেগে শব্দ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে জেনেও। সেই শব্দ কারও কানে যাওয়ার সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যায় না। এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, কার কানে গেছে সেই শব্দ।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'জনে জনে গিয়ে তো আর জিজ্ঞেস করা যাবে না—এই মিয়া, তোমরা কি রাতের বেলা বিরাট পাওয়ালা এক লোক, আর নাইটগাউন পরা একজনকে লুকোচুরি খেলতে দেখেছ? লোকে হাসবে না?'

'উপায় নেই,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'জিজ্ঞেস না করলে জানব কি করে? তবে তুমি যে ভাবে বলছ ওভাবে করব না। জিজ্ঞেসও করব বেছে বেছে।'

'কি জিজ্ঞেস করবে?'

'বলব আমার এক আঙ্কেল পম আছে, রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে হাঁটে। কাল রাতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল, বলতে পারছে না। কেউ কি অচেনা কোন লোককে রাস্তায় হাঁটতে দেখেছ? কিংবা কোথাও যেতে দেখেছ তাকে?'

'তোমার আবার আঙ্কেল পম এল কোত্থেকে?'

'আছে। প্রয়োজনে শুধু পম নয়, আরেকজন আঙ্কেল বমও এসে যাবে আমার। যার শখ, রাতের বেলা জোনাকি ধরা। কাল রাতে সেও বেরিয়েছিল জোনাকি ধরতে। তাকেও কেউ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করব।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'তোমার এই আঙ্কেল পম আর বমের কথা তো কোনদিন আমাদের…'

'বলব কি? আমিও কি ছাই ওদের নাম শুনেছি নাকি? এইমাত্র বানিয়ে নিলাম। উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে তো দুজনেই। রাত দুপুরে যা খুশি করতে পারে। ওদের স্বভাবের কথা ব্যাখ্যা করে জিজ্ঞেস করলে লোকে আর হাসবে না।'

হাসতে লাগল ফারিহা। 'নাম কি বানিয়েছ দুইখান, আহাহা! পম। বম।

একজনকে নিশিতে পায়, আরেকজনের জোনাকি ধরার শখ। আসে কোত্থেকে তোমার মাথায় এ সব বুদ্ধি! হি-হি-হি-হি! হা-হা-হাহ্!'

মুসা আর রবিনও হাসছে।

মুসা বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কাদের? সারা গাঁয়ের সবাইকে করতে গেলে তো কয়েক মাস লেগে যাবে শুধু একটা প্রশ্নের জবাব জানতেই।'

'সারা গাঁয়ের মানুষকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে কে?'

'তাহলে?'

'নিশাচরদের জিজ্ঞেস করব।'

'এই তো শুরু হলো রহস্য করে কথা বলা!'

'আরি, সহজ করেই তো বললাম। নিশাচর মানুষদের চেনো না? চৌকিদার, চৌকিদার।'

'ওহ্,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'তাই বলো। ঠিক বলেছ। পড়লে ওদের চোখেই পড়তে পারে। রাতভর পাহারা দেয়। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বলবে কেন?'

'বলবে, কারণ পম আর বম আমার চাচা।'

'তোমার চাচা। আমাদের তো নয়।'

'আমিই জিজ্ঞেস করব তাহলে। দিনের বেলা ওদের সাথে কথাই বলা যাবে না। সারারাত পাহারা দিয়ে দিনে ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়। মেজাজ থাকে খারাপ। কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে রেগে উঠতে পারে। তাই রাতেই দেখা করব। তখন তোমরা যেতে চাইলেও যেতে পারবে না। তোমাকে আর ফারিহাকে তো বেরোতে দেবেন না আন্টি, ভাল করেই জানি। জ্বর থেকে সবে উঠলে, ঠাণ্ডা লাগার ভয়েই বেরোতে দেবেন না। রবিনকেও বেরোতে দেবেন না ওর আম্মা। সে-ও জ্বর থেকে উঠেছে। বাকি রইলাম আমি আর টিটু। অতএব আমরাই বেরোব।'

'মেরিচাচী যদি বেরোতে না দেন?'

'চাচী আজ বাড়ি থাকবে না। রাতে একটা পার্টিতে চলে যাচ্ছে চাচা-চাচী দুজনেই। অতএব আমি ফ্রী।'

'সত্যি, তোমার স্বাধীনতা দেখলে হিংসেই হয়!' মুখ বিকৃত করে ফেলল মুসা, 'আমার মা'টা যে কি! খালি পদে পদে বাগড়া!'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রবিন, তোমাদের বাড়ি আর হুবারের বাড়ির মাঝখানের বাড়িটা কার?'

'কিটিদের।'

'বয়স?'

'আমাদেরই মত। কিছুটা বেশি হতে পারে।'

'করে কি?'

'স্কুলে পড়ে। পাখি দেখার শখ।'

'খাতির আছে তোমার সঙ্গে?'

'নাহ্, তেমন একটা নেই। দেখা হলে "কেমন আছো, ভাল"; বই নিয়ে

দুচারটে কথা, এই পর্যন্ত। সে-ও বইয়ের পাগল। মাঝেমধ্যে আমার কাছে বই নিতে আসে। কেন?'

'যেহেতু হুবারের পাশের বাড়িতেই থাকে, তাকে গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারো গতরাতে কোন শব্দ শুনেছে কিনা, যেটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। একটা ছুতো করে চলে যেতে পারবে না?'

মাথা কাত করল রবিন। 'আজই পারব। একটা পাখির বই হাতে করে নিয়ে যাব। লোভে চকচক করতে থাকবে ওর চোখ, আমি জানি। পড়ার জন্যে পাগল হয়ে যাবে। দেব, তবে তার আগে কথা আদায় করে নেব যতটা পারা যায়।'

চুটুস করে চুটকি বাজাল কিশোর, 'ভাল বুদ্ধি! ঠিক আছে, তাই কোরো। জেনে এসে আমাকে ফোন করে জানিয়ো।'

পাঁচ

বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাড়াহুড়া করে একটা বই বের করে নিয়ে পাশের বাড়িতে রওনা হলো রবিন। পাওয়া গেল কিটিকে। সে নিজেই দরজা খুলে দিল। অবাক হলো রবিনকে দেখে। 'আরি, কি ব্যাপার, তুমি! আজ সূর্য পশ্চিম দিকে উঠল নাকি? এসো, এসো।'

'সূর্য ঠিক দিকেই উঠেছে,' হাতের বইটা দেখাল রবিন। 'সেদিন বাবা কিনে এনে দিল এটা। ভাবলাম, তোমার তো পাখি খুব পছন্দ, হয়তো পড়তে ইনটারেসটেড হবে।'

লোভী ছেলে রসগোল্লার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টি দেখা গেল কিটির চোখে। 'এসো, এসো, ঘরে এসো। আম্মা-আব্বা কেউ নেই বাড়িতে। চুটিয়ে গল্প করা যাবে।' হাত বাড়াল, 'দেখি, বইটা?'

ঘরে ঢুকেই বই খুলে বসল কিটি। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চুটিয়ে গল্প করা বাদ দিয়ে এখন এই অবস্থায় যদি তাকে ফেলে যায় রবিন, তাহলেই খুশি হবে বেশি।

রবিন সেটা বুঝল। কিভাবে কথা শুরু করা যায় ভাবতে লাগল। সুযোগটা কিটিই তাকে করে দিল। বইয়ের একটা পাতা খুলে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, পেঁচা! আর কি একখান ছবি দিয়েছে দেখো। দারুণ! দুর্দান্ত! ওই শোনো, পেঁচা ডাকছে। যেন বুঝতে পেরেছে আমি এখন ওর ছবি দেখছি। শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল রবিন। ডাকটা শুনতে পেল সে-ও। 'আজই প্রথম শুনলে? না কাল রাতেও শুনেছ?'

রবিনের দিকে তাকাল কিটি। মাথা ঝাঁকাল। 'শুনেছি। জ্যোৎস্নায় ডানা ভাসিয়ে এসে বসল আমার জানালায়। মনে হলো যেন ওর সঙ্গে গিয়ে ইঁদুর ধরার দাওয়াত দিতে এসেছে আমাকে। কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। ওরা ডাকে খুব জোরে, কিন্তু ওড়ার সময় কোন শব্দ হয় না। ছায়ার মত ভেসে চলে যায়।'

'শব্দ করলে কি আর ইঁদুর বসে থাকত ধরা পড়ার জন্যে। ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনলেই পালাত। আচ্ছা, যাই হোক, কটার সময় ডেকেছিল পেঁচাটা, মনে

আছে?'

অবাক হলো কিটি। 'কেন, তুমিও ওর ডাক শুনেছ নাকি?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে চোখ আধবোজা করে ভাবতে লাগল, 'ডাকটা শুনেছি শুতে যাওয়ার ঠিক আগে। তখন বাজে দশটা। সাড়ে বারোটায় ঘুম ভেঙে গেল ওদের ডাকাডাকিতে। ওই সময়ই একটাকে দেখলাম জানালায় এসে বসতে। আস্তে করে বিছানা থেকে উঠে গেলাম ভালমত দেখার জন্যে।'

'তোমার বেডরুম কোনদিকে? আমাদের বাড়ির দিকে?'

'না, মিস্টার হুবারের। কাল রাতে চোর ঢুকেছিল ও বাড়িতে, জানো বোধহয়। কখন যে ঢুকল কে জানে। সাড়ে বারোটায় যখন জানালা দিয়ে তাকালাম, তখনও দেখি নিচতলায় আলো জ্বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন মিস্টার হুবার। মাঝে মাঝে জানালার পর্দা টানা থাকে না। ওই সময় দেখেছি টেবিলের সামনে বসে কি যেন করছেন। কাল রাতে রেডিও চালানো ছিল তাঁর। শব্দ শুনেছি।'

'সাড়ে বারোটার পর আর কোন পেঁচা ডাকতে শোননি? সারারাতই তো শোনার কথা। চাঁদের আলো ছিল। নিশ্চয় ইঁদুর ধরেছে।'

'শুনেছি। পেঁচারা জ্যোৎস্না খুব ভালবাসে। অনেক রাতে আরেকবার ঘুম ভেঙে গেল আরেকটা শব্দে। কিসের শব্দ বুঝলাম না। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। সোয়া তিনটে বাজে। কয়েকটা বাদামী পেঁচা আর কয়েকটা ছোট পেঁচা ডাকাডাকি শুরু করল। ঝগড়া বাধিয়েছে মনে হলো।'

'ওই সময়ও কি হুবারের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছ?'

'দেখেছি। মজার ব্যাপার কি জানো, আলোটা দেখেছি রান্নাঘরে। ইলেকট্রিক আলো নয়। টর্চ কিংবা মোমবাতিটাতি হবে।'

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছে রবিন, কিন্তু সেটা বুঝতে দিল না কিটিকে। রান্নাঘরে আলো জ্বেলেছে নিশ্চয় সেই লোকটা, যে জানালা ভেঙে ঢুকেছে।

'কিসের শব্দে ঘুম ভাঙল, বুঝতে পারনি? ভেবে দেখো তো, কাঁচ ভাঙার শব্দ কিনা?'

'তা হতে পারে,' ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে তাকাল কিটি। 'চোর ঢোকার কথা ভাবছ নাকি তুমি? শোনো, কাঁচ ভাঙার শব্দই শুনি, আর যেটারই শুনি, আমার তাতে কোন আগ্রহ নেই। রান্নাঘরে কিসের আলো দেখেছি তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। তা ছাড়া ঠিক ঠিক দেখেছি কিনা তাও বলতে পারব না। ঘুমের ঘোরে ভুলও দেখে থাকতে পারি।'

অনেক কথা বলে ফেলেছে কেবল রবিনের কাছ থেকে বইটা পড়তে পাওয়ার কৃতজ্ঞতায়। আর নয়। বইয়ের পাতায় মুখ নামাল আবার কিটি।

আর কথা বলতে চায় না ও, বুঝল রবিন। উঠে দাঁড়াল। অনেক জেনেছে। এতটা জানতে পারবে আশা করেনি।

'গুড-বাই, কিটি।'

'গুড-বাই,' বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল কিটি। বইটা কবে ফেরত দেবে না দেবে কিছুই বলল না।

রবিনও কিছু জিজ্ঞেস করল না। দরজার দিকে হাঁটা দিল।

বাড়ি ফিরেই ফোন করল কিশোরকে। সব কথা জানাল।

'বাহ্, অনেক কথা জেনে এসেছ তো,' খুশি হলো কিশোর। 'বোঝা যাচ্ছে, জানালার কাঁচ ভেঙে রাত তিনটের পর লোকটা ঢুকেছিল হুবারের রান্নাঘরে, এবং তারপরে ছুটে পালিয়েছে হুবার। হয়তো সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সেই জিনিসটা, যেটার জন্যে লোকটা এসেছিল।'

আরও দুচারটা কথা বলে, রবিনকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল কিশোর। চৌকিদারদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বেরোতে হবে তাকে।

ছয়

সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে নিল কিশোর। টিটুকে নেবে কিনা ভাবতে লাগল। প্রয়োজন মনে করল না। বরং রাতের বেলা ওকে সামলানোই ঝামেলা। ইঁদুর, ছুঁচো আর এ জাতীয় নিশাচর জীবের আনাগোনা হবে। সেটা কানে যাবে টিটুর। আর গেলেই হই-চই। তার চেয়ে রেখে যাওয়াটা ভাল মনে করল সে।

সে যে বেরোচ্ছে এটা বুঝতে দিল না টিটুকে। ঘরে আটকে রেখে বেরিয়ে চলে এল।

কোন্‌দিকে যাবে?

পেছনের দেয়াল টপকে পালিয়েছে হুবার। সেদিকে নদী। অতএব প্রথমে নদীর দিকে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। তবে তার আগে অনুমান করে নিতে হবে, ঠিক কোনদিকে গিয়েছে হুবার।

তাই চলে এল হুবারের বাড়ির পেছনে।

পুরো অন্ধকার হয়ে আছে বাড়িটা। পেছনের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছে। নদীর দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

হাঁটতে শুরু করল রাস্তা ধরে। এদিকে যে সব চৌকিদার পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

আস্তে আস্তে হেঁটে চলল। চলে এল পথের শেষ মাথায়। এখানে রাস্তাটা ভাগ হয়ে দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। এদিক ওদিক তাকাল। কোনও চৌকিদার চোখে পড়ল না।

এখন কোনদিকে যাবে? ডানে, না বাঁয়ে?

ডানেরটাতে যাওয়াই ঠিক করল।

এবার ভাগ্য কিছুটা প্রসন্ন হলো। একসারি লাল লণ্ঠন জ্বলছে। তার মাঝে আবছামত দেখা যাচ্ছে চৌকিদারের কুঁড়ে। দরজায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তারমানে কেউ আছে ওখানে।

কিশোর কাছাকাছি এগোতেই পায়ের শব্দ শুনে গলা বাড়িয়ে দিল লোকটা। জ্বলন্ত কয়লায় হাত সেঁকছে।

কাছে গিয়ে কিশোরও হাত দুটো ধরল কয়লার ওপর। 'উফ্, এক্কেবারে অবশ হয়ে গেছে।' লোকটার দিকে তাকাল, 'কেমন আছেন?'

'কে হে তুমি? এত রাতে?'

'ঠেকা না থাকলে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বেরোয় কোন পাগলে,' প্রচণ্ড বিরক্তির ভান করে বলল কিশোর। নিজের পরিচয় দিল না। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কি আর বলব, কতগুলো উন্মাদ এসে জুটেছে বাড়িতে। এই যে আমার আঙ্কেল পমের কথাই ধরুন না। রাত দুপুরে ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার অভ্যেস। বলে নিশির ডাক। বাইরে বেরিয়ে কোথায় কোনদিকে চলে যায়, কোন ঠিকঠিকানা নেই। সকালে আর কিছু মনে করতে পারে না। বলুন তো কি কাণ্ড।'

'আজও বেরিয়েছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল চৌকিদার।

'কাল রাতে বেরিয়েছিল। এদিকে এসেছিল নাকি, দেখেছেন? পাজামা পরা, পায়ে চটি। বিছানা থেকে নেমে বেরিয়েছে তো, ওগুলোই পরা ছিল। বড়জোর একটা কোট গায়ে দিয়ে থাকতে পারে। ঠাণ্ডা যে লাগে, এ ব্যাপারে পাগলেরও হুঁশ থাকে।'

হেসে উঠল চৌকিদার। 'না, ওরকম কোন পাগলকে দেখিনি কাল।' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে, যেন কেউ শুনে ফেলবে এই ভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'শোনো, তোমাকে বলেই ফেলি–কাউকে বলে দিয়ো না আবার, ফগ শুনতে পেলে চাকরিটা যাবে–কাল রাতে আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই কিছু দেখিনি। এই ঠাণ্ডার মধ্যে কে যায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, বলো।' একটু চিন্তা করে নিয়ে বলল, 'তবে বুড়ো ক্যামার ঘুমায়নি। ও ঠিকমতই পাহারা দিয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে চলে গিয়েছিল। ও নাকি পাজামা পরা এক লোককে দেখেছে। অত রাতে ওই পোশাকে নদীর ধারে লোকটাকে দেখে অবাক লেগেছে তার। সেজন্যেই বলেছে আমাকে। এখন বুঝলাম, পাগলটা কে। তোমার আঙ্কেল পম। পাগল বললাম বলে আবার কিছু মনে করলে না তো?'

'আরে না না। আমিই তো বললাম পাগল।'

'পাগল যখন জানোই, ঘরের মধ্যে রাতে তালা আটকে রাখো না কেন? নইলে কোনদিন রাতে নদীতে পড়ে ডুবে মরবে কে জানে।'

'এখন থেকে তাই করতে হবে। যাই, বুড়ো ক্যামারের সঙ্গেই কথা বলে আসি।'

বুড়োকে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে আবার রাস্তায় এসে উঠল কিশোর। কানে এল সাইকেলের বেলের পরিচিত শব্দ। রাস্তার মোড়ের লাইটপোস্টের আলোয় সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখা গেল ফগর‍্যাম্পারকটকে।

চট করে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল কিশোর। টিটুকে না এনে ভাল কাজ করেছে। ফগকে দেখলে আর ঠেকানো যেত না ওকে। চেঁচামেচি শুরু করে দিত। তাতে তদন্তের বারোটা বাজত।

কুঁড়ের কাছাকাছি গিয়ে সাইকেল থেকে নামল ফগ। এগিয়ে গেল চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

আবার কতগুলো লাল আলো বুঝিয়ে দিল রাস্তার পাশে আরেকজন চৌকিদারের কুঁড়ে আছে। বুড়ো ক্যামারের আস্তানা। কাছেই নদী।

এই লোকও কিশোরকে চিনতে পারল না। নাম জিজ্ঞেস করল। বানিয়ে একটা নাম বলে দিল কিশোর। ওর ভয়, এখানেও এসে হাজির হতে পারে ফগ। বেরোনোর আর সময় পেল না ঝামেলাটা! ও যখন বেরিয়েছে একেবারে ঠিক তখনই! যাকগে, পুলিসের ডিউটি পুলিস করছে, সেটা তো আর ঠেকাতে পারবে না। বুড়ো ক্যামারকে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে জবাবগুলো জেনে নিয়ে এখন যত জলদি কেটে পড়া যায়।

আগের চৌকিদারের মত এত হাসিখুশি নয় বুড়ো ক্যামার। কথাও তেমন বলতে চায় না।

বুড়োকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করল কিশোর, 'আমার আঙ্কেল পমও রাতে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে বেরিয়ে যেখানে আগুন দেখে সেখানেই হাত সেঁকতে বসে যায়।'

কিশোরের আঙ্কেল পমের প্রতিও কোন আগ্রহ দেখাল না বুড়ো। নিশির ডাক কিংবা ঘুমের ঘোরে হাঁটা, কোনটাতেই ওর আকর্ষণ নেই।

'কাল রাতে নিশ্চয় ওকে দেখেছেন আপনি,' বলল কিশোর। 'পাজামা পরা। চটি পায়ে দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। দেখুন দেখি কি কাণ্ড। এই শীতের মধ্যে ওই পোশাকে ঘর থেকে বেরোনো। পাগল আর কাকে বলে।'

এতক্ষণে কিছুটা আগ্রহী মনে হলো বুড়োকে। মুখ খুলল, 'কাল রাতে দেখেছি আমি ওকে। পাজামা পরে দৌড়াচ্ছে। পাগলই মনে হয়েছিল আমার কাছে। এখন তো বুঝলাম ঠিকই অনুমান করেছি।'

আমিও ঠিক অনুমানই করেছি—ভাবল কিশোর। নদীর দিকে দৌড়ে এসেছে হুবার। পালাচ্ছিল। কিন্তু নদীতে কেন?

'হাতে কিছু ছিল নাকি আমার আঙ্কেলের?'

'ছিল। জিনিসটা কি চিনতে পারিনি। নদীতে নেমেছিল মনে হলো। এই ঠাণ্ডার মধ্যে! আসলেই পাগল! তাহলে ওই লোক তোমার আঙ্কেল। প্রায়ই এ রকম বেরোয় নাকি?'

'বেরোয়। চাঁদনি রাতেই মাথা খারাপ হয় বেশি। এদিক দিয়ে আর ফিরতে দেখেননি নিশ্চয়?'

'না।'

আবার প্রশ্ন করতে যাবে কিশোর, এই সময় কানে এল সাইকেলের বেলের শব্দ। এসে গেছে ফগ। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে এল তার কাছ থেকে। হঠাৎ ভাবনাটা এল মাথায়। ফগ কি বলে শোনা যাক না। দ্রুত আলোর কাছ থেকে সরে এসে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে।

সাইকেল থেকে নামল ফগ। 'কেমন আছো, ক্যামার?'

'ভাল, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। এত রাতে এখানে?'

'একটা কেস পেয়েছি, ক্যামার। সেটারই তদন্ত করছি। কাল রাতে সন্দেহজনক কাউকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ নাকি?'

'দেখেছি। নিশিতে পাওয়া এক পাগলকে। শীতের মধ্যে পাজামা আর চটি পরে দৌড়াচ্ছিল।'

‘ঝামেলা! কি বলছ! নিশিতে পাওয়া পাগল, এ কথা কে বলল তোমাকে?’

‘একটা ছেলে। ওর আঙ্কেল পমের নাকি ঘুমের ঘোরে হাঁটার রোগ আছে।’

‘ছেলেটা দেখতে কেমন?’

‘আলোর কাছ থেকে সরে বসেছিল। ভালমত দেখিনি চেহারাটা। তবে মনে হলো চুলগুলো কোঁকড়া।’

‘কোঁকড়া!’ প্রায় চিৎকার করে উঠল ফগ। তারমানে ওই বিচ্ছু ছেলেটাও তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘শোনো, ক্যামার, শুনতে পাচ্ছো?’

‘তা পাচ্ছি। আমি কানে খাটো হলে কি হবে, এতটা খাটো নই যে আপনার চিৎকার শুনতে পাব না।’

ঝোপের মধ্যে বসে মুচকি হাসল কিশোর।

‘ঝামেলা! বেশি কথা বলো তুমি!’ ধমকে উঠল ফগ। ‘যা বলি মন দিয়ে শোনো। কাল রাতের ওই পাগলটা আজও আবার এ পথে আসতে পারে। ওকে দেখলেই ধরে এনে আটকাবে। কথা আদায় করবে।’

‘পাগল ধরতে গিয়ে শেষে মরব নাকি! মাথায় যদি বাড়ি মেরে বসে? আমি পারব না। আমার কাজ রাতে পাহারা দেয়া। দিচ্ছি, ব্যস। কাউকে আটক না করার জন্যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারবেন না।’

হাসি চাপতে কষ্ট হলো কিশোরের।

‘ঝামেলা! ছেলেটা কোনদিকে গেছে?’

হাত তুলে দেখিয়ে দিল ক্যামার।

‘তারমানে বাড়ি যেতে হলে এ পথেই ফিরতে হবে কিশোর পাশাকে,’ বিড়বিড় করল ফগ। চিৎকার করে ক্যামারকে বলল, ‘পাগল নাহয় নাই ধরলে। ছেলেটাকে তো ধরতে পারবে? এ পথ দিয়েই যাবে ও। তোমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ক্যাঁক করে কলার চেপে ধরে আটকাবে। তারপর যা করার আমি করব। আমি এই পথের মাথায়ই লুকিয়ে থাকব।’

‘তাহলে আপনিই ধরছেন না কেন?’

‘ঝামেলা! খালি তর্ক করে। আমি ধরছি না তার কারণ আমাকে দেখলেই ছোকরা দৌড়ে পালাবে। ধরার সুযোগ আর পাব না।’

‘ধরে কি করবেন?’

‘সেটা আমার ব্যাপার,’ ধমকে উঠল ফগ।

চুপ করে ভাবতে লাগল ক্যামার। ফগকে চটিয়ে দিলে এই এলাকায় চাকরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। অগত্যা রাজি হলো তার কথায়।

আবার সাইকেলে চাপল ফগ। রাস্তা ধরে কিছুটা দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

ঝোপের মধ্যে বসে সবই দেখতে পেল কিশোর। নীরবে খুব একচোট হেসে নিল। মনে মনে বলল, ‘থাকো বসে ওখানে সারারাত। বিচ্ছু ছেলেটাকে আর ধরতে হবে না।’

টিটুকে সঙ্গে আনেনি বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। মাথা উঁচু করল না। নেমে পড়ল রাস্তার

পাশের খাদে। ওটা পার হয়ে মাঠে উঠল। ঝোপঝাড় আর গাছপালার অভাব নেই। ওগুলোর আড়ালে আড়ালে এখন অনেক দূর চলে যেতে পারবে ফগ আর ক্যামারের চোখ এড়িয়ে। তারপর ঘুরে ফগকে পার হয়ে গিয়ে আরেক জায়গা দিয়ে রাস্তায় উঠে পড়লেই হলো। নিরাপদে চলে যেতে পারবে বাড়িতে।

সাত

পরদিন সকালে নাস্তা করতে বসেছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন। মিসেস বারজি এসে বলল, 'তোমার ফোন। রবিন করেছে।'

একা সামলাতে পারেন না মেরিচাচী, তাই ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্যে মিসেস বারজিকে রেখেছেন। মেরিচাচীরা যখন এখানে থাকেন না, রকি বীচে চলে যান, তখন গ্রীনহিলসের তাঁদের বাড়ি দেখাশোনার ভারও মহিলার ওপর।

এত সকালে ফোন! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। নিশ্চয় নতুন কোন তথ্য কিংবা সূত্র পেয়েছে রবিন।

'হালো?'

'কিশোর?' ভেসে এল রবিনের উত্তেজিত গলা, 'হুবার ফিরে এসেছে। ফগ এখনও জানে না। তাই আগেভাগেই তোমাকে জানানো প্রয়োজন মনে করলাম।'

'তাই নাকি? খুব ভাল করেছ। কে বলল তোমাকে?'

'কিটি। সকালে বাগানে বেরিয়েছি। আমাকে দেখে এসে দেয়ালের ওপাশ থেকে কথা বলল। কাল রাতে নাকি পেঁচার ডাক শোনার জন্যে কান পেতে ছিল, এই সময় গেট খোলার আওয়াজ পায়।'

'কটার সময়?'

'রাত দুটো। চোর এসেছে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে চোর না, হুবার। চাঁদের আলোয় চিনতে ভুল হয়নি ওর। বসার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে হুবার।'

'ওর পরনে কি ছিল?'

'ড্রেসিং-গাউনের মতই নাকি লেগেছে কিটির কাছে। হাতে কিছু ছিল না

'তবে আগের রাতে বেরোনোর সময় একটা কিছু নিয়ে যে বেরিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাল রাতে চৌকিদার নিশ্চিত করেছে আমাকে এ ব্যাপারে।'

'তাহলে ওটা আর সঙ্গে আনেনি,' রবিন বলল। 'কারণ হাতে যে কিছু ছিল না, এ ব্যাপারে কিটিও নিশ্চিত।'

'এক কাজ করো। মুসা আর ফারিহাকে ফোন করে তোমাদের বাড়িতে আসতে বলে দাও। আমি নাস্তা খেয়েই চলে আসছি। ঝামেলাও এ কেসের তদন্ত করছে। অনেকখানি এগিয়ে গেছে বলেই আমার ধারণা। আমরা যে পথে এগোচ্ছি, ঠিক সেই পথে সেও এগোচ্ছে...'

'কিশোর, তোর নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেল,' ডাক দিলেন মেরিচাচী, 'জলদি আয়।'

'আসছি,' মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে চিৎকার করে জবাব দিল সে। 'রাখি,

রবিন। যা বললাম করো,' রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে মনে পড়ল কথাটা। 'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ফারিহাকে বোলো বেড়ালের বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে।'

খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে গুঁজে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। ঝুড়িতে বসিয়ে নিয়েছে টিটুকে। টপ স্পীডে রওনা হলো রবিনদের বাড়িতে।

পথে ফগকে দেখতে পেল। আরেক রাস্তা দিয়ে আসছে। তবে অনেক দূরে রয়েছে এখনও। কিশোরকে দেখে জোরে জোরে হাত নেড়ে থামতে ইঙ্গিত করল। নিশ্চয় আগের রাতের কথা জিজ্ঞেস করতে চায়।

থামল না কিশোর, যদিও আগের রাতে কতক্ষণ পর্যন্ত তার অপেক্ষায় বসে ছিল ফগ জানার খুব আগ্রহ। রবিনদের বাড়িতে না গিয়ে আরেকদিকে সাইকেল চালিয়ে দিল সে।

কিশোরকে ধরার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল ফগ। গায়ের জোরে প্যাডেল চাপতে লাগল।

কিশোরও বাড়িয়ে দিল গতি। মোড় ঘুরে এসে লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা নির্জন বাড়ির বাগানে। বেড়ার পাশে লুকিয়ে বসল।

ফগও মোড়ের এ পাশে বেরিয়ে এল। লাল টকটকে হয়ে গেছে মুখ। হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। উড়ে চলে গেল যেন বেড়ার ওপাশের রাস্তা দিয়ে। কিশোর চুপ থাকতে বলল টিটুকে।

ফগ চলে গেলে বেরিয়ে এল কিশোর। সাইকেলে চেপে উল্টোদিকে রওনা হলো।

ঘামতে ঘামতে এসে রবিনদের বাড়িতে ঢুকল। ওর ঘরে ঢুকে দেখল মুসা, ফারিহা, রবিন সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ফারিহার কোলে বেড়ালছানাটা। ওটাকে আদর করছে সে।

দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইল রবিন।

'ঝামেলা পিছে লেগেছিল,' জানাল কিশোর। 'হুবারের খবর কি?'

'ওকে দেখা যাচ্ছে না,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় বাড়িতে লুকিয়ে বসে আছে। বেড়াল আনতে বলেছিলে কেন? ওটা ফেরত দেয়ার ছুতোয় ওর সঙ্গে দেখা করার মতলব নাকি?'

'পারলে মন্দ হত না।'

'ও কি তোমাকে দেখলে খুশি হবে ভেবেছ?'

'না হলে না হোক। এ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাই না। ঝামেলার আগেই গিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

ফারিহার হাত থেকে বেড়ালছানাটা নিল কিশোর। অমনি খউ খউ করে উঠল টিটু। ধমক দিল কিশোর, 'চুপ কর্, হিংসুটে কোথাকার!'

বেরিয়ে এল সে। হুবারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল। কোন্‌দিক দিয়ে ঢুকবে? সামনে, না পেছন? একেবারেই নির্জন লাগছে বাড়িটা। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে যে ফিরেছে এটা কি বুঝতে দিতে চাইছে না হুবার?

যা হোক কিছু একটা তাড়াতাড়ি করে ফেলা দরকার। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। যে কোন সময় ফগ চলে আসতে পারে। পেছন দিয়ে যাওয়াই স্থির করল সে।

সামনের গেট দিয়ে ঢুকে সাবধানে পা টিপে টিপে ঘুরে বাড়ির পেছনে চলে এল। ভাঙা জানালাটার দিকে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। তারমানে লুকিয়ে থাকাই ঠিক করেছে হুবার। তাই যদি হয়ে থাকে সামনের গেটের বেল টিপলে দরজা খুলবে না। তাহলে কি করে ওকে বের করে আনবে?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল কিশোর। বনবন ঘুরতে লাগল যেন মগজের চাকাগুলো। বেড়ালছানাটার জন্যে উদ্বিগ্ন হবেই হুবার। জানালার ভাঙা ফোকরে মুখ রেখে বেড়ালের স্বর নকল করে ডেকে উঠল, 'মিআউ!'

আট

মিআউ! মিআউ! মিআউ!

ডেকেই চলল কিশোর। করুণ, ক্ষুধার্ত বেড়ালছানার ডাক। যে কারও হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

নিজের ডাক অন্যের মুখে শুনে প্রথমে কেমন অবাক হয়ে গেল ছানাটা। কিশোরের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে মোড়ামুড়ি শুরু করল। না পেরে সুর মিলিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল মিআউ মিআউ করে।

ফিসফিস করে ছানাটাকে উৎসাহ দিল কিশোর, 'গুড, চালিয়ে যা। আরও জোরে।'

ওটাও চেঁচিয়েই চলল।

নিজে ডাকাডাকি বন্ধ করে কান পাতল কিশোর। ঘরের মধ্যে কোন শব্দ হয় কিনা শোনার চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। কেউ নড়ছে। হালকা পায়ের শব্দ। থেমে গেল। রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একজন লোক, যেটা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।

এই লোকই নিশ্চয় হুবার—ভাবল কিশোর। ভাল করে তাকাল লোকটার দিকে। পরনে শার্ট-প্যান্ট। ড্রেসিং গাউন আশা করেছিল সে। এখনও কিশোর আর ছানাটাকে দেখতে পায়নি। রান্নাঘরের ভেতরে এদিক ওদিক চোখ বোলাচ্ছে। বুঝতে চাইছে কোনখান থেকে আসছে শব্দটা।

লোকটার বয়স খুব বেশি না। তরুণই বলা চলে। পাতলা মুখ। উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চুল সুন্দর করে পেছন দিকে আঁচড়ানো। দেখে মনেই হয় না এই লোক রাত দুপুরে ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে।

'মিআউ!'

আবার কিশোরের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল ছানাটা।

জানালার দিকে তাকাল লোকটা। কিশোরের কাঁধ আর মাথা চোখে পড়ল। বড় মানুষ ভেবে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হলে ঢুকতে গিয়েও থেমে গেল। ফিরে

তাকাল। ভাল করে দেখে বুঝল কিশোর বড় মানুষ নয়। ওর হাতে রয়েছে বেড়ালছানাটা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। ধরা পড়ে গিয়ে বিব্রত বোধ করছে যেন।

জানালার ফোকরের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'এটা আপনার বেড়াল? খিদেয় মিউ মিউ করছিল। বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি।'

হাত দিয়ে ডলে চুল সমান করল লোকটা। জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমার। দাঁড়াও, দরজাটা খুলে দিচ্ছি।'

দরজার তালা আর ছিটকানি খুলল লোকটা। সাবধানে পাল্লা খুলে হাত বাড়াল, 'দাও।'

কিশোর বুঝতে পারল, ছানাটা ওর হাতে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগিয়ে দেবে লোকটা। কথা বলার আর সুযোগ দেবে না। তাই ছানাটাকে আগের মতই ধরে রেখে বলল, 'আপনার ঘরে চোর ঢোকা নিয়ে গাঁয়ে মহা উত্তেজনা। এখানে পুলিস এসেছিল, জানেন?'

অবাক মনে হলো হুবারকে। 'পুলিস! কেন? বাড়িতে যে লোক ছিল না জানল কি করে?'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। দুধওয়ালা যে সারা গাঁয়ে খবরটা রটিয়েছে, হুবার তাহলে জানে না। ফগ এসে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে এ কথাও জানে না। তার ধারণা, কেউ কিচ্ছু জানে না। এমনকি সে যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এ কথাও নয়।

'কি হয়েছিল, বলছি সব,' হুবারের পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর।

বাধা দিল না হুবার। বরং কি ঘটেছিল শোনার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরের দরজা লাগিয়ে দিল। কিশোরকে বসার ঘরে নিয়ে এল।

জিনিসপত্র সব এখন গোছগাছ করা। বাড়ি ফিরে আবার সব সাজিয়ে ফেলেছে হুবার।

বেড়ালটাকে ছেড়ে দিয়েছে কিশোর। মিউ মিউ করে ওদের পিছু নিল ওটা।

'দুধ চাস নাকি?' ছানাটাকে জিজ্ঞেস করল হুবার। 'সরি, দিতে পারব না। দুধওয়ালা আসেনি আজ।'

'পুলিস বোধহয় আসতে মানা করে দিয়েছে,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল কিশোর। 'বলেছে আপনি বাড়ি নেই।'

'পুলিসের এত ঠেকা পড়ল কেন এসে খোঁজাখুঁজি করার?' বিরক্ত হয়ে বলল হুবার। 'কেউ কি বাড়ি ফেলে দুচার দিনের জন্যে বাইরেও যেতে পারবে না?'

'পুলিস খবর পেয়েছে চোর ঢুকেছে আপনার বাড়িতে। জিনিসপত্র সব ওলটপালট হয়ে ছিল।' হুবারের চোখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল কিশোর, ওর কথা শুনে লোকটা চমকে যায় কিনা। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি ঢুকে সব অগোছাল দেখতে পাননি?'

দ্বিধা করতে লাগল হুবার। আর কিছু যেন বলতে চায় না। শেষে আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ, তা পেয়েছি। কিন্তু পুলিসকে খবর দিল কে?'

'দুধওয়ালা।' ছানাটাকে পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে কোলে তুলে নিয়ে

আদর করল কিশোর। 'দুধ দিতে এসে দেখে সামনের দরজা খোলা। সন্দেহ হয় তার। ডাকাডাকি করে আপনাকে না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে জিনিসপত্র সব তছনছ। তখন পুলিসকে খবর দেয় সে।'

'ও, তাই নাকি! আমি কিছুই জানতাম না।'

'বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলেন আপনি?' আচমকা প্রশ্ন করল কিশোর। জবাবটা জানা আছে ওর। হুবার সত্যি বলে কিনা মিলিয়ে দেখতে চায়।

আবার দ্বিধা করতে লাগল হুবার। 'আগের রাতে। বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। গতরাতে ফিরেছি। ফিরে দেখি জিনিসপত্র সব ছড়ানো। তবে কোন কিছু চুরি হয়নি। আমার অনুমতি ছাড়া এ ভাবে নাক গলানো উচিত হয়নি পুলিসের।'

'দরজা খোলা থাকাতেই এই বিপত্তিটা ঘটল আরকি। আপনি কি দরজা লাগিয়ে গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই।'

বিশ্বাস করল না কিশোর। রাতে কি চোর এসেছে সাড়া পাওয়ার পরে পালিয়েছিল নাকি, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু করল না। জানে, সত্যি জবাব পাবে না। এখন তো শার্ট-প্যান্ট পরা আছে। পায়ে জুতো। ড্রেসিং-গাউন আর স্লিপারটা কোথায় খুলে রেখেছে হুবার? ওপরতলায়? দেখতে পারলে হত।

জানালায় উঁকি দিল হেলমেট পরা একটা লাল টকটকে মুখ। ফগর‍্যাম্পারকট!

চিৎকার করে উঠল হুবার, 'কে? পুলিস! আবার এসেছে! এর একটা বিহিত না করলেই নয়!'

'ঠিক বলেছেন, স্যার, এর একটা বিহিত করা দরকার। ওদের জ্বালায় কোন মানুষ নিজের বাড়িতে শান্তিতে থাকতে পারবে না, তা কেন হবে?'

রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়ে এদিক দিয়েই যাচ্ছিল ফগ। হুবারের বাড়িটা চোখে পড়তে মনে হলো একবার উঁকি মেরে দেখে যায়। তাই দেখতে এসেছে।

হুবারের সঙ্গে কিশোরকে দেখে ওর গোল চোখ আরও গোল গোল হয়ে গেল। হাঁ হয়ে গেল মুখ। আবার নাক গলাতে এসেছে ওই বিচ্ছু ছেলেটা! ওর আগেই এসে বসে আছে। চিৎকার করে হুবারকে বলল, 'দরজাটা খুলুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

জ্বলন্ত চোখে ফগের দিকে তাকাল হুবার। গটমট করে গিয়ে জানালার শার্সি খুলে দিল। 'কি কথা? এ ভাবে উঁকি মারছেন কেন? দেখছেন না একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি? কি দরকার আপনার?'

'ঝামেলা! বন্ধু! ওর মত একটা ছেলে আপনার বন্ধু?'

'অপমান করে কথা বলছেন কেন? দাঁড়ান, হেড অফিসে গিয়ে আমি রিপোর্ট করব আপনার নামে। আমি চোর-ডাকাত নই, বেআইনী কিছুই করিনি যে পুলিস বার বার আমার বাড়িতে আসবে।'

'ঝামেলা!...ইয়ে, ঝামেলা!' কথা হারিয়ে ফেলল ফগ। কাশি দিল। 'ইয়ে...আপনার বাড়িতে চোরের উপদ্রব হয়েছিল...'

'হয়েছিল তো আপনার কি? আপনাকে কে উপদ্রব করতে বলেছে?'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল কিশোর।

'আপনার সামনের দরজা খোলা ছিল,' কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল ফগ। 'ভাবলাম...'

'কে ভাবতে বলেছে আপনাকে?' ধমকে উঠল হুবার, 'যান, ভাগুন এখান থেকে!'

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করল কিশোরের। হুবারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল। চিরকাল ওদেরকে 'যাও ভাগো' বলে ধমকে এসেছে ফগ, এখন কেমন মজা? নিজের শুনতে কেমন লাগছে!

রেগে গেল ফগ। 'আহ্...ইয়ে...ঝামেলা! আপনি কোনও প্রাণীকে বাড়িতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেলে যেতে পারেন না। সেটা অমানবিক। বেআইনী।'

'বেড়ালছানাটা ক্ষুধার্ত ছিল না!' বলে ফগের মুখের ওপর শার্সিটা লাগিয়ে দিতে গেল হুবার।

চট করে রোমশ একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঠেকাল ফগ। 'ছানাটা নাহয় ছিল না। কিন্তু কুকুরটা? শুয়োরটা?'

ভুরু কুঁচকে ফগের দিকে তাকিয়ে রইল হুবার। 'কি বলছেন আপনি, কনস্টেবল? কিসের কুকুর? কিসের শুয়োর? পাগল হয়ে গেলেন নাকি?'

'পাগল, না? ঝামেলা! শুধু কুকুর আর শুয়োরের ডাকই শোনা যায়নি, একটা শিশুর কান্নাও শোনা গেছে এ বাড়িতে। চিৎকার করে ওর মাকে ডাকছিল।'

হুবারের চেহারা দেখে মনে হলো, ফগ যে পাগল হয়ে গেছে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তার আর।

কিশোর ভাবল, এইই সুযোগ। ওরা দুজন কথা কাটাকাটি করতে থাক। সে গিয়ে ওপরতলাটা দেখে আসতে পারে। একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর। বেড়ালছানাটাকে নিয়ে রওনা দিল সিঁড়ির দিকে। সঙ্গে নেয়ার কারণ—হুবার জিজ্ঞেস করলে ছুতো দেবে, তার কোল থেকে নেমে পালাচ্ছিল এটা, ধরার জন্যে সেও ছুটেছে পেছনে।

নিচতলায় ফগ আর হুবারের চিৎকার বেড়েছে। একটা কথা ভেবে কিশোরেরও অবাক লাগল, কুকুর, শুয়োর আর শিশুর কান্নার কথা কার কাছে শুনল ফগ? চুরি হওয়ার খবর শুনে ওরাও তো এসেছিল এ বাড়িতে। কই, বেড়ালছানাটা ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ার তো দেখেনি?

তবে কি কিটিকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল ফগ? লোকটাকে দেখতে পারে না বলে বানিয়ে বানিয়ে উল্টোপাল্টা বলে দিয়েছে কিটি?

হ্যাঁ, তাই হবে। মুচকি হাসল কিশোর।

ওপরতলার যে ঘরটায় ঢুকল সে প্রথম, সেটাও গোছগাছ করা। গুছিয়ে ফেলেছে হুবার। ওর স্লিপার আর ড্রেসিং-গাউনটা খোঁজায় মন দিল সে।

নয়

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। একটা স্লিপারও চোখে পড়ল না। না না,

আছে। একজোড়া লাল স্লিপার।
উল্টে দেখতে লাগল সে।
কাদা লাগা। প্রচুর কাদা। এগুলো পায়ে দিয়ে রাস্তায় হেঁটেছে হুবার, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
খাটের নিচ থেকে টেনে বের করল একটা লাল-সাদা পাজামা। ঠোঁট গোল করে শিস দিয়ে উঠল। পাজামার নিচের দিকটায় কাদামাখা। আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। এই কাদা কোথা থেকে এসেছে, ওর জানা।
নদীর কিনার থেকে।
এবার ড্রেসিং-গাউনটা দরকার। পাওয়া গেল ওটাও। একটা উঁচু আলমারির মধ্যে। ওটাও নোংরা। তবে তাতে কাদার বদলে খড়ের টুকরো লেগে আছে। ড্রেসিং-গাউনটা পরে কোথায় ঢুকেছিল হুবার?
আস্তে করে আলমারির দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।
'মোটেও বন্ধুর বাড়িতে যায়নি হুবার,' ভাবল সে। 'বন্ধু কি আর তাকে খড়ের গাদায় শুতে দিয়েছিল নাকি। আসলে খড় আছে এমন কোনখানে ঢুকে লুকিয়েছিল সে। গোলাঘরে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রাতে রাস্তাঘাট সব নির্জন হলে ওখান থেকে বেরিয়ে চুপচাপ বাড়ি ফিরে এসেছে। চৌকিদার কি ফিরতে দেখেছে ওকে? তাহলে ভাববে আমার আক্কেল পম। হাহ্ হাহ্!'
নিচতলার গরম গরম কথাবার্তা থেমে গেল।
দড়াম করে একটা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। মেঝেতে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে ডাকতে আরম্ভ করল কিশোর, 'পুষি, পুষি, অ্যাই পুষি!'
সিঁড়িতে একটা ডাক শোনা গেল, 'ওখানে কি করছ? জলদি নেমে এসো।'
ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, 'সরি। বেড়ালছানাটা কোথায় জানি পালাল।'
'এই তো, নিচেই নেমে এসেছে,' তপ্ত কণ্ঠে হুবার বলল। 'এবার তুমিও বেরোও। ছানাটাকে খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। ওই নাকগলানো স্বভাবের পুলিসটাকে দেখে নেব আমি। ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট না করেছি তো আমার নাম হুবার নয়।'
'যাচ্ছি, স্যার,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর।
রাগ কমছে না হুবারের। 'লোকটা একটা আস্ত পাগল। কোন এক কিটি নাকি তাকে বলেছে আমার বাড়িতে কুকুর, শুয়োর আর বাচ্চা শিশুর কান্না শুনেছে। কেউ কিছু বলল আর অমনি বিশ্বাস করে বসতে হবে?'
পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল হুবার।
পেট ফেটে হাসি আসছে কিশোরের। চারপাশে তাকাল। আর কিছু দেখার নেই এ বাড়িতে। নতুন কিছু আর বলারও নেই হুবারের। অতএব কেটে পড়া যায়।
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলল, 'যাচ্ছি, স্যার। আপনি চলে এসেছেন, ছানাটার আর কোন অসুবিধে হবে না।'
'না, হবে না,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল হুবার। 'এখন যাও তো। আমাকে একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।'

বেরিয়ে এল কিশোর। শিস দিতে দিতে এগোল গেটের দিকে। হুবারের বাড়িতে ঢুকে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। ফগের চেয়ে অনেক বেশি জানে এখন সে। ফগ ওবাড়িতে ঢুকতেও পারেনি, কাদামাখা স্লিপার আর পাজামাটাও দেখেনি।

গেটের বাইরে বেরোতেই পড়ল ফগের মুখোমুখি। অপেক্ষা করছিল সে। 'ঝামেলা!'

'কিসের ঝামেলা?' যেন কিছুই বুঝতে পারছে না কিশোর।

লাল হয়ে গেল ফগের গাল। কটমট করে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তাহলে তুমি ওই লোকটার বন্ধু। জবর খবর। তোমার মত পাজি ছেলে যে কোন বড় মানুষের বন্ধু হতে পারে, ভাবতেই অবাক লাগছে।'

'শুনে খুশি হলাম।'

ঠাস করে চড় মারার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল ফগ। 'যতই চালাকি করো, বিচ্ছু, এবার আর পার পাবে না। তোমার নামেও রিপোর্ট লিখব আমি।'

'কেন, আমি আবার কি করলাম?'

'কি করেছ, থানায় গিয়ে রুলের গুঁতো খেলেই বুঝবে।'

'রিপোর্টটা কি লিখবেন সেটাই তো বুঝলাম না। কাল রাতে চৌকিদার কিছু বলেছে বুঝি আমার নামে? আমি তো বেআইনী কিছু করিনি। আমার আঙ্কেল পমকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। সাবধান, তার সঙ্গে ঝামেলা করতে যাবেন না, মাথা খারাপ লোক··'

'ঝামেলা!' আগে বাড়ল ফগ। কিশোরকে টেনে টেনে ছিঁড়তে পারলে এখন জ্বালা কমত তার। জীবনে এত রাগা বোধহয় আর রাগেনি। বাধা না পেলে নিজেকে সামলাতে পারত না, হাত তুলে বসত। তারপর পড়ত আরও ঝামেলায়। টিটু ওকে বাঁচিয়ে দিল। খউ খউ করতে করতে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তেড়ে এল গোড়ালি কামড়ানোর জন্যে।

আর সবাই যেমন তেমন, টিটুকে পরোয়া না করে উপায় নেই। সোজা সাইকেলের দিকে দৌড় দিল ফগ। লাফ দিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে প্যাডেল চাপতে গিয়ে একটা পা গেল ফসকে। ঝাঁকি লাগল। আরেকটু হলে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল সে।

পেছন পেছন খানিকদূর দৌড়ে গেল টিটু। তারপর ফিরে এল।

হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে রাস্তার ওপরই গড়াগড়ি খেতে লাগল কিশোর।

হুবারের বাড়িতে গিয়ে কি করল কিশোর, জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সবাই। তাই হাসিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

'হুঁ, তোমার অনুমান দেখা যাচ্ছে সবই ঠিক,' শোনার পর মাথা দুলিয়ে বলল ফারিহা। 'পাজামা আর স্লিপার পরেই পালিয়েছিল হুবার। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থেকেছিল।'

'এবং সঙ্গে করে কোন জিনিস নিয়ে গিয়েছিল,' যোগ করল কিশোর। 'কিন্তু ফিরে যখন এল—কিটির কথা অনুযায়ী—তার হাতে তখন আর কোন কিছু ছিল না। তারমানে জিনিসটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে।'

'নিশ্চয় কোন খড়ের গাদায়,' রবিন বলল। 'গ্রীনহিলসে ওগুলোর অভাব নেই।

অসংখ্য খড়ের গাদা আর গোলাঘর আছে। কোনটাতে রাখল?'

'জানি না। প্রয়োজন হলে খুঁজে বের করতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'হাতে সময় আমাদের কম। স্কুল খুলতে আর বেশি বাকি নেই। তার আগেই কাজ সারতে হবে।'

কিন্তু কি করে কাজটা সারবে, অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে জিনিসটা খুঁজে বের করবে, কারও মাথায় ঢুকল না। গ্রীনহিলসের সমস্ত খড়ের গাদা আর গোলাঘরে জিনিসটা খুঁজে বেড়ানো খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়ে কঠিন। তা ছাড়া ওরা জানেও না কি জিনিস হাতে করে নিয়ে গিয়েছিল হ্বার।

যাই হোক, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে গত রাতে চৌকিদারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কি করে এসেছে কিশোর, ফগকে কিভাবে হেনস্তা করেছে, বলার সুযোগ পেল এতক্ষণে।

শুরু হলো আরেকবার হাসাহাসি।

হাসতে হাসতে ফারিহা বলল, 'কিশোর, তুমি না, সত্যি কি বলব···হি-হি-হি! ওই ফগটাও হলো একটা আস্ত বোকা, তোমার পিছে লাগতে যায়। নিশ্চয় কাল সারারাত নদীর ধারে ঠাণ্ডার মধ্যে বসে থেকেছে তোমাকে ধরার জন্যে।'

'হয়তো,' কিশোরও হাসছে। 'বুড়ো ক্যামারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে।'

'চলো না গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'হাতে তো কোন কাজ নেই আমাদের। সময় কাটবে।'

রাজি হয়ে গেল সবাই।

দশ

নদীর পাড়ে গিয়ে দেখল বুড়ো ক্যামারের কুঁড়ের দরজা বন্ধ। সারারাত জেগে থেকে এখন নিশ্চয় ঘুমাচ্ছে সে। এই কথাটা কারও মনে হয়নি আগে। ডাকাডাকি করাটাও উচিত হবে না এখন।

নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এই সময় মুসা দেখল নদীর পাড়ে একটা ছাউনির ধারে নৌকার তলায় আলকাতরা লাগাচ্ছে তার এক পরিচিত মাঝি। নাম ওয়ালি ভইলবার্ন। পাশে বসে আছে ওর টেরিয়ার কুকুরটা।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'দাঁড়াও, পাওয়া গেছে লোক। জিজ্ঞেস করে আসি।'

সাইকেল রেখে মুসার পেছন পেছন চলল বাকি সবাই।

লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুসা।

টিটুকে দেখে এগিয়ে এল টেরিয়ার কুকুরটা।

ব্রাশ ডলা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ওয়ালি। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, স্কুল শুরু হয়নি এখনও?'

'না। আর অল্প কদিন বাকি।'

'এ সময়ে নদীর পাড়ে কি মনে করে?'

'একজন লোকের খবর নিতে এসেছি।'

'কে?'

'ওর চাচা,' কিশোরকে দেখাল মুসা, 'আঙ্কেল পম। রাতে ঘুমের মধ্যেই উঠে হাঁটতে বেরিয়ে যান। কোথায় যান, কি করেন, কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। পরশুদিন রাতেও নাকি বেরিয়েছিলেন। কিশোরদের কাজের মেয়েটা জানালার বাইরে তাকিয়েছিল, সাহেবের হাতে একটা জিনিস ছিল দেখেছে। কি জিনিস, চিনতে পারেনি। পরদিন সেকথা আর মনে করতে পারলেন না আঙ্কেল পম। আমাদের পাঠিয়েছেন খোঁজ নিতে। বলেছেন, জিনিসটা খুঁজে বের করে দিতে পারলে পুরস্কার দেবেন।'

আগ্রহী মনে হলে ওয়ালিকে। 'কোথায় খুঁজতে হবে বলেছেন কিছু?'

'ছোট্ট একটা সূত্র দিতে পেরেছেন। রাতে বেরিয়ে যেদিকে গিয়েছিলেন তিনি, সেদিকে নাকি শুধু পানি আর পানি দেখেছেন। পরদিন তাঁর স্যাণ্ডেল আর কাপড়েও কাদা পাওয়া গেছে।'

অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। বুঝতে পারছে না, কোনদিকে এগোচ্ছে সে।

'পানিতে ফেলে দেননি তো?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ওয়ালি।

'সেটাই তো জানতে এলাম। নদীর পাড়ে থাকেন। রাতে এদিকে কেউ এলে হয়তো চোখে পড়তে পারে।'

মুসার উদ্দেশ্য এতক্ষণে বুঝতে পারল কিশোর। হুবার জিনিসটা এনে নদীর পাড়ে কোথাও লুকিয়েছে কিনা, কিংবা পানিতে ফেলে দিয়েছে কিনা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করে সেটা জানতে চাইছে। বাহ্, মাথাটা তো ভালই খেলছে মুসার—মনে মনে প্রশংসা করল সে। যেহেতু নদীর দিকে এসেছিল হুবার, তার স্লিপার আর পাজামায় কাদাও লেগে আছে, জিনিসটা নদীর পাড়েই কোথাও লুকিয়ে রেখে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। কিংবা পানিতেও ফেলে দিতে পারে।

আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল কিশোর, ওয়ালি কি জবাব দেয় শোনার জন্যে।

মাথা নাড়ল ওয়ালি, 'না, রাতে কাউকে দেখিনি। তবে কাল রাতে চেঁচামেচি শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনি, বুড়ো ক্যামারকে ধমকাচ্ছে ফগর্যাম্পারকট। কোন্ একটা ছেলেকে নাকি ধরতে চেয়েছে, ধরতে পারেনি বলেই রাগ।'

পরস্পরের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। সবার মুখেই হাসি।

'আর কি শুনলেন?' জানতে চাইল মুসা।

'না, আর কিছু না। কিছুক্ষণ পর বুড়োকে কড়া নজর রাখার হুকুম দিয়ে চলে গেল ফগ। আজ সকালে এসে হাজির আমার কাছে। নৌকাটা রেডি করে দিতে বলেছে। ভাড়া নেবে।'

'কেন?'

'কি জানি! বলল, দরকার, রেডি করে রাখতে।' বাঁ হাতে কানের গোড়া চুলকাল ওয়ালি। 'আজ যেন আমার নৌকা আর বোট-হুকের দাম বেড়ে গেছে হঠাৎ করে।'

কান খাড়া করে ফেলল কিশোর, 'মানে?'

'আরও একজন এসেছিল নৌকা আর বোট-হুক চাইতে।'

কে? হুবার নাকি? পানিতে ডুবিয়ে রাখা বস্তায় ভরা জিনিস বা ওই রকম কিছু খুঁজে বের করার জন্যে অনেক সময় বোট-হুক ব্যবহার করে লোকে। ফগ আর হুবার দুজনেই হুকটা চায়, তারমানে দুজনেই পানিতে খুঁজতে বেরোবে মনে হচ্ছে। ফগকে যতটা মাথামোটা ভাবে ওরা, আসলে ততটা নয়। সেও অনুমান করে বসে আছে নদীর দিকেই এসেছিল হুবার, হাতের জিনিসটা পানিতে ফেলে গেছে। একটা ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া গেল—হুবার যে খড়ের গাদায় গিয়ে শুয়ে ছিল, এ কথা এখনও জানে না ফগ।

'এই দ্বিতীয় লোকটা কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'চিনি না, জনমেও দেখিনি,' জবাব দিল ওয়ালি। 'বিশালদেহী এক লোক। গায়ের রঙ বাদামী। গালে একটা কাটা দাগ। একটা চোখেও গোলমাল আছে। দশটা ডলার বাড়িয়ে দিয়ে আমার সবচেয়ে লম্বা হুকটা ভাড়া নিতে চাইল। বোঝো ঠেলা, একটা বোট-হুকের জন্যে দশ ডলার দিতে চায়! লোকটাকে পাগল মনে হয়েছে আমার। নিজেকে পরিচয় দিল বিজ্ঞানী বলে। পানির নিচে জন্মে থাকা উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করবে।'

'তাই,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। দ্বিতীয় লোকটা হুবার নয়। তাহলে কে? নিশ্চয় সেই লোকটা, যে বারো নম্বর জুতো পায়ে দেয়, চুরি করে সেদিন হুবারের বাড়িতে ঢুকেছিল যে।

ওয়ালিকে ধন্যবাদ দিয়ে সবাইকে নিয়ে ওখান থেকে সরে এল কিশোর।

টিটুর সঙ্গে আসতে চাইল টেরিয়ারটা। কয়েক মিনিটেই ভাল খাতির হয়ে গেছে। ডেকে ওকে ফিরিয়ে নিল ওয়ালি।

ওদের সাইকেলগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে, 'জলজ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহের গল্পটা বিশ্বাস করেছ?'

'এক বিন্দুও না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল রবিন। 'আমার মনে হয় সেই চোরটা। সেও সন্দেহ করেছে, হুবার নদীর দিকে এসেছে, হাতের জিনিসটা পানিতে ফেলে দিয়েছে।'

'ফগেরও একই সন্দেহ।'

'আমি যাব না,' বলে উঠল ফারিহা। 'ঝামেলা নদীতে নেমে কি করে না দেখে আমি যাব না এখান থেকে।'

খানিক চিন্তা করে কিশোর বলল, 'এক কাজ করা যাক, তোমরা গিয়ে বসে থাকো ওয়ালির ছাউনিতে। ফগ এসে কি করে দেখবে। আমি থাকব না। আমাকে দেখলেই ভীষণ রেগে যাবে সে। কি করে বসে ঠিক নেই।'

'তুমি কোথায় যাবে?' জানতে চাইল মুসা।

'ওই দ্বিতীয় লোকটাকে খুঁজে বের করা যায় কিনা দেখি।'

'কিভাবে?'

জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'এসো, সাইকেলগুলো লুকিয়ে ফেলা যাক। ফগ যাতে এসেই দেখে না ফেলে।'

ঝোপের মধ্যে সাইকেলগুলো লুকিয়ে আবার ছাউনির কাছে ফিরে এল ওরা।

মুখ তুলে তাকাল ওয়ালি, 'কি?'

'আমরা ঠিক করেছি, আজ নদীতে পিকনিক করব। আপনার ছোট নৌকাটা দরকার। ফগ কাজ সেরে চলে যাবার পরেই নাহয় নেব।'

হেসে ফেলল ওয়ালি, 'বোট-হুক লাগবে না?'

কিশোরও হাসল, 'না। জলজ উদ্ভিদে আমারও খুব আগ্রহ। তবে ওই বিজ্ঞানীর মত এত কষ্ট করার কোন ইচ্ছে নেই। বরং তাকে খুঁজে বের করে কয়েকটা প্রশ্ন করব উদ্ভিদের ব্যাপারে। কোনদিকে গেছে?'

হাত তুলে নদীর কিনার ধরে এগিয়ে যাওয়া পায়েচলা পথটা দেখিয়ে দিল ওয়ালি।

'তোমরা বসো,' বন্ধুদের বলল কিশোর, 'আমি দেখে আসি।'

রওনা হয়ে গেল সে।

এগারো

হনহন করে হেঁটে চলেছে কিশোর। নজর সামনের দিকে।

নদীর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা পেয়ে গেল লোকটার। লম্বা একটা বোট-হুক দিয়ে পানিতে খোঁচাচ্ছে। পাশে রাখা একটা বেতের হাতলওয়ালা বড় ঝুড়ি। পানি থেকে নানা রকম উদ্ভিদ তুলে তাতে ভরছে।

একটা মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো কিশোরের, লোকটা সত্যি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী নয় তো? কিন্তু চেহারা দেখে পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে ফিরে তাকাল লোকটা।

নিরীহ স্বরে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি তুলছেন?'

জবাব দিল না লোকটা। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আপনার ঝুড়িতে নিশ্চয় অনেক শামুক জমা হয়েছে। বেছে নিতে পারি? আমি একটা হাঁস পালি...'

ধমকে উঠল লোকটা, 'খবরদার, ঝুড়িতে হাত দেবে না। শামুকের এত দরকার হলে নিজেই ধরে নাওগে না।'

'আমার মনে হয় এদিকটাতে শামুক অনেক বেশি। এখান থেকেই ধরি।'

'না!' গর্জে উঠল লোকটা। 'এখানে না! আমার নমুনা নষ্ট করবে। অন্য কোথাও যাও। সারা নদীতেই শামুক ভর্তি।'

দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। নিশ্চিত হয়ে গেছে, এই লোক বিজ্ঞানী নয়।

'গেলে না এখনও?' হুক তুলল লোকটা। কথা না শুনলে যেন কিশোরের বুকেই বিঁধিয়ে দেবে। 'যাও, ভাগো এখান থেকে!'

বাবারে! কি কাণ্ড! গ্রীনহিলসের সবাই আজকাল ফগের মুদ্রাদোষের শিকার হতে আরম্ভ করেছে নাকি? ফগ তো বলেই, হুবারও বলে 'যাও, ভাগো!' এই লোকটা বলে 'যাও, ভাগো!'

আরেকবার 'যাও, ভাগো' শোনার আগেই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে এল কিশোর। গেল না মোটেও। একটা ঘন ঝোপে বসে চোখের সামনে থেকে দুটো ডাল সরিয়ে উঁকি দিয়ে রইল।

আবার পানিতে খোঁচাতে শুরু করল লোকটা। মাঝে মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। কিশোর কোনখান থেকে উঁকি মেরে আছে কিনা দেখছে বোধহয়।

পানিতে যে কোন্ জিনিস খুঁজছে, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের।

হুকে কি যেন বাধল লোকটার। টেনে তুলে আনল। একটা পুরানো জুতো। হুক থেকে ওটা খুলে নিয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল আবার।

হুকে আটকে কয়েকটা জলজ উদ্ভিদ উঠে এল। ওগুলো খুলে নিয়ে ঝুড়িতে ভরল সে।

এটা ভান। কেউ যদি নজর রেখে থাকে তাহলে যাতে মনে করে এই লোক সত্যি জলজ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, আসলে খুঁজছে সে অন্য জিনিস।

পানি থেকে আবার একটা ফালতু জিনিস উঠে এল হুকে আটকে। আগের মতই বিরক্ত ভঙ্গিতে ওটা পানিতে ফেলে দিল লোকটা।

ফগ কি করছে জানার খুব কৌতূহল হলো কিশোরের। একের পর এক এ সব জিনিস উঠতে থাকলে ফগও বেজায় বিরক্ত হবে। কল্পনায় ওর মুখভঙ্গি দেখতে পেয়ে একা একাই নীরবে হাসতে লাগল সে।

মুসারা ওদিকে অপেক্ষা করছে ওয়ালির ছাউনিতে বসে।

ফগ এল। সাইকেল রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি, হয়েছে?'

'এই যে, হয়ে গেছে,' জবাব দিল ওয়ালি। 'দাঁড়ান, নামিয়ে দিচ্ছি।'

ওরা যে লুকিয়ে আছে এটা যাতে টের না পায়, এ জন্যে টিটুর মুখ চেপে ধরে আছে ফারিহা। টেরিয়ারটা চুপচাপ বসে আছে মুসার পায়ের কাছে। ওটা শান্ত কুকুর। টিটুর মত এত চঞ্চল নয়।

কোনমতেই টিটুর মুখ বন্ধ রাখতে পারল না ফারিহা। ফগের গন্ধ পেয়েই খউ খউ শুরু করল।

ওর কণ্ঠ ফগের পরিচিত। দরজায় এসে উঁকি দিল। 'ঝামেলা! এখানেও এসে বসে আছে! এই, তোমাদের পালের গোদাটা কই?'

'জানি না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ফগ, 'এখানে বসে থাকলে থাকো, কিছু বলব না। কিন্তু আবার যদি আমার কাজে নাক গলাতে এসেছ তো ভাল হবে না। তোমাদের বিচ্ছু বন্ধুটাকেও সাবধান করে দিয়ো।'

ফারিহার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো টিটু। গলা ছেড়ে হাঁক দেয়া বাদে ওর আর করার কিছু রইল না।

বেশি সময় নষ্ট করল না ফগ। নৌকায় চেপে বসল। হুক দিয়ে খুঁজতে শুরু করল পানিতে। আগের রাতে বুড়ো ক্যামারের কাছে জেনে নিয়েছে নদীর ঠিক

কোন্‌খানটাতে নেমেছিল পাজামা পরা লোকটা।

নৌকায় করে ঘুরতে ঘুরতে একের পর এক বিরক্তিকর জিনিস তুলে আনতে লাগল পানির নিচ থেকে। সেগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর 'ঝামেলা! ঝামেলা!' করতে থাকল। হঠাৎ চোখ পড়ল, তীরে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখছে ছেলেমেয়েগুলো। গেল মেজাজ খারাপ হয়ে। মশার দল আবার এসেছে বিরক্ত করতে। মশা! হ্যাঁ, মশাই! তফাৎটা কেবল, মশা কামড়ানোর জন্যে গায়ে বসলে থাপ্পড় মেরে প্রতিশোধ নেয়া যায়। এগুলোকে যায় না। কবে ঠাণ্ডা করে দিত, কেবল ক্যাপ্টেন রবার্টসনের জন্যে পারে না।

রাগ কমানোর জন্যে পানিতে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে হুক দিয়ে খোঁচাতে লাগল। উঠে আসতে লাগল নানা রকম জঘন্য জিনিস। মেজাজ আরও খারাপ করে দিল ওর।

তারপর এক সময় এমন একটা জিনিস উঠল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। একটা লন্ড্রি ব্যাগ। ওখানে বসেই তাড়াতাড়ি ওটার মুখ খুলে ফেলল সে। যা বেরোল, তাতে আবার থমথমে হয়ে গেল মুখচোখ। অতি সাধারণ বাতিল কতগুলো কাপড়-চোপড়। কোন শিশুর হবে। অকাজের জিনিস, তাই কেউ ব্যাগে ভরে এনে পানিতে ফেলে দিয়ে গেছে। ব্যাগটা যাতে ডুবে থাকে, সেজন্যে তাতে ভারী পাথর ভরে দিয়েছে।

তীরে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে আছে কিশোর গোয়েন্দারা।

আরও দুই জোড়া চোখ এখন আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে ফগের দিকে। সেই গালকাটা লোকটা। খুঁজতে খুঁজতে নদীর বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসে ফগের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়েছে। একটা ঝোপের আড়ালে সরে গিয়ে দেখছে, ফগ কি পায়। তার বোধহয় সন্দেহ হয়েছে, সে যা খুঁজছে, ওই পুলিসের লোকটাও তাই খুঁজছে।

লোকটা বাঁকের আড়ালে চলে আসাতে আর দেখতে পাচ্ছিল না বলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দেখা যায় এমন আরেকটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছে কিশোর। ফগকে সেও দেখতে পাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও আজেবাজে জিনিস ছাড়া কিছুই পেল না ফগ। নিরাশ হয়ে নৌকা নিয়ে তীরের দিকে রওনা দিল সে।

গালকাটা লোকটাও কিছু না পেয়ে চলে গেল।

ওর পিছু নিয়ে লাভ নেই। ঝোপ থেকে বেরিয়ে কিশোর এসে দাঁড়াল মুসাদের কাছে।

নৌকা থেকে নেমে কিশোরকে দেখে রাগ আর সামলাতে পারল না ফগ। চাকরির মায়া কিংবা ক্যাপ্টেনের ভয় আর করল না। সারারাত ওকে ঠাণ্ডার মধ্যে বসিয়ে রেখে শাস্তি দিয়েছে শয়তানটা। ওকে খানিকটা শিক্ষা না দিলেই আর নয়। নৌকায় ফেলে রাখা লন্ড্রি ব্যাগটা তুলে এনে খপ করে চেপে ধরল কিশোরের কলার। তারপর ঠাণ্ডা ভেজা পোশাকগুলো ঠেসে ভরে দিতে লাগল ওর শার্টের ভেতর। তার মতে, ঠাণ্ডার মধ্যে এরচেয়ে বড় শাস্তি আর হয় না।

বাধা দিতে এল ওয়ালি, 'এ কি করছেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট! একজন

পুলিসম্যান হয়ে...'

'চোপরাও!' গর্জে উঠল ফগ।

চুপ হয়ে গেল ওয়ালি।

মুসা আর রবিন এসে টানাটানি করে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল ফগকে। কিন্তু ফগের গায়ে যেন অসুর ভর করেছে। ব্যাগের সমস্ত জিনিস কিশোরের শার্টের ভেতরে ভরে দেয়ার আগে কোনমতে সরানো গেল না ওকে।

প্রতিশোধ নিতে পেরে রাগ অনেকটা কমল তার। কোনদিকে আর না তাকিয়ে সাইকেলে চেপে চলে গেল।

এক এক করে শার্টের ভেতর থেকে জিনিসগুলো বের করতে লাগল কিশোর। ওকে সাহায্য করল ফারিহা। বিড়বিড় করে বকতে লাগল ফগকে।

'থাক, বোকো না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি আমি ওকে। এটা করে খানিকটা মনের ঝাল যদি মেটে, মিটুক। আমাকে এমন করে কেউ ভোগালে আমিও শোধ নিতে ছাড়তাম না।'

পানি থেকে তুলে আনা কাপড়গুলোর মধ্যে রয়েছে একটা নীল পাজামা, একটা লাল বেল্ট, একটা নীল টাই, লাল বোতাম বসানো একটা নীল ক্যাপ, একজোড়া মোজা, একজোড়া লাল জুতো, আর একটা লাল...

থমকে গেল ফারিহা। জিনিসটা পরিচিত মনে হচ্ছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, দেখো দেখো!'

দেখল কিশোর। ওরও চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

একটা লাল দস্তানা!

ভালমত দেখার জন্যে ঘিরে এল মুসা আর রবিন। ওরাও চিনতে পারল। হুবারের বাড়িতে যে দস্তানাটা পেয়েছিল কিশোর, অবিকল ওরকম আরেকটা। জোড়াটার দ্বিতীয়টা।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'ফগের ওপর রাগ না করে বরং আমাদের কৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়া উচিত। আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে কতবড় সূত্র ফেলে চলে গেল, যখন জানতে পারবে, নিজের হাত নিজেই কামড়ে খেয়ে ফেলবে!'

এই সময় খেয়াল হলো ওর, টিটু নেই আশেপাশে। উত্তেজনায় কারোরই মনে ছিল না ওর কথা।

মুসা বলল, 'সেজন্যেই তো বলি, এত নিরাপদে কাজটা সারতে পারল কি করে ঝামেলা! টিটুই নেই। আহা বেচারা, গোড়ালি কামড়ানোর এমন মস্তবড় একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো ও। আজ ও ঠিক কামড়ে দিতে পারত। বাধা দিত না তো কেউ...'

'কিন্তু ও গেল কোথায়?' উদ্বিগ্ন হলো ফারিহা।

এতক্ষণে যেন সংবিত ফিরে পেল ওয়ালি। সকালে ও আজ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই নানা রকম কাণ্ড ঘটছে। অবাক হতে হচ্ছে বার বার। খানিক আগে ফগের রেগে যাওয়াটা তো রীতিমত বিমূঢ় করে দিয়েছে। ফারিহার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'নিশ্চয় আমার টেরিয়ারটার সঙ্গে মাঠে চলে গেছে। মাঝেমধ্যেই খরগোশ

ধরতে যায়। আজ সঙ্গী পেয়ে খুশির ঠেলায় বোধহয় শিকার শেখাতে নিয়ে গেছে তোমাদের কুকুরটাকেও। ভয় নেই, চলে আসবে।'

বারো

দল বেঁধে কিশোরদের বাড়িতে ফিরে এল সবাই। কিশোরের ঘরে বসে কথা বলতে লাগল।

কিশোরের ধারণা, পুতুলের কাপড়গুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে রহস্যের চাবিকাঠি। অতএব সেগুলো ভালমত খুঁজে দেখা দরকার।

দুপুর হয়ে গেছে। মুসাদের বাড়ি থেকে ফোন করলেন মিসেস আমান। রবিনের মাও খোঁজ নিলেন। অসুস্থ ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সেই সকালে, এখনও ফেরার নাম নেই। দুজনেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। মিসেস বারজি এসে প্রায় ধমকের সুরে জানিয়ে গেল সেকথা।

যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল ফারিহা। বিরক্ত হয়ে বলল, 'দূর, ফোন করার আর সময় পেল না! যখন আসল কাজটা শুরু করতে যাব তখনই···কিশোর, কথা দাও, আমরা না এলে দেখার কাজটা তুমি শুরু করবে না?'

হাসল কিশোর, 'আচ্ছা, করব না। নিশ্চিন্তে চলে যাও। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে চলে এসো।'

কিন্তু মুসারা বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর কমল, তবে একেবারে বন্ধ হলো না। কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি, কখনও ঝমঝম করে, পড়তেই থাকল।

আর কোন কাজ না পেয়ে পুতুলের পোশাকগুলো ইলেকট্রিক হিটারে শুকাতে বসল কিশোর। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে মন। কিন্তু ফারিহাকে কথা দিয়েছে দেখবে না, তাই দেখল না।

বিকেলের দিকে আকাশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। মুসা আর রবিনদের বাড়িতে ফোন করে জানল কিশোর, বেরোতে দিচ্ছেন না ওদের মায়েরা। সবে জ্বর থেকে না উঠলে হয়তো এভাবে বাধা দিতেন না।

কি আর করবে? মনমরা হয়ে বসে রইল কিশোর।

পুতুলের কাপড়গুলো নিজের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে ভরে রেখে খানিকক্ষণ টিভি দেখল। মন বসল না তাতে। বই পড়ার চেষ্টা করল। তাতেও মন বসাতে পারল না।

সন্ধ্যার পর চাচা-চাচী বেরিয়ে গেলেন। এক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি আছে। ফিরতে অনেক রাত হবে।

সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর।

অনেক রাতে টিটুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।

থামার জন্যে ওকে ধমকানো শুরু করল কিশোর।

কিন্তু থামল না কুকুরটা। দরজার কাছে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে

লাগল।

সন্দেহ হলো কিশোরের। চোর এল না তো?

দরজার দিকে এগোল। পাল্লাটা খুলতে না খুলতে একদৌড়ে বেরিয়ে গেল টিটু। নিচ থেকে 'কে? কে?' বলে চিৎকার করে উঠল মিসেস বারজি।

কয়েক সেকেন্ড পর গেটের বাইরে রাস্তায় একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। দ্রুত চলে গেল গাড়িটা। জানালা দিয়ে ওটার টেল লাইট দেখতে পেল কিশোর।

সারা বাড়ির আলো জ্বেলে দিল সে। রান্নাঘরের একটা জানালার কাঁচ ভাঙা। ওখান দিয়ে ছিটকানি খুলেই ঘরে ঢুকেছিল কেউ। হুবারের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা মনে পড়ল কিশোরের। ঠিক একই ভাবে ওদের ঘরেও ঢুকেছিল লোকটা। কে? কেন?

হঠাৎ পেয়ে গেল জবাবটা। হুবারের বাড়িতে যে জিনিসের জন্যে ঢুকেছিল, ওদের বাড়িতেও সেই একই জিনিসের জন্যে এসেছিল লোকটা।

পুতুলের পোশাক!

নিশ্চয় সেই গালকাটা লোকটা। কিশোর তখন ভেবেছিল চলে গিয়েছে, আসলে যায়নি। নদীর পাড়ে কোথাও লুকিয়ে থেকে দেখেছে ফগ ওগুলো নিয়ে কি করে। সব দেখেছে। তারপর কিশোরের পিছু নিয়ে এসে ওদের বাড়িটা দেখে গেছে। এখন রাত দুপুরে এসে হানা দিয়েছে ওগুলোর জন্যে।

নিশ্চয় কোন মূল্যবান সূত্র লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে। কোন সন্দেহ নেই আর।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন চাচা-চাচী।

চোর ঢোকার কথা জোর গলায় জানাল তাঁদের মিসেস বারজি। পুলিসে খবর দিতে বললেন মেরিচাচী।

রাজি হলেন না রাশেদ পাশা। পুলিস মানেই তো ফগর‍্যাম্পারকট। তাঁর মতে ওটা একটা হাঁদা। পারে কেবল ঝামেলা বাধাতে আর হই-হট্টগোল করতে। কাজের কাছ কিছুই পারে না। কিছু যখন নিতে পারেনি চোরে, অহেতুক রাত দুপুরে ফগকে খবর দিয়ে আর যন্ত্রণা বাড়ানোর দরকার নেই।

পরদিন সকালে আকাশ ভাল হয়ে গেল। বৃষ্টি নেই। নাস্তা সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে কিশোরদের বাড়িতে হাজির হলো ফারিহা, মুসা আর রবিন।

রাতে চোর আসার কথা ওদের জানাল কিশোর। কেন এসেছিল, কি তার উদ্দেশ্য সেটা নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। কিশোরের সঙ্গে অন্য তিনজনও একমত হলো, গালকাটা লোকটাই এসেছিল, পুতুলের পোশাকের খোঁজে। অতএব আর দেরি না করে জলদি জলদি দেখে ফেলা দরকার কি এমন মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে।

জিনিসগুলো নিয়ে কিশোরদের বাগানের ছাউনিতে ঢুকল সবাই।

টিটুকে পাহারা দিতে বলল কিশোর।

'এত কড়াকড়ি কেন?' জানতে চাইল ফারিহা।

'বলা যায় না,' বেড়ার ফাঁকফোকরগুলো দেখতে দেখতে জবাব দিল কিশোর, 'কাল রাতের লোকটা এসে উঁকি দিয়ে শুনে ফেলতে পারে আমাদের কথা। আমরা

কি পেলাম, দেখে ফেলতে পারে।'

হেসে ফেলল ফারিহা, 'এত সতর্কতা! নিজেরদেরকে স্পাই মনে হচ্ছে আমার। একেবারে স্পাই হেডকোয়ার্টারের সাবধানতা।'

'কথা অনেক হয়েছে,' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা, 'এবার আসল কাজটা সেরে ফেলা দরকার। পোশাকগুলোর ভেতরে কি আছে জানার জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?'

'এই যে, শুরু করছি,' বলে একটা জুতোর বাক্সের ডালা খুলল কিশোর। এর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে পুতুলের পোশাকগুলো। প্রথমে বের করল নীল রঙের পাজামাটা। বেশ সুন্দর। ওপর দিকে বোতাম লাগানো।

'পকেট-টকেট কিছু নেই।' ফারিহার দিকে তাকাল কিশোর, 'পুতুলের পোশাকের পকেট থাকে না, ফারিহা?'

'থাকে তো,' হাত বাড়াল ফারিহা। 'দেখি? এটা ছেলে পুতুলের গায়ে মানাবে ভাল।'

উল্টেপাল্টে ভাল করে দেখল সে। কিছু পাওয়া গেল না। রবিনের হাতে দিল। ও দেখে মুসাকে দেবে। প্রতিটি জিনিস সবাই মিলে দেখবে। তাতে কোন কিছু থেকে থাকলে চোখ এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এরপর একটা লাল বেল্ট বের করল কিশোর। নিজে দেখে ফারিহার হাতে দিল। হাত থেকে হাতে ঘুরতে লাগল জিনিসটা। পাওয়া গেল না কিছু।

এরপর মোজাগুলো দেখা হলো।

পুতুলের নাম কিংবা কোন চিহ্ন দেয়া আছে কিনা দেখল ফারিহা। নেই।

মুসা বলল, 'পুতুলের কাপড়ে আবার নাম লেখা থাকে নাকি?'

'থাকবে না কেন?' ফারিহা বলল। 'অনেকেই নাম লিখে রাখে, কিংবা চিহ্ন দিয়ে রাখে, আলাদা করে বোঝার জন্যে। আমিই তো দিই।'

মোজাতে পাওয়া গেল না কিছু। জুতোজোড়া বের করল কিশোর।

'পুতুলের জন্যে বড়,' বলল সে, 'কিন্তু বাচ্চা ছেলের জন্যে ছোট। শক্ত করে বানানো, দেখো। পুতুলের জিনিস মনে হয় না। ফিতেগুলোও আসল। ইচ্ছে করলে বাঁধা যায়।'

'হয়তো কোন শিশুর জুতোই হবে,' রবিন বলল। 'কোন বামন শিশু। স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে পা ছোট তার।'

'তা নাহয় হলো,' নিজের অজান্তে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'কিন্তু মাথায় ঢুকছে না এ জিনিসের এত গুরুত্ব হয়ে গেল কেন? কি এমন দামী জিনিস আছে এর মধ্যে যে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দুটো বাড়িতে হানা দিল লোকটা?'

দুটো ফিতেই খুলল ফারিহা। ভাল করে দেখল। খুব সুন্দর। আবার আগের মত জুতোতে বেঁধে রাখতে লাগল। একটার ফিতে বেঁধে জুতোটা পাশে রেখে আরেকটা বাঁধছে সে, এই সময় মাটিতে রাখা জুতোটা এসে শুঁকতে শুরু করল টিটু।

ওর দিকে তাকাল ফারিহা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাক তো খুব কড়া।

কার গন্ধ পাচ্ছিস?'

বার দুই খুফ খুফ করল টিটু। তারপর মুখে নিয়ে একদৌড়ে চলে গেল ঘরের কোণে। জুতোটাকে ওখানে রেখে বসে পড়ল তার ওপর। যেন বোঝাতে চাইল, 'এটা এখন আমার।'

'তোর ওই খেলা বাদ দে তো! কদিন থেকেই শুরু করেছে। যা পায় নিয়ে গিয়ে দখল করে। কাল নিয়েছে আমার একটা রঙিন পেন্সিল। সকালে স্যান্ডেল। এখন জুতো,' ধমক দিল কিশোর। 'আন ওটা। কাজ আছে।'

আনল না টিটু। যেমন ছিল, বসে রইল।

হেসে বলল মুসা, 'কাল রাতে চোর তাড়িয়ে নিজেকে খুব বাহাদুর ভাবছে আরকি। কাউকেই আর কেয়ার করে না। ব্যাটা শয়তানের হাড্ডি।'

জুতোটা দেখা হয়ে যাওয়ার পরই নিয়েছে টিটু, তাই আর ওটা নিয়ে মাথা ঘামাল না কিশোর। বাক্স থেকে একটা কোট বের করল। তাতে উঁচু কলারও আছে, বোতামও আছে।

ভালমত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। কোটের ভেতরে-বাইরে তো দেখলই, লাইনিংও বাদ দিল না। কিছুই লুকানো নেই। কোন কিছু ঠেকল না আঙুলে।

কিশোরের দেখা হয়ে গেলে অন্যেরাও দেখল কোটটা। ভাল কাপড়ে তৈরি পোশাকটা প্রায় নতুন। তেমন ব্যবহার করা হয়নি।

'যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি,' কিশোর বলল, 'কাকে পরানো হত এই পোশাক? চুরিই বা করা হলো কেন এগুলো?'

'চুরিটা কে করেছে?' রবিনের প্রশ্ন। 'হুবার?'

'সে করে থাকলে ওগুলো নিয়ে গিয়ে আবার পানিতে ফেলে দেবে কেন? আমাকে খোঁচাচ্ছে আসলে একটা প্রশ্নই—সাধারণ এই জিনিসগুলো এত দামী হয়ে উঠল কেন? এর জবাব পাওয়া গেলেই সমাধান করে ফেলা যাবে এই রহস্যের।...এই যে, নাও, টাইটা দেখো। আর এই যে ক্যাপ।'

ওর দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না বলেই বোধহয় সেটা বোঝানোর জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল টিটু। এর-ওর গা ঘেঁষাঘেঁষি করেও পাত্তা না পেয়ে খুক-খুক শুরু করল।

বিরক্ত হয়ে কিশোর বলল, 'তোর সঙ্গে খেলার সময় এখন কারও নেই। যা তো এখান থেকে। তোকে বললাম পাহারা দিতে, আর তুই করছিস শয়তানী। যা, ভাগ।'

মনমরা হয়ে গিয়ে আবার ঘরের কোণে বসে পড়ল টিটু।

ক্যাপটাও দেখা হয়ে গেলে ফারিহা বলল, 'এই তো শেষ, তাই না? পেলাম না তো কিছুই।'

'সেকথাই তো ভাবছি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এ ভাবে নিরাশ হব ভাবিনি। এক কাজ করা যেতে পারে।'

তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে। 'কি?'

'এগুলো নিয়ে হুবারের কাছে চলে যাব। তাকে জিজ্ঞেস করব, কার জিনিস? এত দামী কেন?'

'জবাব দেবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি!'

'তারচেয়ে বরং আরেকবার খুঁটিয়ে দেখা যাক;' ফারিহা বলল। 'হয়তো প্রথমবারে আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'আরে, দূর!' থাবা মারার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা। 'এতগুলো চোখ, এমন করে দেখলাম, চোখ এড়িয়ে যায় কি করে?'

তবে কিশোর তাচ্ছিল্য করল না ফারিহার কথাকে। 'মন্দ বলনি। যতক্ষণ সন্দেহ না যায়, সন্তুষ্ট না হওয়া যায়, বার বার দেখা উচিত। কখন যে কি জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবে, বলা মুশকিল।'

সুতরাং আবার প্রথম থেকে দেখা শুরু হলো।

এবং ফারিহার ধারণাই ঠিক। জিনিসটা পাওয়া গেল লাল কোটের উল্টে রাখা হাতার ভাঁজে। খুদে একটা সাদা রুমাল। সে-ই খুঁজে বের করল জিনিসটা। চিৎকার করে উঠল, 'দেখো দেখো, এমব্রয়ডারি করে ডেইজি ফুল আঁকা!'

প্রায় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে রুমালটা নিয়ে নিল কিশোর। ফুলের দিকে নজর নেই। ওর চোখ অন্যখানে। ফুলগুলোকে ঘিরে লেখা রয়েছে কতগুলো অক্ষর।

সবগুলো সাজালে একটা নাম হয়ে যায়।

'ইউরিক্লেস!' কপাল কুঁচকে ফেলেছে মুসা। 'এ রকম উদ্ভট নাম তো আর শুনিনি কখনও। এ তো মনে হচ্ছে গ্রীক!'

'আমারও মনে হচ্ছে গ্রীক,' রবিন বলল। 'কিন্তু মিথলজিতে এ রকম কোন নাম আছে বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমি জানি ওটা কার নাম,' উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর। 'দারুণ একখান সূত্র! ফারিহা, কাজের কাজই করেছ একটা!'

তেরো

'শোনো,' গল্প বলার ঢঙে বলল কিশোর, 'বহুকাল আগে ইউরিক্লেস নামে এক লোক বাস করত গ্রীসে। সেকালে সবাই চিনত তাকে। বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল বিশেষ একটা গুণের জন্যে—ভেনট্রিলোকুইজম জানত। অনেক ছাত্র তৈরি করে নিয়েছিল সে। ওরাও একেকজন দক্ষ ভেনট্রিলোকুইস্ট হয়ে ওঠে।'

'ও, এই ব্যাপার,' মুসা বলল। 'আমি তো ভাবতাম ভেনট্রিলোকুইজম বিদ্যাটা বুঝি আধুনিক। তাহলে এই কারবার। প্রাচীন গ্রীকরা তো দেখি সব ব্যাপারেই ওস্তাদ ছিল।'

'বিদ্যাটা আধুনিক তো নয়ই, বরং বহু পুরানো। যতদূর জানা যায়, গ্রীকরাই এ বিদ্যার প্রচলন করেছিল। তারপর পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এটা। আফ্রিকার জুলু থেকে শুরু করে মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা পর্যন্ত এ জিনিস প্র্যাকটিস করেছে। কিছুদিন আমিও আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। প্র্যাকটিস করেছি। কিন্তু করতে বড় কষ্ট।

তা ছাড়া আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে ছেড়ে দিয়েছি।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ফারিহার, 'তুমি ভেনট্রিলোকুইজম জানো!'

'অতি সামান্য,' হাসল কিশোর। হঠাৎ ফুলে উঠল তার গাল। ঠোঁট দুটো গোল হয়ে গেল শিস দেয়ার ভঙ্গিতে। পরক্ষণে ঘরের কোণে একটা বেড়াল ডেকে উঠল। কান খাড়া হয়ে গেল টিটুর। সেদিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল।

'থাক, চেঁচাতে হবে না আর,' বলল কিশোর। 'বেড়াল-টেড়াল কিছু নেই।'

হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'তুমি করেছ ওই শব্দ!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বিশ্বাস করতে পারছে না রবিনও। 'সত্যি!'

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

সন্দেহ প্রকাশ করল না কেবল ফারিহা। তার ধারণা, পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই যেটা কিশোর পাশা করতে পারবে না।

'যাই হোক,' আবার আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'আমার প্রশ্ন, একটা আধুনিক পুতুলের রুমালে প্রাচীন গ্রীক ভেনট্রিলোকুইস্টের নাম লেখা কেন? আর এটা এত দামীই বা হয়ে উঠল কেন?'

হাত নাড়ল মুসা, 'আমি বলতে পারব না। তুমিই বলো।'

'কোন রুমালে যখন কোন নাম লেখা হয়, সাধারণত সেটা হয় ওটার মালিকের নাম,' এক এক করে সবার দিকে তাকাল কিশোর, 'তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'এখন দুটো ব্যাপার হতে পারে,' কিশোর বলল, 'হয় রুমালটা পুতুলটারই নামে, নয়তো ওটার মালিকের—যে একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট।'

'তাই তো!' কিশোরের মতই ব্যাপারটা অনেকখানি আঁচ করে ফেলেছে রবিন। 'আগে ভাবলাম না কেন? পুতুলটা আসলে স্টেজে ব্যবহার করা হতো, থিয়েটার কিংবা পুতুলনাচ, এ ধরনের কোন শো-বিজনেসে, যে জন্যে এত বড় করে বানানো হয়েছে। পোশাক-আশাকগুলোও তাই এতটা নিখুঁত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'প্রাচীন সেই ভেনট্রিলোকুইস্টের নামানুসারে রুমালের মালিকের স্টেজ নেম রাখা হয়েছিল ইউরিক্লেস। পুতুলটাকে নিয়ে খেলা দেখাত যে। দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন সবকিছু।'

'কিন্তু আমার কাছে এখনও অমাবস্যার রাতের মতই অন্ধকার,' মুসা বলল, 'পোশাকগুলো কাকে পরানো হত, তা নাহয় জানলাম; পুতুলের মালিকের নামও জানা গেল। কিন্তু তাতে আমাদের রহস্যের কিনারাটা কিভাবে হলো?'

'মিস্টার ইউরিক্লেসকে খুঁজে বের করতে পারলেই হয়ে যাবে,' জবাব দিল কিশোর। 'হুবারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব পুতুলের এই পোশাকগুলো তার কাছে কেন, কেন এত দামী হয়ে উঠল এগুলো যে নেয়ার জন্যে তার বাড়িতে হানা দিল চোর, কেনই বা রাত দুপুরে ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়ে এগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসা লাগল তার? এই জবাবগুলো পেয়ে গেলেই সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা ইউরিক্লেস রহস্যের।'

'কিন্তু ওই ইউরিক্লেসকে খুঁজে বের করব কিভাবে আমরা? কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে। সূত্র ছাড়া ওকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তা ছাড়া হাতেও আমাদের সময় নেই আর বেশি। তিন দিন পরেই স্কুল খুলে যাবে। না গিয়ে তো আর পারব না।'

'অত নিরাশ হচ্ছ কেন?' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর, 'যুগ যুগ লাগবে না ইউরিক্লেসকে খুঁজে বের করতে। অল্প সময়েই হয়ে যাবে। শো-বিজনেস যারা করে, তাদের অফিস আছে। ওখানে ফোন করে খোঁজ নিলেই জানা যাবে ইউরিক্লেস নামের ভেনট্রিলোকুইস্টকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

'হুবারকেও জিজ্ঞেস করা যেতে পারে,' রবিন বলল।

'তা পারে। তবে জবাব সে নাও দিতে পারে। দিক আর না দিক, তার কাছে আমি যাবই। আজ বিকেলে দল বেঁধে সবাই গিয়ে হাজির হব তার বাড়িতে। আমি দেখতে চাই, পোশাকগুলো দেখলে তার মুখের অবস্থা কি হয়। চমকে যদি যায়, সামলে নেয়ার আগেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করে দেব। ভুল কোন জবাব দিলেই হয় কেবল, চেপে ধরব ক্যাঁক করে।'

পোশাকগুলো আবার জুতোর বাক্সে ভরে ফেলতে লাগল কিশোর।

ফারিহা বলল, 'রুমালটা খুব সুন্দর। এটা আমি আমার পকেটে রেখে দিই?'

'তা দাও। না হারালেই হবে।'

ঘড়ি দেখল রবিন। 'বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি। সময়টা কিভাবে কাটানো যায়? কি করা যায়, বলো তো?'

'চলো, গিয়ে কোনখান থেকে চকলেট খেয়ে আসি,' প্রস্তাব দিল মুসা।

মনে ধরল সবারই। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথে ফগের সঙ্গে দেখা। কিশোরকে দেখে এগিয়ে এল। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল ওদেরকে।

টিটকারির সুরে কিশোর বলল, 'আজ তো আপনার কাছে কোন ব্যাগট্যাগ নেই। কিছু ঢোকাবেন না আমার শার্টের মধ্যে?'

গম্ভীর ভাবটা একেবারেই নেই ফগের মধ্যে। কোমল গলায় বলল, 'ঝামেলা! কাল তুমি ব্যথা পাওনি তো, কিশোর?'

অবাক হয়ে গেল ওরা। টিটুকে ঝুড়িতে আটকে রেখেছে কিশোর। সুতরাং সে কোন গোলমাল করতে পারল না। বলল, 'আজ পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট? এত ভাল ব্যবহার যে?'

রাগে ঝিক করে উঠল ফগের চোখ। সেটা পলকের জন্যে। কঠিন কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল। জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। ঢোক গিলল। তারপর বলল, 'ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে রিপোর্ট করেছিলাম। তাতে হুবারের বাড়ির কুকুর, শুয়োর আর বাচ্চা শিশুর ডাকের কথাও উল্লেখ করেছিলাম।'

কৌতূহলী হয়ে উঠল কিশোর, 'তারপর?'

অহেতুক কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ফগ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দ্বিধা করল। শেষে বলেই ফেলল, 'ক্যাপ্টেন একবর্ণও বিশ্বাস করেননি। তোমার কথা লিখেছিলাম রিপোর্টে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন, তোমাকে সহকারী

করে নিতে।'

ও, এই ব্যাপার! এ জন্যেই এত ভাল ব্যবহার। মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সহকারী করার নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি সহকারী হবার?'

আবার জ্বলে উঠল ফগের চোখ। দাঁত কিড়মিড় করল। কিন্তু কঠোর কিছু বলার সাহস পেল না কিশোরকে। আরেকদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ঝামেলা! উফ্, ঝামেলা!'

'এতে আর ঝামেলার কি দেখলেন,' কিশোর বলল। 'ক্যাপ্টেন যখন সাহায্য করতে বলেছেন আপনাকে, নিশ্চয় করব। আবার কথা হলে তাঁকে আমার সালাম জানাবেন। এখন আমরা চকলেট খেতে যাচ্ছি। পরে সময় করে কথা বলব।'

ইচ্ছে করে কেউকেটা ভঙ্গি দেখিয়ে ফগের পিত্তি জ্বালিয়ে দিতে দিতে সাইকেলের প্যাডালে চাপ দিল কিশোর। যেদিকে যাচ্ছিল, দল বেঁধে সেদিকে রওনা হলো আবার। পেছনে তাকালে দেখতে পেত, চোখ গরম করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফগ। আর শাপ-শাপান্ত করে ওর চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করছে। এটা অবশ্য তাকালে দেখতে পেত না। কারণ এই বিশেষ কাজটা করছে ফগ মনে মনে।

চোদ্দ

লাঞ্চের আরও ঘন্টাখানেক বাকি। চকলেট খাওয়ার পর তাই আবার কিশোরদের বাড়িতে ফিরে এল সবাই।

বাগানে ঢুকে ছাউনির দিকে তাকিয়েই থমকে গেল কিশোর।

'কি হলো?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। তারপর দৌড় দিল ছাউনির দিকে। হাঁ হয়ে খুলে আছে দরজা। তালা লাগিয়ে গিয়েছিল সে। কজা ভেঙে খোলা হয়েছে। চাচা-চাচী বাড়ি নেই। কোথাও গেছে হয়তো বেড়াতে। মিসেস বারজি গেছে বাজারে। এই সুযোগে কাজটা করেছে কেউ।

লোকটা কে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না কারোরই। নিশ্চয় সেই গালকাটা। ভেতরে ঢুকে দেখে সেটা আরও পরিষ্কার হলো। জিনিসপত্র সব তছনছ হয়ে আছে।

'ওই ব্যাটা আবার এসেছিল পুতুলের কাপড়ের খোঁজে,' মুসা বলল।

'এবার নিশ্চয় নিয়েও গেছে,' বলল রবিন।

কথাটা ঠিক। জুতোর বাক্সটা আছে বটে, কিন্তু ভেতরে পোশাকগুলো নেই। খালি করে সব নিয়ে গেছে। যে জিনিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল লোকটা, অবশেষে হাতে পেল সেগুলো।

'ইস্, কেন যে অন্য কোথাও রেখে যাওয়ার কথা মনে হলো না!' কেঁদে ফেলবে যেন ফারিহা। 'ঘরে রেখে গেলেই হত। এখন কি নিয়ে হুবারের কাছে যাব আমরা?'

'ঘরে রেখে গেলেও আজ নিয়েই যেত লোকটা,' কিশোর বলল। 'গাধার মত

বাড়ি খালি ফেলে চকলেট খেতে বেরিয়েছিলাম। দোষটা আমাদেরই। চমৎকার সুযোগ করে দিয়ে গেছি লোকটাকে। কি আর করা। যা গেছে গেছে। এখন অনুশোচনা করে আর লাভ নেই। এসো, ঘরটা গুছিয়ে ফেলি।'

'কিন্তু আমাদের তদন্তের কি হবে?'

'সে দেখা যাবে। উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই।'

জিনিসপত্রগুলো যেখানে যেটা ছিল, গুছিয়ে রাখতে আরম্ভ করল সবাই মিলে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ফারিহা, 'আরি, ভুলেই গিয়েছিলাম!'

কাজ থামিয়ে দিয়েছে সবাই।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'রুমালটা! ওটা নিতে পারেনি। আমার পকেটে আছে।'

'ও,' বিশেষ আগ্রহ দেখাল না কিশোর। 'ওটা দিয়ে আর কোন লাভ হবে না এখন আমাদের। রেখে দাও তোমার কাছেই।'

পকেট থেকে রুমালটা বের করে ফেলেছিল ফারিহা, কিশোরের অনাগ্রহ দেখে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার রেখে দিল পকেটে।

আবার জিনিস গোছানোয় মন দিল ওরা। সবাই খুব মনমরা। তীরে এসে তরী ডোবার অবস্থা। সূত্রগুলো হাতে পেয়েও খোয়াতে হলো।

লাঞ্চের আগে যার যার বাড়ি চলে গেল মুসা, ফারিহা আর রবিন। টিটুকে নিয়ে কিশোর এসে ঘরে ঢুকল। মিসেস বারজি ফিরেছে। কিশোরকে দেখেই বলল, 'এক ভদ্রলোক তোমাকে ফোন করেছিলেন।'

'কে?'

'ক্যাপ্টেন রবার্টসন।'

'ক্যাপ্টেন! কি বললেন?'

'বললেন তুমি বাড়ি এলেই যেন জানাই তিনি ফোন করেছিলেন। জরুরী কথা আছে।'

সোজা টেলিফোনের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

'কে, কিশোর?' ভেসে এল ক্যাপ্টেনের ভারী গলা। 'মেসেজটা তাহলে দিয়েছে তোমাকে। তা কেমন আছো?'

'ভাল, স্যার। কিজন্যে ফোন করেছিলেন?'

'ফগ একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। উদ্ভট সব কথা লিখেছে। তোমার নামেও বিস্তর আজেবাজে কথা লিখেছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটছে গ্রীনহিলসে। কি, বলো তো?'

'ভেনট্রিলোকুইজম।'

'কি!'

'ভেনট্রিলোকুইজম, স্যার। বিদ্যেটার কথা নিশ্চয় জানা আছে আপনার।'

'তা আছে। কিন্তু তোমার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ইউরিক্লেসের নাম শুনেছেন না, স্যার? সেই যে প্রাচীন গ্রীসে...'

'কি হয়েছে ইউরিক্লেসের?'

'ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, স্যার।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিশোর, কি আবল-তাবল বকছ! এত বছর পর তাকে খুঁজে পাবে কোথায়? তার কবরের হাড়ও এখন পাওয়া যাবে না।'

'ওকে নয়, স্যার, অন্য এক ইউরিক্লেসকে খুঁজছি আমরা। এখনকার মানুষ।'

অন্যপাশে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, তাঁর কথা থেকেই বোঝা গেল। 'কিশোর, বেরিয়ো না কোথাও। আমি এখুনি আসছি। আর অপরিচিত কেউ এসে যদি ইউরিক্লেসের কথা জিজ্ঞেস করে, কিচ্ছু বলবে না।'

পনেরো

ওপাশে লাইন কেটে গেল। বিমূঢ় হয়ে হাতের রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। রীতিমত অবাক। ব্যাপার কি? ক্যাপ্টেন কি তাহলে রহস্যটার কথা কিছু জানেন? ইউরিক্লেসকে চেনেন? সাংঘাতিক কোন ব্যাপার আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে হুট করে এ ভাবে আসার জন্যে অস্থির হয়ে যেতেন না।

নাক ডলল কিশোর। সেদিনই বিকেলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না তার। রহস্যটার কিনারা হয়নি এখনও। তবু ক্যাপ্টেন যখন নিজেই আসতে চাইছেন, কি আর করা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মুসা আর রবিনকে ফোন করল কিশোর। ক্যাপ্টেনের আসার খবরটা জানিয়ে ওদের আগেভাগেই চলে আসতে বলল।

কিন্তু ওদের আগেই ক্যাপ্টেন চলে এলেন তাঁর সেই বিরাট কালো গাড়িতে চড়ে। সঙ্গে আরেকজন লম্বা লোক। সাদা পোশাক পরা হলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের, এই লোক সাধারণ কেউ নন। হয় পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের হোমরা-চোমরা কেউ, নয়তো অন্য কোন ধরনের সিক্রেট সার্ভিসের; সিআইএর লোকও হতে পারে।

কিন্তু এই লোক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কেন?

পরিচয় করিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ও কিশোর পাশা।' হেসে বললেন, 'আমাদের লোকাল পুলিসকে খুব জ্বালাতন করে, তবে মাঝে মাঝে পুলিসকে বেশ সাহায্যও করে। অনেকগুলো জটিল কেসের সমাধান করা গেছে [illegible] আর ওর বন্ধুদের কারণে।'

রহস্যময় মানুষটার সঙ্গে হাত মেলাল কিশোর। একটা ব্যাপার লক্ষ করল, সঙ্গীর পরিচয় দিলেন না ক্যাপ্টেন।

তাঁদেরকে বসার ঘরে এনে বসাল কিশোর।

চাচা-চাচী ফেরেননি। ভালই হয়েছে। নইলে পুলিস আসার জন্যে চাচীর কাছে একগাদা কৈফিয়ত দেয়া লাগত।

বসার পর সরাসরি কাজের কথায় এলেন ক্যাপ্টেন. 'হ্যাঁ, এখন বলো তো ইউরিক্লেসের ব্যাপারে কি কি জানো তুমি?'

'খুব বেশি কিছু না, স্যার,' কিশোর বলল। 'এক কাজ করি, গোড়া থেকেই

বলি। একটা রহস্যের তদন্ত করতে করতে ইউরিক্লেসের নামটা পেয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, বলো, প্রথম থেকেই বলো।'

সবে শুরু করেছে কিশোর, এই সময় কয়েকটা সাইকেলের বেলের শব্দ শোনা গেল। খউ খউ করতে করতে দরজার দিকে ছুটে গেল টিটু।

'ওই যে, মুসারা এসে পড়েছে।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর, 'ওরা এ ঘরে এলে কোন অসুবিধে আছে, স্যার? অন্যান্য বারের মত এবারও ওরা এ কেসে আমার সঙ্গে কাজ করছে।'

'না, কোন অসুবিধে নেই। আসতে বলো ওদের।'

সাইকেল রেখে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল মুসা, ফারিহা, রবিন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অপরিচিত একজন লোক আছে দেখে থমকে দাঁড়াল।

হেসে হাত নেড়ে তিনজনকেই কাছে ডাকলেন ক্যাপ্টেন। উঠে হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে।

দেখাদেখি ক্যাপ্টেনের সঙ্গীও উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হাত মেলানোর পালা শেষ হলে ফারিহা জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, 'কাজে এসেছেন? নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'দুটোই। কিশোরের কাছে ফোন করেছিলাম। সে বলল, কি একটা গল্প নাকি আমাকে শোনাবে তোমরা।'

সবাই বসল। ক্যাপ্টেনের যতটা সম্ভব কাছে বসল ফারিহা।

আবার গোড়া থেকে শুরু করল কিশোর। কিভাবে রবিনের কাছে হুবারের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা বলেছিল দুধওয়ালা, কৌতূহলী হয়ে ওরা কিভাবে দেখতে গেল ওবাড়িতে, বেড়ালছানাটাকে বের করে আনল, সব বিস্তারিত বলতে লাগল।

স্বাভাবিকভাবেই ফগের কথা এসে পড়ল।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার আসার খবর বোধহয় ও পায়নি। কিশোর, ওকে একটা ফোন করে দেবে?'

'নিশ্চয়, স্যার।'

উঠে গিয়ে ফোন করে এল কিশোর। তারপর গল্পের বাকিটা বলতে লাগল।

পাঁচ মিনিটও গেল না, সাইকেল নিয়ে প্রায় উড়ে এসে পড়ল ফগ। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। কাপড়ে খাবারের ঝোল আর রুটির গুঁড়ো লেগে আছে। মোছারও সময় পায়নি। ফোন পেয়ে খাবার ফেলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

মাথা থেকে হেলমেট খুলে মেঝেতে রাখল সে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'বসো, ফগর‍্যাম্পারকট। কিশোর একটা গল্প শোনাচ্ছে আমাদের। তুমি এর অনেকখানিই জানো। কিন্তু রিপোর্টে তেমন কিছুই জানাওনি।'

হাঁ হয়ে গেল ফগ। গোল চোখ আরও গোল। ভেবে পেল না কি কথা সে জানে অথচ ক্যাপ্টেনকে জানায়নি?

ফগকে দেখেই অস্থির হয়ে উঠেছে টিটু। আর থাকতে না পেরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফগের গোড়ালির কাছে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কড়া ধমক লাগাল কিশোর, 'অ্যাই, চুপ করে বোস্! জরুরী আলোচনা হচ্ছে।'

কিশোরের দিকে তাকাল টিটু। মুখ দেখেই বুঝতে পারল, এখন দুষ্টুমি চলবে না। ফারিহার পায়ের কাছে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

এগিয়ে চলল কিশোরের গল্প। রাতের বেলা চৌকিদারদের কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল, তারপর ওকে ধরার জন্যে প্রায় সারারাত ঠাণ্ডার মধ্যে গাছের নিচে বসেছিল ফগ, এ কথায় আসার পর আর হাসি চাপতে পারল না মুসা। তার হাসি সংক্রমিত হলো ফারিহা আর রবিনের মধ্যে। জোর করে মুখ গম্ভীর করে রাখল কিশোর। ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গীর মনে কি ঘটছে মুখ দেখে বোঝা গেল না। ঘাম দেখা দিয়েছে ফগের কপালে।

পরদিন নদীতে নৌকা নিয়ে খুঁজতে গিয়ে কি পেয়েছিল ফগ, বলল কিশোর। ব্যাগের মধ্যে কি ছিল, তাও জানাল।

ফগের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'ফগর‍্যাম্পারকট, তোমার রিপোর্টে তো এ সব কথা বলনি? কি করেছ ওগুলো?'

বেচারা ফগ। ভঙ্গি দেখে মনে হলো চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে। ওর অবস্থা দেখে কিশোরের মায়াই হতে লাগল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি জিনিস। অবাক হচ্ছেন, স্যার? আমিও হয়েছিলাম।'

ষোল

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এত জরুরী সূত্রগুলো তোমাকে দিয়ে দিল কেন ও?'

ঢোক গিলল ফগ। পাকা আপেলের মত টুকটুকে হয়ে যাচ্ছে গাল। ইস্, হতভাগা বিচ্ছুটা! আবার ডোবাল ওকে! এই ছেলেটার কারণেই আবার অপদস্থ হতে চলেছে। জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে।

জবাব দিয়ে দিল ফারিহা, 'খুশি মনে কি আর দিয়েছে? ভেজা জিনিসগুলো পানি সহই ওর শার্টের ভেতর ঠেসে ভরে দিয়েছে।'

'আহ্, ফারিহা, থামো তো!' এমনিতেই যা অবস্থা হয়েছে ফগের, আরও বেকায়দায় ফেলতে চাইল না ওকে কিশোর। 'দোষটা আমারই ছিল।'

'আশ্চর্য!' খুব বিরক্ত হলেন ক্যাপ্টেন। 'একজন পুলিস হয়ে তোমার এই আচরণ? শার্টের ভেতর ভেজা কাপড় ভরে শাস্তি দেয়া…ছি-ছি-ছি!'

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করল ফগ। 'না, স্যার…ইয়ে…আমি…কি করে বুঝব কাপড়গুলো খুব জরুরী ছিল?…ওগুলো যে সূত্র, বুঝতেই পারিনি। আসলে ওই সকালে মাথাটা আমার এত গরম হয়ে ছিল…'

'আরে না না, বললাম তো,' আবার বলল কিশোর, 'দোষটা আমারই ছিল। আপনার অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।' ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল সে, 'আসলেই, স্যার, অতিরিক্ত বিরক্ত করে ফেলেছিলাম আমি মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটকে।' তারপর ফগকে বাঁচানোর জন্যে তাড়াতাড়ি আবার ওর কাহিনীতে ফিরে গেল। বলতে লাগল, কিভাবে কাপড়গুলো শুকিয়ে জুতোর বাক্সে

ভয়ে রেখেছিল। রাতে চোর এসেছিল। কিন্তু কিছু নিতে পারেনি।

এ সব কথা ফগের কাছে নতুন। চোখ গোল গোল করে শুনতে লাগল সে।

'সকালে মুসারা আসার পর,' কিশোর বলছে, 'পুতুলের পোশাকগুলো নিয়ে গিয়ে ছাউনিতে বসলাম ভালমত দেখার জন্যে। অনেকভাবে দেখেও প্রথমে কিছু পাইনি। শেষে ফারিহা কোটের হাতার ভেতর থেকে একটা খুদে রুমাল বের করল। তাতে ডেইজি ফুলের চারপাশ ঘিরে যে অক্ষরগুলো লেখা, সেগুলো এক করলে একটা নাম হয়ে যায়—ইউরিক্লেস।' ফারিহার দিকে তাকাল সে, 'রুমালটা আছে সঙ্গে?'

পকেট থেকে বের করে দিল ফারিহা।

চুপচাপ রুমালটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গী। হাঁ হয়ে গেছে ফগ। ওর মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিসের পুতুল? আর পুতুলের মধ্যে পাওয়া রুমালেরই বা কি অর্থ? রাতে বুড়ো ক্যামারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিল, হন্তদন্ত হয়ে নদীর দিকে ছুটে যেতে দেখেছে একটা লোককে। তার হাতে কোন জিনিস ছিল। বুড়োর মনে হয়েছে, জিনিসটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে লোকটা। যেহেতু হুবারের বাড়িতে চোর আসার রাতে ঘটেছে ঘটনাটা, ফগের সন্দেহ হয়েছিল, চোরাই মালটাল বা ওই জাতীয় কোন কিছু পানিতে ফেলেছে চোর। লুকিয়ে রাখার জন্যে। এমন জায়গায়, যেখানে জলজ গাছগাছড়া আর শ্যাওলার মধ্যে আটকে থাকবে জিনিসটা। পরে এসে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে যে পুতুলের পোশাকের ব্যাগ পেয়ে যাবে, আর অতি সাধারণ ওই জিনিসগুলো মূল্যবান সূত্র হয়ে যাবে, কল্পনাই করতে পারেনি। তাহলে কি আর বিচ্ছু ছেলেটাকে দেয়! উহ্! রাগে এখন নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর।

কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'রুমালটা দেখে কি মনে হলো তোমার?'

'কিছুই না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমাকে অবাক করেছে নামটা।'

'কেন?' প্রশ্ন করলেন তাঁর সঙ্গী।

'কারণ, স্বাভাবিক নাম নয় ওটা। ওই নামের কোন লোকের সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয়নি। জানি, গ্রীসে গেলে ওই নামের অনেককেই পেয়ে যাব। নামটা আমাকে অবাক করেছিল কেন, বলি। এই নামে আরেকজন লোকের কথা আমি জানি, প্রাচীন গ্রীসে যার জন্ম, ভেনট্রিলোকুইজমের জনক বলা হয়। কি করে জানলাম নামটা, তাও বলি। একটা ভেনট্রিলোকুইজম শিক্ষার বইতে।'

মৃদু স্বরে লম্বা ভদ্রলোক বললেন, 'বুদ্ধিমান ছেলে!' কিশোরের দিকে তাকালেন, 'তাহলে তোমার মনে হয়েছিল ওগুলো আধুনিক কোন ভেনট্রিলোকুইস্টের পুতুলের পোশাক, যে ইউরিক্লেস নামে পরিচিত?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। রুমালে নাম দেখে ওই লোকটাকে খুঁজে বের করার কথা ভাবছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো এই রহস্যটা ভেদ করার মত কোন তথ্য পাওয়া যাবে।'

'আসলেই বুদ্ধিমান ছেলে,' আনমনে বিড়বিড় করলেন আবার ভদ্রলোক। 'শুনে হয়তো খুশি হবে, তোমার অনুমান ঠিক। ইউরিক্লেস নামে সত্যিই একজন

ভেনট্রিলোকুইস্ট আছে, আর ওই পোশাকগুলো তারই পুতুলের। হয়তো অবাক হবে শুনে এই পোশাকগুলো আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'কেন?' সত্যি অবাক হলো কিশোর। 'এত লোক সাধারণ একটা পুতুলের পোশাকের পেছনে লেগেছে কেন?'

'তুমি একটা গল্প শুনিয়েছ আমাদের,' ভদ্রলোক বললেন, 'এবার আমি একটা গল্প শোনাই তোমাদের। তবে কথা দিতে হবে, আর কাউকে সেটা বলতে পারবে না। কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। ইউরিক্লেসের নাম শুনে কেন অবাক হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন, জবাব পেয়ে যাবে গল্পটা শুনলে।'

সবগুলো চোখ স্থির হয়ে গেল তাঁর মুখের ওপর, কেবল ক্যাপ্টেনের বাদে। তাঁর চোখ সবার ওপর ঘুরছে।

'কিশোর, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে,' ক্যাপ্টেনের সঙ্গী বললেন, 'আশা করি বুঝে গেছ আমি পুলিস না হলেও ওরকমই একটা ডিপার্টমেন্টে কাজ করি।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আমাদের কাজ হলো, শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের খুঁজে বের করা। অনেক লোক আছে ওরকম, বড় বড় জায়গায়, বড় বড় আসনে বসে আছে। অনেক তাদের ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি! তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় আমাদের। প্রচুর খোঁজ-খবর, সাক্ষি-সাবুদ জোগাড় করে তবেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়।'

'স্পাই!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ফারিহা।

'শুধু স্পাই নয়, আরও অনেক ধরনের খারাপ মানুষ আছে, তাদের দিকেও নজর রাখতে হয় আমাদের। মিস্টার ইউরিক্লেস আমাদের ইনফর্মার। ওইসব খারাপ মানুষদের খোঁজ-খবর দেয়। খুব ভাল ভেনট্রিলোকুইস্ট সে। পুতুল দিয়ে কথা বলানোর খেলা দেখায়। এ জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। খবর জোগাড়ের সুবিধে হয়। কনি হুবার ওর অ্যাসিসট্যান্ট।'

'ও, তাই!' প্রায় চিৎকার করে উঠল ফারিহা।

আস্তে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। 'একদিন ইউরিক্লেসের এক বন্ধু এসে হাজির হলো আমার কাছে। জানাল, অপরাধীদের নামের একটা লিস্ট করেছে ইউরিক্লেস। কিন্তু শত্রুরা টের পেয়ে গিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে ওর পেছনে লেগেছে। লিস্টে এমন সব নাম আছে যাদের ধরার জন্যে আমরা অনেকদিন থেকে ওত পেতে আছি। দেশের ভেতরে শ্রমিক ধর্মঘট, কারখানায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, আরও নানা ধরনের অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত বাঘা বাঘা সব মানুষ। সুতরাং লিস্টটা কতখানি দামী, বুঝতেই পারছ।'

গভীর আগ্রহে শুনছে সবাই।

বলে চলেছেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী, 'তাকে সন্দেহ করে ফেলেছে অপরাধীরা, এটা টের পেয়ে গিয়ে লিস্টটা পুতুলের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল ইউরিক্লেস। আমরা কোন সাহায্য করার আগেই একরাতে কিডন্যাপ হয়ে গেল সে। তার আগে কোনভাবে সহকারী হুবারকে নিশ্চয় পুতুলটার কথা জানিয়ে যেতে পেরেছিল। ও কিডন্যাপ হওয়ার পর পরই ওর ঘর থেকে পুতুলটা বের করে নিয়ে যায় হুবার।

ওটার মধ্যে মূল্যবান কিছু লুকানো আছে, বোধহয় জানানো হয়েছিল ওকে। কিন্তু কি জিনিস, সেটা বলা হয়নি। গ্রীনহিলসে এসে নতুন বাসা ভাড়া করে পুতুলটা সহ হুবার লুকিয়ে রইল যাতে শত্রুরা ওকে খুঁজে না পায়। কিন্তু বাঁচতে পারল না। অত্যাচার করে নিশ্চয় ইউরিক্লেসের মুখ থেকে আদায় করে নিয়েছিল কিডন্যাপাররা লিস্টটা কোথায় লুকানো আছে। হুবারকে খুঁজে বের করল ওরা। রাতের বেলা হানা দিল ওর বাড়িতে।

'কে এসেছে বুঝতে পারল হুবার। টের পেয়ে আর দেরি করল না। পুতুলের গা থেকে তাড়াতাড়ি পোশাকগুলো খুলে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ওই তাড়াহুড়োর সময়ই লাল দস্তানাটা পড়ে গিয়েছিল, কিশোর যেটা খুঁজে পেয়েছে। তারপর ব্যাগটা নদীতে ফেলে দিয়ে এল হুবার। পুতুলটা লুকিয়েছে অন্য কোনখানে। হয়তো কোন খড়ের গাদায়। সেটা জরুরী নয়। কারণ লিস্টটা ওর মধ্যে নেই। ও এ সম্পর্কে কিছু জানে না, অস্বীকার করার জন্যেই সম্ভবত এ কাজ করেছে। যাই হোক, ব্যাগটা পানিতে ফেলার কথা খোঁজ নিয়ে জেনে গেছিল গালকাটা লোকটা। নদীতে খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর আগেই পেয়ে যায় ফগর‍্যাম্পারকট।'

এবারও চুপ থাকতে পারল না ফারিহা, 'আরেক কাজ করলেই পারত হুবার। লিস্টটা বের করে রেখে দিয়ে কাপড়গুলো ফেলে দিতে পারত।'

'কাছে রাখার সাহস পায়নি হয়তো।'

'কিন্তু সে কি জানে না কাগজ পানিতে নষ্ট হয়ে যায়?'

'জানে। হয়তো এও জানে, কাগজটা এমনভাবেই রাখা আছে যাতে পানি লাগতে না পারে।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'এখনই বোঝা যাবে সব। কিশোর, যাও তো, ওগুলো নিয়ে এসো।'

চুপ করে রইল কিশোর। মুসা, রবিন আর ফারিহার মুখেও রা নেই।

ওদেরকে এ ভাবে চুপ হয়ে যেতে দেখে অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। 'কি ব্যাপার?'

'ওগুলো আমার কাছে নেই, স্যার,' মুখ কালো করে জবাব দিল কিশোর। 'ছাউনিতে রেখে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি দরজা ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সতেরো

মৃদু শিস দিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাহ্, গেল আবার হাতছাড়া হয়ে! গালকাটা লোকটাই নাকি?'

'তাই হবে, আর কে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন সঙ্গী। 'ওই লিস্ট আমাদের হাতে পড়লে ওর এবং আরও অনেকের সর্বনাশ হয়ে যাবে। নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাই।'

'এবং শেষ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়ল।' কিশোরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'সব নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। কেবল ছোট রুমালটা বাদে। ফারিহা ওটা পকেটে রেখে দিয়েছিল।'

'জিনিসগুলো কোথায় রেখেছিলে, চলো তো দেখি?'

ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই রওনা হলো ছাউনির দিকে। ফগও চলল। বিষণ্ণ হয়ে আছে খুব। যে রহস্যটা তার সমাধান করার কথা ছিল, করে ফেলেওছিল প্রায়, নিজের বোকামির জন্যে সেটা হাত থেকে ফসকে গেল। এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি।

ছাউনিতে ঢুকল সবাই। খালি জুতোর বাক্সটা দেখাল কিশোর। কিচ্ছু নেই ওর মধ্যে। আশেপাশে আরেকবার খুঁজে দেখল সবাই মিলে। কিছুই পাওয়া গেল না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফারিহার। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, ভুলে গেছিলাম! টিটু একটা জুতো নিয়ে গিয়েছিল না?'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোরও, 'আরে, তাই তো!' ঘরের কোণের দিকে দৌড় দিল সে। বের করে আনল জুতোটা।

প্রায় ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে ধারাল ফলার মাথা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করলেন জুতোর গোড়ালিতে।

খুব মজবুত করে বানানো। কেটে আলগা করতে সময় লাগল। ভেতরে একটা কুঠুরি তৈরি করা হয়েছে ইচ্ছে করে। তার মধ্যে ঠেসে ভরা হয়েছে একটা ভাঁজ করা কাগজ। মোম দিয়ে এমনভাবে বন্ধ করা হয়েছে কুঠুরির ফাঁকফোকর, পানি ঢুকতে পারেনি। বোঝা গেল জেনেশুনেই পানিতে ফেলেছিল হুবার।

চারপাশ থেকে ঘিরে আছে গোয়েন্দারা। সাবধানে ভাঁজ খুলে একনজর দেখেই পকেটে ভরে ফেললেন সেটা ক্যাপ্টেনের সঙ্গী। হাসিমুখে তাকালেন ক্যাপ্টেনের দিকে, 'হ্যাঁ, এটাই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারাও। ওদের মুখেও হাসি ফুটেছে। টিটুকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। ওর শয়তানির যে এতটা সুফল মিলবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

কেবল ফগের মুখে হাসি নেই। সে আরও দমে গেছে।

ছাউনি থেকে দল বেঁধে আবার বেরিয়ে এল সবাই।

কিশোর জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, 'এখন কি করবেন, স্যার?'

'প্রথমে হুবারের বাড়ি যাব। নিশ্চয় খুব আতঙ্কের মধ্যে কাটাচ্ছে বেচারা। ওর ভয়টা দূর করব। তারপর খুঁজে বের করব গালকাটা লোকটাকে। আমার বিশ্বাস কাগজটা যেহেতু হাতে পায়নি, এখনও এই এলাকাতেই আছে সে। ধরতে তেমন অসুবিধে হবে না।' ফগের দিকে তাকালেন তিনি, 'দায়িত্বটা তোমার ওপর দিয়ে সুবিধে হবে না। ভরসা করা যায় না। অফিসে গিয়েই লোক পাঠাচ্ছি। ওদেরকে সব রকমে সাহায্য করবে তুমি।'

হঠাৎ সচকিত হয়ে খটাস করে স্যালুট ঠুকল ফগ। 'ইয়েস, স্যার! নিশ্চয় স্যার! ঝামেলা!'

হাঁটতে হাঁটতে কি মনে হতে কিশোরের দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন,

'তুমি তো যেটা ধরো, সেটা শেষ করে ছাড়ো। ভেনট্রিলোকুইজমের বই পড়েছ বললে। শিখেছিলে নাকি?'

হাসল কিশোর, 'খুব সামান্য। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তেমন ভাল লাগেনি বলে অল্প শিখে ছেড়ে দিয়েছি।'

মুখটা নড়ে উঠল তার। গলাটা কেমন ফুলে উঠল। স্বর কিংবা কথা কিছুই বেরোল না।

ফগের ঠিক মাথার ওপরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল কির্‌র্‌র্‌-কির্‌র্‌র্‌-কির্‌র্‌র্‌। চমকে মুখ তুলে তাকাল সে। 'আহ্‌, ঝামেলা! দিনকাল কি উল্টে গেল নাকি? এই দুপুরবেলা পেঁচা বেরোয়!'

পেঁচা কেন, মাথার ওপর কোন পাখিই দেখতে পেল না সে। আরও অবাক হয়ে গেল। এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড! ডাক দিয়ে মুহূর্তে কোথায় উধাও হয়ে গেল পাখিটা?

কিন্তু ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গী ঠিকই বুঝে ফেলেছেন ব্যাপারটা।

ফগের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এখানেই তোমার সঙ্গে কিশোরের তফাৎ। ওর সামান্য চালাকিটাও ধরতে পারলে না। ঠিকই বোকা বানিয়ে ছাড়ল।'

বড় বড় হয়ে গেল ফগের গোল চোখ। বোকাটা বনল কি করে ধরতে পারল না।

'এখনও বুঝলে না? আরে বোকা, ডাকটা কিশোরই দিয়েছে। ভেনট্রিলোকুইজম নিয়ে এত আলোচনা হলো, তাও মাথায় ঢুকল না? তোমার মাথার ওপর ও ছুঁড়ে দিয়েছে পেঁচার ডাক। এ জন্যেই তো পাখিটাকে দেখতে পাওনি।'

সবার সামনে বোকা বনে এতই হতাশ হয়ে গেল ফগ, তখনকার মত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, চাকরিটাই ছেড়ে দেবে। বিচ্ছু ছেলেটার কাছে পরাজিত হয়ে বার বার এ ভাবে লজ্জা পাওয়া থেকে তো বাঁচা যাবে। বিড়বিড় করে বলল, 'আহ্‌, বড্ড ঝামেলা!' তবে এতই আস্তে, কারও কানে গেল না কথাটা।

***

প্রেতের অভিশাপ

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

লস অ্যাঞ্জেলেসের সীমানা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

'জানো কোথায় এলাম?' গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ বলে উঠল মুসা।

তন্ময় হয়ে প্রকৃতি দেখছিল তার পাশে বসা কিশোর পাশা। ফিরে তাকাল। 'ফ্লেমিং রক?'

মুসার কথায় পেছনে বসা রবিনও কৌতূহলী হয়ে উঠল। পিঠ খাড়া করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। 'কেন, ভুলে গেছ, পত্রিকায় সেদিন যে আর্টিক্যালটা পড়েছিলাম সেটার কথা? সেই যে, সেই শহরটার কথা, অদ্ভুত ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছিল যেখানকার সমস্ত মানুষ।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'একটা রূপার খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শহরটা। পর্বতের গভীরে। সবচেয়ে কাছের লোকালয়টাও যেখান থেকে দুশো মাইল দূরে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সিবিল ওঅয়েরের সময় আবিষ্কৃত হয় খনিটা। আর খনিটাকে ঘিরে শহরের সুদিন ছিল আঠারোশো তেষট্টি থেকে আঠারোশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত। তারপর রাতারাতিই একদিন গায়েব হয়ে গেল শহরের সব লোক।'

'আর বলতে হবে না,' কিশোর বলল। 'সবটাই এখন মনে পড়েছে। খবরটা দিয়েছিল এসে একজন স্বর্ণসন্ধানী। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আধপাগল হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে ঢুকেছিল টাকসন শহরে। ফ্লেমিং রকের পাশ দিয়ে নাকি এসেছিল সে। জানিয়েছিল, শহরটার সমস্ত লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

'আর নিরুদ্দেশটাও স্বাভাবিক উপায়ে হয়নি,' কিশোরের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল রবিন। 'গোছগাছ করে চলে যাওয়া যাকে বলে তা নয়। বাড়িঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে গেছে। আসবাব, কাপড়-চোপড় যেখানে যা ছিল, সব রয়েছে। স্বর্ণসন্ধানী লোকটা যখন শহরে ঢুকেছিল, খাবারের পাত্রও তখন স্টোভে চাপানো। গরম। যেখানে যা থাকার কথা সব কিছুই ছিল, ছিল না কেবল মানুষ।'

'লোকটার কথায় কান দিল না কেউ,' রবিনের মুখ থেকে আবার কথা কেড়ে নিল কিশোর। 'ভাবল, অতিরিক্ত রোদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আর একাকিত্ব লোকটার মাথার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। পাগল হয়ে গিয়েছিল সে।'

'একজন রিপোর্টার তো গিয়েছিল ফ্লেমিং রকে খোঁজ নিতে,' মুসা বলল, 'তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'কয়েকজন অভিযাত্রীকে সঙ্গে দিয়ে নিজের

ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন একজন খবরের কাগজের সম্পাদক। বেরোনোর জন্যে উপযুক্ত সময় ছিল না সেটা। শীত আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। ফলে তুষারপাতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ওরা। বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বসন্তকালে আবার চালাল অভিযান। কিন্তু শহরবাসীদের খুঁজে পাওয়া তো পরের কথা, শহরটাই খুঁজে বের করতে পারেনি ওরা।'

'দুনিয়ার বুক থেকে স্রেফ উধাও হয়ে গেল পুরো একটা শহর ভর্তি লোক!' মুসা বলল। 'আশ্চর্য!'

'এখন অবশ্য লোকে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিতে আরম্ভ করেছে,' কিশোর বলল। 'একেকজন একেক কথা বলছে। ইনডিয়ানদের যারা দেখতে পারে না, তাদের বক্তব্য, খুনে ইনডিয়ানরা এসে চড়াও হয়েছিল শহরবাসীর ওপর। মেরেকেটে সাফ করে দিয়ে গেছে ওদের। এটা মেনে নেয়া যায় না। তার কারণ ওই এলাকার আশেপাশে যত ইনডিয়ান বসতি আছে বা ছিল, তাদের কেউই তেমন শত্রু ছিল না শ্বেতাঙ্গদের, ঘৃণা করত না। তা ছাড়া এতবড় একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালানোর পর সেটা গোপন করে ফেলা সম্ভব ছিল না কোনমতেই।'

'কেউ বলে প্লেগ ছড়িয়েছে,' রবিন থামতে কিশোর বলল। 'মড়ক লেগে সাফ হয়ে গিয়েছিল পুরো শহর। দু'চারজন অধিবাসী অবশিষ্ট যা ছিল তারা মড়ক ছড়ানোর ভয়ে লাশগুলোকে কবর দিয়ে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।'

'কিন্তু এ রকম কিছু ঘটলে কোন না কোনভাবে সেটা বাইরের জগতে চলে আসতই,' রবিন বলল। 'এমন একটা খবর চাপা থাকতে পারে না। কিন্তু কারও মুখে কখনও এ ধরনের কোন খবর শোনা যায়নি। আবার কেউ কেউ বলছে আরও অদ্ভুত কথা। সরকার নাকি ওখানে গোপন কোনও গবেষণা চালানোর জন্যে লোকগুলোকে সরিয়ে দিয়েছে অন্য জায়গায়। সেটাও চাপা থাকার কথা নয়। কি গবেষণা, কোথায় সরানো হলো, কিছুই জানা যায়নি কোনদিন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'পুরো ঘটনাটাই রহস্যাবৃত থেকে গেল এ শতকের গোড়া পর্যন্ত। তারপর আবার নতুন করে শুরু হলো ফ্লেমিং রক নিয়ে আলোচনা। ঘটনাচক্রে দু'জন লোক গিয়ে ঢুকে পড়ল ওই শহরে। পরস্পরকে চিনত না ওরা। বিভিন্ন সময়ে শহরে ঢুকেছিল দু'জনে। ফিরে এসে অবিকল এক গল্প বলেছে। দু'জনেই শহরটা দেখেছে রাতের বেলা। প্রথমে ওদের চোখে পড়ে একটা আলো, অনেক ওপর থেকে ঝুলছে। আলো দেখে দেখে কাছে গিয়ে দেখে ফ্লেমিং রক হোটেলের টাওয়ারে ঝুলছে একটা লণ্ঠন…'

'থাক থাক, আর বলার দরকার নেই!' বাধা দিল মুসা। 'বলেই করলাম ভুল! এ সব ভূতুড়ে কান্ডকারখানা…'

মুসার কথা কানে তুলল না কিশোর। তাকে এখন কথার নেশায় পেয়েছে। পেছন ফিরে রবিনের দিকে তাকাল। 'আর্টিক্যালে কি লিখেছে, মনে আছে না? ওই লোকগুলো ঘরে ঢুকে দেখে এক আজব দৃশ্য। স্বর্ণসন্ধানী লোকটা যা যা বলেছিল, অবিকল এক রকম কাণ্ড। স্টোভে হাঁড়ি চাপানো, খাবার রান্না হচ্ছে। বাড়িঘরের নমুনা দেখে মনে হচ্ছিল মাত্র কয়েক মিনিট আগে বাসিন্দারা জায়গা ছেড়ে গেছে।

সবই আছে, নেই কেবল কোন জীবন্ত প্রাণী। মানুষ তো নেইই, একটা কুকুর কিংবা মরুভূমির একআধটা কাঁকড়াবিছেও চোখে পড়ল না তাদের। পুরোপুরি একটা মৃত শহর।'

'এবং তারপর সেই লোক দু'জনও মাসখানেকের মধ্যেই রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে যায়,' যোগ করল রবিন। 'আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তাদের। সে-ই শেষ। এ ঘটনার পর ফ্লেমিং রক দেখে এসেছে বলে দাবি করেনি আর কেউ।'

গাড়ি রাখতে বলল কিশোর।

ব্রেক কষল মুসা।

রবিনের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। 'আমি যা ভাবছি তুমিও কি তাই ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুসার দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার তাকাল কিশোরের দিকে। 'হ্যাঁ। জায়গাটা থেকে যখন দূরে নই আমরা, কিংবা বলা যায় জায়গাটার কাছাকাছি চলে এসেছি, একবার ঢুঁ মেরে গেলে ক্ষতি কি?'

'খাইছে! বলো কি?' আঁতকে উঠল মুসা। 'জেনেশুনে ওই ভূতের শহরে ঢুকব ওদের দলে সামিল হতে?'

'সেটাও তো একটা অভিজ্ঞতা হবে,' কিশোর বলল। 'ভূত দেখার এতবড় সুযোগটা ছাড়ি কেন? নাকি ভোটাভুটি করতে চাও? গণতান্ত্রিক অধিকার?'

'অধিকার আর পাচ্ছি কোথায়?' নিমের তেতো ঝরল মুসার কণ্ঠে। 'তিনজনের মধ্যে দু'জনই তো ভোট দিয়ে বসেই আছো যাওয়ার পক্ষে। আমি দিলেই বা কি না দিলেই কি?'

'দিলে একটা জিনিস ভাল হবে,' হেসে বলল কিশোর। 'আমাদের দলে চলে আসতে পারলে। একা একা অন্য দলে থাকাটা কি ঠিক?'

গীয়ার লিভারে ধরে আবার হ্যাঁচকা টান মারল মুসা। ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি। ওর রাগ দেখে হেসে ফেলল কিশোর।

হাইওয়ে থেকে মোচড় দিয়ে পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা। মাইল তিরিশেক যাওয়ার পর আরেকটা কাঁচা রাস্তায় পড়ল। সোজাসুজি পর্বতের ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা।

ভীষণ এবড়োখেবড়ো পথ। প্রচণ্ড ঝাঁকি।

'এ কি রাস্তা নাকি! বাপরে বাপ!'

রাস্তা আসলে নয়ও। মাটিতে তৈরি হয়েছে গরুতে টানা গাড়ির চাকার গভীর দুটো খাঁজ। তার মধ্যে চাকা ফেলে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

'ভাগ্যিস ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ি ভাড়া করেছিলাম,' কিশোর বলল। 'নইলে এ রাস্তায় অসম্ভব ছিল চালানো।'

'আর খাবারগুলো তো জোর করেই নিলাম আমি,' মুসা বলল। 'তোমরা তো নিতেই চাচ্ছিলে না। কাজে লাগবে না এখন? কিন্তু কথা হলো, যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতেই এত কষ্ট হচ্ছে, সেটা ধরে গরুর গাড়ি চলে কি করে?'

'নিশ্চয় হাতির সাইজের একেকটা গরু,' মন্তব্য করল রবিন। 'গায়ে দানবের

জোর। তবে যা-ই বলো, দারুণ একটা অভিযানের পূর্বাভাস পাচ্ছি।'

সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'কি হলো?' চমকে উঠল কিশোর।

'দেখছ না, বৃষ্টি শুরু হয়েছে,' শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে ধরে রেখে মুসা বলল। 'এ সব এলাকায় বৃষ্টির মানে জানো? মাটি এত শুকনো আর কঠিন, সহজে পানি শুষে নিতে পারে না। পর্বতের ওপর থেকে গড়িয়ে নামা পানিতে চোখের পলকে বন্যা হয়ে যাবে।'

ঠিকই বলেছে মুসা। তথ্যটা কিশোরেরও জানা। অন্য চিন্তায় ছিল বলে এদিকে খেয়াল ছিল না তার। এ সব অঞ্চলে বছরে মাত্র কয়েকবার বৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন হয়, ঢল নামে। খুলে যায় যেন আকাশটা। মেঘের বুকে যত পানি জমা হয়, যত তাড়াতাড়ি পারে ছেড়ে দিয়ে যেন বাঁচতে চায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের আলামত সবার আগে টের পায় বন্য প্রাণীরা। এতক্ষণ যাদেরকে প্রায় চোখেই পড়ছিল না, এখন তাদেরকেই দেখা যেতে লাগল পালে পালে। পানি থেকে বাঁচার জন্যে উঁচু অঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে ওরা। হরিণ, খটাশ আর অন্যান্য রোমশ প্রাণীদের ছুটতে দেখা গেল উর্দ্ধশ্বাসে।

শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। দেখতে দেখতে রাস্তার গভীর খাঁজ দুটো ভরে গেল পানিতে।

পূর্ণ গতিতে বিরামহীন ভাবে চলছে উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার। কিন্তু কোনমতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না জানালার কাঁচ বেয়ে নেমে যাওয়া পানির প্রবল স্রোতের সঙ্গে। চোখের পাতা সরু করে এনে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে সেই পানির চাদরের মধ্যে দিয়ে সামনে দেখার চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা। একটা উঁচু পাথুরে জায়গায় উঠে এল। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল। বিস্মিত।

'কিশোর, দেখো দেখো, সামনে ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আরে দুলছে দেখো,' রবিনেরও চোখে পড়েছে আলোটা। পাশের জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। 'সেই লোকগুলোর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাই না?'

'এবং তারপর একদিন রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল দু'জনে,' আনমনে বিড়বিড় করল মুসা। 'আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ওদের!'

আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিশোর বলল, 'কিসের আলো জানিই না আমরা এখনও। আদৌ ওটা ফ্লেমিং রক শহর কিনা, তাই বা শিওর হচ্ছি কি করে?'

'তা-ও তো কথা। তাহলে কি করব এখন?'

'আগে বাড়ো। কাছে না গেলে তো বোঝা যাবে না।'

অচেনা জায়গা। রাস্তার অবস্থা ভাল না। খুব ধীরে ধীরে চালাতে শুরু করল মুসা। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ব্রেক কষল আবার। 'কিশোর, দেখো! ওই যে সাইনবোর্ডটা!' ঢোক গিলল সে।

মলিন, ভাঙা তক্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। হেডলাইটের আলোয় পড়া যাচ্ছে খোদাই করা লেখাগুলো:

ফ্লেমিং রক
অ্যারিজোনা
লোকসংখ্যা: ৪৭৭

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'চারশো সাতাত্তর জন নারী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল! এ কি বিশ্বাস করা যায়?'

'ঘটনাটা যখন ঘটেছে, না করেই বা কি করব,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'দেখা যাক, আমরা ওদের খুঁজে বের করতে পারি কিনা। এত বছর পর দেখতে ওদের কেমন লাগবে আল্লাহই জানে!'

'কেমন আর লাগবে? ফাঙ্গাস পড়া কঙ্কাল!' গলা কেঁপে উঠল মুসার। 'কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না যেতে। চলো ফিরে যাই।'

'এতখানি এসে আর পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না,' জবাব দিল কিশোর। রবিনের দিকে ফিরল। 'রবিন, কি বলো?'

'কেমন যেন ভয় ভয় করছে আমার এখন,' নিচু স্বরে জবাব দিল রবিন। 'কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাব? রহস্যটার একটা কিনারা করে যাওয়াই উচিত। চলো, অন্তত ঝুলন্ত আলোটা কিসের দেখে যাওয়া যাক।'

বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে। বাতাসের বেগও কম। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে নিয়ে নেমে পড়ল তিনজনে। এগিয়ে চলল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে খুব শীঘ্রি একটা বিল্ডিঙের অবয়ব চোখে পড়ল ওদের।

'ওই যে, ঠিকই আছে,' চারপাশে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে কিশোর বলল। 'শহরটাই এটা। ফ্লেমিং রক।'

'আর ওইটা বোধহয় এই হোটেলের টাওয়ার,' টর্চের আলো ফেলে দেখাল রবিন। 'দেখো, আলোটা এখনও ঠিক আগের মতই দুলছে। নাড়াচ্ছে না তো কেউ?'

'সেটা জানতে হলে ওখানে উঠতে হবে,' কিশোর বলল।

'ও-ওখানে উঠবে!' সাহস পাচ্ছে না মুসা।

'হ্যাঁ, নাহলে দেখব কি করে?' মুখে বললেও মনে মনে ভয় যে একেবারে পাচ্ছে না কিশোর, তা নয়।

হোটেলের বারান্দায় উঠল তিন গোয়েন্দা। লবিতে ঢুকল। কি আছে দেখার জন্যে না থেমে সোজা উঠে এল দোতলায়। সেখান থেকে ছাতে।

কাউকে দেখা গেল না সেখানে। লণ্ঠনটা যদি কেউ নাড়িয়েও থাকে, নেই এখন। চলে গেছে। লণ্ঠনটা আছে। কিন্তু আলো নেই। নিবে গেছে।

কাঁচটা ছুঁয়ে দেখল কিশোর। 'এখনও গরম!'

মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল তিনজনেরই।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'দেখা তো হলো। এখন কি?'

'লণ্ঠন দুলিয়েছে যে লোকটা, তাকে খুঁজে বের করব,' কিশোর বলল। 'চলো, নিচে চলো। আশেপাশেই কোথাও আছে সে।'

সিঁড়ি বেয়ে আবার নেমে এল ওরা। সমস্ত হোটেলে খুঁজতে শুরু করল। ডাক

দিল কিশোর, 'এই যে ভাই শুনছেন? কেউ আছেন?'

জবাব পেল না।

একটা জিনিস লক্ষ করল, স্বর্ণসন্ধানী যা যা বলেছিল সব ঠিক। একটা বর্ণও বাড়িয়ে বলেনি। জিনিসপত্র যেখানে যা থাকার সব আছে। কাপড় ঝুলছে আলনা থেকে। বিছানায় পরিষ্কার চাদর পাতা। রান্নাঘরে জ্বলন্ত স্টোভের ওপরে খাবার রান্না হচ্ছে।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। চোখে অবিশ্বাস। কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। লবি ধরে যাওয়ার সময় অ্যাশট্রেতে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো দেখতে পেল।

হঠাৎ কানে এল বিচিত্র শব্দ।

যান্ত্রিক হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করছে।

দেখতে পেল ওটাকে। ডাকতে ডাকতে পর্দার নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা খেলনা হাঁস। মেঝে ধরে হাস্যকর ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগিয়ে এসে মুসার জুতোয় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল ওদের পায়ের কাছে।

নিচু হয়ে খেলনাটা তুলে নিল কিশোর। কিন্তু আর চালু করতে পারল না। দম দেয়ার চাবিটা নেই। আস্তে করে আবার মেঝেতে রেখে দিল হাঁসটা। হাত কাঁপছে।

'কিশোর, মানুষজন আছে এখানে,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মুসা। 'জ্যান্ত মানুষ। যারা দম নেয়, কথা বলে, খায়দায়। কিন্তু কোথায় ওরা?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'জানি না। তবে খোঁজা বন্ধ করা যাবে না।'

খুঁজতে থাকল ওরা। পেছনের দরজা দিয়ে এসে হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকল। কাদামাখা পায়ের ছাপ দেখতে পেল মেঝেতে। বাইরে থেকে লবিতে ঢোকার পর ওদের যেমন ছাপ পড়েছিল এ ছাপগুলোও তেমনি।

'বিগফুটের পায়ের ছাপ,' রসিকতার চেষ্টা করল রবিন। 'পাহাড়ী অঞ্চলেই তো থাকে ওরা।'

হাসল না অন্য দু'জন।

'বিগফুটেরা বুনো,' কিশোর বলল। 'ওরা জুতো পরে না। তা ছাড়া বিগফুট নামেও যেমন *বিগ*, বাস্তবেও তেমন বড়। ওরা জুতো পরলে ছাপগুলো অনেক বড় হত। এগুলো স্বাভাবিক মানুষের পায়ের ছাপের সমান।'

পুরো হোটেলটা তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। সবখানেই মানুষ বসবাসের তাজা চিহ্ন দেখতে পেল, কিন্তু কোন মানুষ চোখে পড়ল না।

অবশেষে আবার বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে।

চারপাশে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। 'কিছু কিছু বাড়ির সামনে কেরোসিনের বাতি আছে, দেখো। চলো, জ্বালাই। রাতের বেলা তো আর কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। বরং আলো জ্বেলে এই মৃত শহরটারই কোথায় কি আছে দেখি।'

'তাই করি, আর কোন উপায় নেই যখন,' রবিন বলল।

মুসা কিছু বলল না। তবে কিশোর আর রবিন যখন এগোল, সে-ও চলল ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যারিকেন জ্বালানো মোটেও কঠিন হলো না। ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে করে তেল ভর্তি করে রেখে দেয়া হয়েছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কেমন বিষণ্ন একটা অসুস্থ চাঁদ উঁকি দিল মেঘের ফাঁকে। কিন্তু অস্থির মরুর আবহাওয়া বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে, বজ্রের গর্জন তুলে আবারও বৃষ্টির হুমকি দিয়ে চলেছে ওদের। যেন বলতে চাইছে, 'এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। এখনও কাজ শেষ হয়নি আমাদের।'

গীর্জাটার দিকে এগোল গোয়েন্দারা। হোটেল থেকে মাত্র দুটো বাড়ি পরেই। খুব সাধারণ একটা আয়তাকার বাড়ি। ওপরে ঘন্টাঘরের মাথায় দুটো খুঁটি বানিয়ে তাতে ঘন্টা ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছে শহরের স্থানীয় ছুতোর।

ওরা গীর্জায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করল। বৃষ্টিভেজা রাতের বাতাসে কাঁপা কাঁপা ভূতুড়ে শব্দ ছড়িয়ে দিতে থাকল।

আতঙ্কিত হয়ে হুড়মুড় করে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনেই। চোখ তুলে ওপরের ঘন্টাটার দিকে তাকাল।

বেজেই চলেছে ঘন্টা।

'অসম্ভব! ইমপসিবল!' ফিসফিস করে বলল রবিন। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'ঘন্টার রশি ধরে টান দিচ্ছে কেউ,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। 'বাতাস নেই যে বাতাসে দোল খেয়ে নিজে নিজে বেজে উঠবে।'

দুই সহকারীকে নিয়ে আবার গীর্জায় ঢুকল সে। দৌড়ে উঠে এল ঘন্টাঘরে, যাতে ওদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পারে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঘন্টা।

রশি ধরে টান দিল মুসা। নড়লও না ঘন্টাটা। বহুকাল ব্যবহার না করলেই কেবল এমন করে অনড় হয়ে থাকে। মনেই হয় না এক মুহূর্ত আগেও বাজছিল ওটা।

বিমূঢ়ের মত সিঁড়ি বেয়ে নামছে আবার ওরা, দড়াম করে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল ঘন্টাঘরের দরজা। ভীষণ ভাবে চমকে গেল ওরা।

'বাবাবাবাব্বাতাসে! তাই না কিশোর?' মুসা বলল।

'বাতাস কোথায় দেখলে?' কিশোর বলল। 'বাতাস তো স্তব্ধ।'

গীর্জার পেছন দিকে চলে এল ওরা। দরজার গায়ে একটা তীর বিদ্ধ দেখে দ্বিতীয়বার চমকানোর পালা। ফ্লেমিং রকের মানুষগুলোকে পাইকারী ভাবে খুন করে গেছে বুনো ইনডিয়ানরা, এ ধারণার কথাটা মনে পড়তেই বরফের মত যেন জমে গেল ওরা।

'তোতোতোমার কি মনে হয়, এটা কোনও ধরনের হুঁশিয়ারি?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কিসের হুঁশিয়ারি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর। তবে মুসাকে নয়, নিজেকেই। ওর বাস্তববাদী মন কিছুতেই অলৌকিক কোন কিছু মেনে নিতে পারছে না। নিজেকেই যেন বোঝাতে লাগল, 'কোন ধরনের ঠগবাজির শিকার হয়েছি আমরা। সত্যি কথাটা জানা গেলে দেখা যাবে, ব্যাখ্যাটা অতি সহজ। মনে আছে, একবার

এক পাগল চিত্রপরিচালকের খপ্পরে পড়েছিলাম? সিনেমার সেট সাজিয়ে আমাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে গোপনে ছবি তুলে নিয়েছিল? এটাও সে-রকম কোন কিছু হতে পারে। সিনেমা কিংবা টিভি নাটকের সেট।'

'হলে তো ভালই হত, রবিন বলল। 'কিন্তু হোটেলের টাওয়ারে লণ্ঠন জ্বলে থাকা, গীর্জার ঘন্টা বাজানো...কি করে সম্ভব?'

তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কেউ।

গীর্জা থেকে বেরিয়ে এসে শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা।

'এরপর কোথায় যাব?' মুসার প্রশ্ন।

'অবশ্যই খুঁজতে,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'এর একটা বিহিত করতেই হবে। এত বড় একটা রহস্যের সমাধান না করেই চলে যাব?...এক কাজ করা যাক। তিনজনে মিলে একই জায়গায় খোঁজার চেয়ে ভাগাভাগি হয়ে যাই চলো। তাতে অল্প সময়ে অনেক বেশি জায়গা দেখা হয়ে যাবে।'

'আ-আমি বাপু পারব না!' দুই হাত নেড়ে বলল মুসা। 'একা একা যেতে পারব না আমি।'

'আরে যাও যাও, কিছু হবে না,' সাহস দিয়ে বলল কিশোর। 'ভূতে খেয়ে ফেলবে না তোমাকে।'

'না খাক, ঘাড় তো মটকাতে পারে?'

'কথা না বাড়িয়ে যাও তো। কি আছে, তেমন সম্ভাবনা দেখলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু কোরো। তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে যাব আমরা।...মুসা, তুমি ওদিকটা দেখো। আমি ডানে যাচ্ছি। রবিন, তুমি বাঁয়ে। আধ ঘন্টা পর ঠিক এইখানে মিলিত হব আমরা। ঠিক আছে?'

কারও জবাবের অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। ডান দিকে চলে গেল সে। রবিন চলল বাঁ দিকে। কিশোরের মত অতটা আত্মবিশ্বাস বা সাহস সে দেখাতে পারছে না। তবে কমও দেখাচ্ছে না। মুসা রওনা হলো সোজা।

পর পর কয়েকটা বাড়ি-ঘরে ঢুকে খুঁজে দেখল সে। ফ্লেমিং রকের স্বাভাবিক দৃশ্য। স্টোভে আগুন জ্বলছে। কোথাও খাবার রান্না হচ্ছে, কোথাও টেবিলে গরম খাবার সাজানো। ডিনারের সময় খাবার ফেলে চলে গেছে যেন বাসিন্দারা।

তারপর স্কুল হাউসটাতে এসে ঢুকল সে। এখানকার সবচেয়ে ভূতুড়ে বিল্ডিং এটা। নিখুঁত ভাবে সাজানো ছোট ছোট ডেস্কের সারি। সেগুলোতে বই খুলে পড়ে আছে। কালির দোয়াতের মুখ খোলা। পাশে কালিতে ভিজানো পালকের কলম। বাতাসে ফড়ফড় করছে খোলা বইয়ের পাতা।

ব্ল্যাকবোর্ডের নিচে রাখা চক আর মোছার ন্যাকড়া। টীচারের শেষ মেসেজ লেখা রয়েছে বোর্ডে: *মঙ্গলবার, ১৭ সেপ্টেম্বর।* তার নিচে *'আজকের করণীয়'* শব্দ দুটোর নিচে লেখাপড়ার যে সব ফিরিস্তি রয়েছে, তার মধ্যে *'ভূত'* শব্দটা দেখা গেল। খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হলো মুসার কাছে। এখানকার কাণ্ড-কারখানার সঙ্গে ভূতের মিলই সবচেয়ে বেশি। যা সব ঘটছে, কেবল *'ভূতুড়ে'* বললেই এ সবের সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এল সে। আরও কয়েকটা বাড়িঘরের পাশ কাটিয়ে এল।

ভেতরে ঢোকার প্রয়োজন মনে করল না। বোঝা যাচ্ছে, কেউ নেই ওগুলোতে। ঢুকলে সেই একই রকম দৃশ্য দেখতে পাবে, সেটাও জানা। একটা বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। জেনারেল স্টোর বলে মনে হলো বাড়িটাকে। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবতে ভাবতে ঢোকার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলল। মনে হলো এর মধ্যে ফ্লেমিং রক রহস্য সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

দরজায় ঠেলা দিল সে। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কব্জা। মন বলছে, 'ঢুকো না, ঢোকো না, পালাও!' কিন্তু পালাল না সে। বরং দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল। প্রচণ্ড বাড়ি লাগল মাথায়। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল দুনিয়া।

জ্ঞান ফিরল এক সময়। মাথার পেছনে ব্যথা। কতক্ষণ বেহুঁশ হয়ে ছিল বুঝতে পারল না। উঠে বসে কপালে হাত বোলাল। হঠাৎ করেই মনে হলো তার, ঘরে একা নয় সে।

ধড়াস ধড়াস করতে লাগল বুকের মধ্যে। পাগল হয়ে গেল যেন হৃৎপিণ্ডটা। মাথার পেছনে হাত চলে গেল নিজের অজান্তে। ফুলে উঠেছে জায়গাটা। আঠা আঠা কি যেন লাগল হাতে। রক্ত, কোন সন্দেহ নেই।

আবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ মুদল মুসা। স্পষ্ট অনুভব করছে, ঘরে অন্য কেউ আছে। তাকে যে বাড়ি মেরেছে সেই লোকটা? জ্ঞান ফিরতে দেখলে এখন কি করবে সে? আবার বাড়ি মেরে খতম করে দেবে?

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মুসা। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ভয়। আস্তে করে একটা চোখ মেলল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল টর্চটা। মেঝেতেই পড়ে আছে ওটা এখন। তবে নেভেনি, জ্বলেই আছে। সেই আলোর আভায় ঘরের মধ্যে যতখানি সম্ভব একটা চোখ বোলাল সে। সারি দিয়ে কিংবা স্তূপ করে রাখা হয়েছে নানা রকম পণ্য। পাতলা ধূলোর আস্তর পড়ে আছে সেগুলোতে। আরেকটু দৃষ্টি সরাতেই লোকটাকে চোখে পড়ল তার।

নানা ধরনের ক্যান্ডি সাজানো বড় একটা কাঁচের বাক্সের সামনে দাঁড়ানো লোকটা। ইনডিয়ান যোদ্ধা। কোমরের কাছে এক টুকরো কাপড় জড়ানো শুধু, এ ছাড়া সারা গা খালি। গলায় রঙিন পুঁতির মালা। হাতে একটা খাটো কুড়াল, ইনডিয়ানদের ভাষায় টমাহক বলে এগুলোকে। কুড়ালটা কোপ মারার ভঙ্গিতে উদ্যত নয়। ঝুলিয়ে রেখেছে নিচু করে। এক হাত থেকে আরেক হাতে কুড়ালটা চালান করে দিল লোকটা।

মুসার মনে হলো, বাস্তব নয়, দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। মনে মনে গুঙিয়ে উঠল সে। খোদা! এটা স্বপ্নই হোক!

লোকটার গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী। সুগঠিত শরীর। প্রায় চৌকোণা সুন্দর চেহারা। কপালে বাঁধা ইনডিয়ানদের 'হেডব্যান্ড', তাতে নীলকান্তমণি খচিত। বেশ রাজকীয় মনে হলো লোকটাকে। তবে ভয়ে মাথা গরম হয়ে যাওয়ার কারণে মুসা লক্ষ করল না, লোকটার ভাবভঙ্গিতে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই।

আলতো করে ধরে রাখা টমাহকটার দিকে তাকিয়ে একমনে প্রার্থনা করতে লাগল সে: *খোদা, ওই কুড়ালটা নামিয়ে রাখুক লোকটা! পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্ন হোক! কিংবা হোক তার গরম হয়ে ওঠা মগজের অতিকল্পনা!*

এই সময় কথা বলে উঠল যোদ্ধা। খুব ভারী সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে। কেমন ভূতুড়ে আর নাটকীয় কথাবার্তা, 'পবিত্র ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছ তোমরা! যেদিন থেকে চুরি গেছে এই ভূমি, সেদিন থেকেই অভিশাপ নেমেছে এখানে, চলবে যতদিন না এখানে ঘাস গজানো বন্ধ হবে। আমার গোত্রের বিরুদ্ধে যে নৃশংসতা প্রদর্শন করেছে বর্বর মাতাল খনিশ্রমিকেরা, তার শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে। ঘরবাড়ি সব তাদের থেকেও যুগ-যুগান্তর ধরে ঘরহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।'

উঠে বসল মুসা। হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে লোকটার দিকে। ওকে বাস্তবও লাগছে, আবার অবাস্তবও। কোনমতে বের করে দিল যেন প্রশ্নটা, 'কিকিক্কি হয়েছিল ওদের?'

তার প্রশ্নের জবাব দিল না ইনডিয়ান যোদ্ধা। যেন শুনতেই পায়নি। তারমত করে সেই একই স্বরে বলে গেল, 'তোমাকে আর তোমার দুই বন্ধুকে মাপ করে দেয়া হবে। তবে এক শর্তে। ফিরে গিয়ে এখানে যা যা দেখে গেল সব জানাতে হবে বাইরের পৃথিবীর মানুষকে। যাও, এখন চলে যাও।'

কেঁপে উঠল মুসা। 'চলে যাও' শব্দ দুটো বড়ই মধুর শোনাল তার কানে। যাওয়ার জন্যে তো সে রেডিই, বরং এ রকম একটা কথা শুনতে পাবে সেটাই আশা করেনি। তবে কিছু বলল না লোকটাকে।

হেডব্যান্ড খুলে নিয়ে সাবধানে ভাঁজ করল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে রেখে দিল কাউন্টারের ওপর।

'এটা নিয়ে যাও! তোমাকে দিলাম!' তারপর হঠাৎ করেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল লোকটা।

বসেই আছে মুসা। একটা আঙুলও নড়াতে পারছে না যেন। কিশোর আর রবিন এখন কোথায়? এখানে এখন চলে এলে ভাল হত। আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতেই চমকে উঠল সে। তাই তো! ওরাও যদি ওরই মত বিপদে পড়ে থাকে? কিংবা তার চেয়ে বেশি বিপদে? কে জানে, হয়তো এ মুহূর্তে তার সাহায্য ওদের ভীষণ প্রয়োজন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পা দুটো দেহের ভর রাখতে চাইছে না। টলমল করে উঠল। পড়ে গেল না। জখমটা মারাত্মক নয়।

মাথার পেছনে হাত দিল আবার। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত। জট বেঁধেছে চুলে। বমিটমি আসছে না। তারমানে শুধু চামড়া কেটেছে, খুলিতে তেমন চোট লাগেনি। ভাঙেওনি, কিংবা ফেটেও যায়নি।

কি ভাবে লাগল আঘাতটা? টমাহক দিয়ে বাড়ি মেরেছিল ইনডিয়ান যোদ্ধা? উঁহু। তার আচরণে সেটা মনে হয়নি। তা ছাড়া ওই কুড়ালের সামান্য ছোঁয়া লাগলেও খুলি কেটে দুই ভাগ হয়ে যেত। ভয়ঙ্কর, মারাত্মক অস্ত্র। হতে পারে, বাতাসের ধাক্কায় বন্ধ হতে গিয়ে দরজার পাল্লাই বাড়ি মেরেছে তার মাথায়।

টর্চটা তুলে নিল সে। একটা পুরানো আমলের কয়লা তোলার অনেক বড় হাতা পড়ে থাকতে দেখল। এ সব দিয়ে সে-যুগে মানুষ কয়লা নিয়ে গিয়ে ফেলত তাদের ফায়ারপ্লেস আর চুলার মধ্যে।

আলোর রশ্মি চারপাশে ঘুরিয়ে আনল সে। ডজনখানেক হাতা ঝুলতে দেখল দরজার পাশের দেয়ালে। একটা হাতা হুক থেকে খুলে পড়ে আছে।

'হুঁ,' আনমনেই মাথা দোলাল সে, 'মাথায় বাড়ি লাগার রহস্য ভেদ হলো। দরজা খোলার সময় ঠেলা লেগে কোনভাবে হুক থেকে খুলে গিয়েছিল হাতাটা, মাথায় এসে পড়েছে। ফ্লেমিং রকে রাত দুপুরে ঘুরে বেড়ানোর খেসারত। আর আমি ভাবলাম কিনা ভূতের কাণ্ড! কিশোর আর রবিনকে বলা যাবে না এ কথা। হাসাহাসি করবে ওরা। তবে ভূত যে একটা সত্যিই এসেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। হেডব্যান্ডটা পড়ে আছে। দ্বিধা করতে করতে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। জিনিসটা বাস্তব। ভূতুড়ে কিংবা স্বপ্নের মধ্যে হাতে নিয়েছে মনে হলো না। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর পকেটে ভরল। রওনা হলো দরজার দিকে।

বাইরে যখন বেরোল, তখনও মৃদু মৃদু কাঁপছে তার শরীর। মাথার ভেতরটা পরিষ্কার হয়নি পুরোপুরি। বুক ভরে টেনে নিল রাতের ঠাণ্ডা তাজা বাতাস। দপ্‌দপ্‌ করছে মাথার পেছনটা। চিৎকার করে ডাকল রবিন আর কিশোরের নাম ধরে। কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল। বেশি দূর গেল না তার দুর্বল কণ্ঠ। কোন জবাবও এল না।

আবার ডাকল সে। এটুকু পরিশ্রমেই বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। ঘোলাটে হয়ে গেল দৃষ্টি। ভুলভাল দেখতে আরম্ভ করল। অন্ধকারে বহু লোকের জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেল। তাদের কণ্ঠস্বর, কথাবার্তা কানে আসছে যেন। মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে রেখেছে সবাই। হাঁটাচলা করছে আশপাশ দিয়ে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরের মাকড়সার জালের মত ঘোলাটে ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল সে। লক্ষ করল, যে চোখগুলোকে এতক্ষণ মানুষের চোখ মনে করেছে, সেগুলো আসলে মরুভূমির নিশাচর প্রাণীর চোখ। ওদের ডাক, হাঁটাচলার শব্দকে ভেবেছে মানুষের শব্দ। খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কাঠবিড়ালী আর ইঁদুর। হুটোপুটি করছে। আশ্চর্য! মানুষের ঘোলাটে মগজ কত অসম্ভব দৃশ্যই না দেখিয়ে ছাড়ে! বাস্তব জিনিসগুলোকে কি ভাবে অবাস্তব করে তোলে!

বেরিয়ে এসে আবার চিৎকার করে রবিন আর কিশোরের নাম ধরে ডাকল। সাড়া পেল না এবারেও। গেল কোথায় ওরা? কোথায় গিয়ে বিপদে পড়ল? না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঢুকে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতেই হবে ওদের।

*

রবিনও ওদিকে বাড়ির পর বাড়ি খুঁজে চলেছে। আলো ফেলে ফেলে দেখছে। নতুন কিছুই চোখে পড়ল না। ফ্লেমিং রকের সেই একই রকম স্বাভাবিক দৃশ্য।

তাই বলে খোঁজায় বিরতি দিল না। জেদ চেপে গেছে তার। এই রহস্যের কিনারা করতেই হবে।

বড় আরেকটা ঘরে ঢুকল সে। একটা সেলার দেখতে পেল এখানে। মাটির নিচের ঘর। ঢোকার দরজা একটাই, কিন্তু বড় বড় দুটো পাল্লা রয়েছে তাতে। ভেতরে ঢুকে দেখবে ঠিক করল। দরজা দুটো খুলতে বেশ কষ্ট হলো। ভারী কাঠের

পাল্লা। মরচে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে কব্জা।

উঁকি দিয়ে দেখল রবিন। নানা রকম যন্ত্রপাতি, পুরানো কাঠের টুকরো, আর কিছু ভাঙা আসবাবপত্র পড়ে আছে ঘরটাতে। ঢুকে পড়ল সে। পরক্ষণেই বরফের মত জমে গেল। পা দিয়ে বসার পর বুঝতে পারল কিসের গায়ে পা দিয়েছে।

সাপ!

সাপটাও তার মতই চমকে গেছে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে দরজার কাছে পড়ে ছিল। অন্ধকারে বিশ্রাম নিচ্ছিল বোধহয়। টর্চের আলোয় চকচক করছে খুদে খুদে দুটো চোখ। ডায়মন্ডব্যাক র‍্যাটলার। ফণার পেছনে হীরার টুকরোর মত ছাপ মারা বলেই এ রকম নাম দেয়া হয়েছে। র‍্যাটলস্নেককে সংক্ষেপ কবে বলা হয় র‍্যাটলার।

ভাগ্য ভাল, সাপের গায়ে পায়ের পুরো চাপ পড়েনি। কেবল ছোঁয়া লেগেছে। পা ফেলতে গিয়ে টের পেয়েই মাঝপথে যে ভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দিয়েছে পা'টা। চাপ লাগলে এতক্ষণে শিওর ছোবল মেরে বসত। ডায়মন্ড র‍্যাটলারের ছোবল খাওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করল কপাল বেয়ে। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। কানে আসছে হুটোপুটির শব্দ। ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করছে অসংখ্য ইঁদুর। এ রকম একটা খুনে সাপের সঙ্গে বাস করে এখনও বেঁচে আছে কি করে ইঁদুরগুলো ভেবে অবাক লাগল তার। একটা ইঁদুর দৌড়ে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সাপটার ফুটখানেক দূরে। চকচকে চোখ মেলে এক মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখল সাপ আর রবিনের হাতের আলো দুটোকেই। তারপর বিরাট এক লাফ দিল সরে যাওয়ার জন্যে। চোখের পলকে ছোবল মারল সাপটা। কিন্তু মিস করল। নিরাপদে ইঁদুরটা চলে গেল ঘরের কোণে।

সুযোগটা রবিনও হাতছাড়া করল না। ছোবল মারতে গিয়ে সাপের মুখটা বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল। রবিনের পায়ের দিকেও নজর ছিল না। ইঁদুরের মত অতটা না হলেও, বেশ বড়সড় একটা লাফ দিয়েই রবিনও পিছিয়ে চলে এল। একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না ওখানে। দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

*

একই ভাবে বাড়িঘরের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে শহরের জেলখানার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ঢুকে পড়ল ভেতরে। সামনের দিকের একটা বড় ঘরকে বানানো হয়েছে অফিস আর ওয়েইটিং রুম। পেছনে আসামী রাখার দুটো ঘর। দেয়ালে দেয়ালে আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর।

এক জায়গায় লেখা রয়েছে: গ্র্যাফিটি, ১৮৭০ স্টাইল!

বেশির ভাগ শব্দই ইনডিয়ান, ড্রয়িংগুলোও তাই। আপনমনেই বিষণ্ন হাসি হাসল কিশোর। লিখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে নিশ্চয়। ড্রয়িং এঁকে শ্বেতাঙ্গ জবরদখলকারীদের জাদু করে তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছে। বোঝা গেল এই জেলখানা তৈরি হয়েছে মূলত ইনডিয়ানদের ভরে রাখার জন্যেই। ইতিহাসে পড়েছে, প্রচুর শয়তানি আর চালাকি করেছিল তৎকালীন শ্বেতাঙ্গরা। সস্তা মদ খাইয়ে প্রথমে মাতাল করেছে ইনডিয়ানদের। মাতাল অবস্থায় তাদেরকে দিয়ে

অপরাধ করিয়েছে। তারপর আসামী করে এনে ভরে রেখেছে জেলখানায়। আটকে থাকার সুযোগে দখল করে নিয়েছে ওদের বাড়িঘর, জমিজমা সব।

প্রথম সেলটায় এসে ঢুকল সে। কানে এল পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। খোলার চেষ্টা করল দরজাটা। অনড় রইল পাল্লা। জেলখানার ভেতরে আটকা পড়ল সে।

আশেপাশে মানুষ তো দূরের কথা, একটা প্রাণীকেও চোখে পড়ল না তার। সামান্যতম বাতাসও ঢুকছে না যে বাতাসে ধাক্কা দিয়ে দরজা লাগাবে। তাহলে?

মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল তার। শেষে আর কোন উপায় না দেখে মুসা আর রবিনের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল।

কিন্তু কোন জবাব এল না। সাড়া এল না কারও কাছ থেকে। শহরের দূরতম প্রান্তে চলে এসেছে সে। এখান থেকে তার চিৎকার কারও কানে পৌঁছবে না। আরেকটা ভাবনা মাথায় আসতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। ওরা দু'জনও কোন রকম দুর্ঘটনার শিকার হয়নি তো? নিজের চেয়ে ভয়টা ওদের জন্যে বেশি বেড়ে গেল তার। সে নিজে আটকা পড়েছে জেলখানায়। ওরাও যদি কোথাও এমন করে আটকে পড়ে, কেউ বাঁচাতে আসবে না ওদের। কেউ কাউকে মুক্ত করতে পারবে না। ফ্লেমিং রকের অভিশাপের শিকার কি ওরাও হতে যাচ্ছে?

*

ডাকতে ডাকতে জেলখানার কাছে চলে এসেছে মুসা।

রবিনও জায়গামত গিয়ে কিশোর আর মুসাকে না পেয়ে এদিকেই আসছে। মুসার ডাক কানে ঢুকতেই ছুটতে শুরু করল সে।

জেলখানার আরও কাছে আসার পর ক্ষীণ একটা ডাক কানে এল মুসার। কান পেতে শুনল কোনদিক থেকে আসছে। দৌড় দিল জেলখানার দিকে।

আবার ডাকতেই আবারও সাড়া এল। কথাগুলো বুঝতে পারল এবার। কিশোর বলছে, 'মুসা, আমি এখানে!'

জেলখানার দরজার দিকে দৌড় দিল সে! একছুটে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কিশোরকে গরাদের ওপাশে দেখে থমকে গেল প্রথমে। তারপর হাসতে শুরু করল।

'হাসির কি হলো! হাসির কি হলো?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আগে বের করো আমাকে। তারপর যত খুশি হেসো। ওই যে, তোমার মাথার পেছনে দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে চাবি।'

মুসা ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই ঢুকে পড়ল রবিন। কিশোরের শেষ কথাটা কানে গেছে তার। দেয়াল থেকে চাবি খুলে নিয়ে সেলের দরজা খুলতে এগোল।

দরজার তালায় চাবি ঢোকাল সে। মোচড় দিল। দেখে, তালাটা খোলা। ঠেলা দিতেই পাল্লাটাও খুলে গেল। অবাক হয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দরজা তো খোলাই আছে!'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ছিল না! এক মিনিট আগেও ছিল না। তোমরা মনে করেছ আমি চেষ্টা করিনি? বহু ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি, খুলতে পারিনি।'

'ঢুকলে কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেয়ালে টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে ঢুকে পড়লাম,' কিশোর বলল 'আমি ঢুকতেই পেছনে আপনাআপনি লেগে গেল দরজাটা। আশেপাশে কেউ ছি না। বাতাস ছিল না। কি ভাবে বন্ধ হলো, জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। জবা দিতে পারব না।'

'জিজ্ঞেস আমি করবও না,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'কারণ আমি জা দরজাটা কে বন্ধ করেছে!'

'দেয়ালের অবস্থা দেখো,' টর্চের আলো ফেলল কিশোর। 'কি সব লি রেখেছে। মানে করতে পারবে এ সবের? শব্দগুলো কিছুই বুঝলাম না। ত ড্রয়িংগুলোর মানে বোঝা যাচ্ছে।'

'দেখার জন্যে তো ভেতরে ঢুকতে হবে,' মুসা বলল। 'এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না দেয়ালের লেখা। আমি ঢুকতে পারব না। আবার যদি লেগে যায় দরজাটা?'

'তা-ও তো কথা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'রবিন বাইরে থাকলে অবশ্য খুলে দিতে পারবে।'

'দেখা গেল রবিনও খুলতে পারল না, তখন? ভূতের ওপর বিশ্বাস নেই। ওর কোন যুক্তি মেনে চলে না। তালা আটকে দিলে তখন আর বেরোনোর জো থাকবে না।'

'থাক তাহলে, ঢোকার দরকার নেই,' বেরিয়ে আসতে আসতে বলল কিশোর ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। 'বসার ঘরের দেয়ালেও প্রচুর লেখা আছে।'

ঘরের প্রতিটি দেয়ালে, প্রতিটি কোণে আলো ফেলে ফেলে দেখল ওরা। একট লেখায় আলো ফেলে থেমে গেল রবিন। জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করল 'আজকের দিনে, সাদা মানুষদের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩ এপ্রিল ১৮৭২ সালে ছয়জন ইনডিয়ান যোদ্ধাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঘোড়া চুরি অপরাধে, যে অপরাধটা করেইনি ওরা। আগামীকাল আমরা যাচ্ছি আমাদে ভাইদের সঙ্গে সাদা মানুষের দেয়া বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে। শিরচ্ছে করে হত্যা করা হবে আমাদের। এই অন্যায়ের বিচার হবে, এর শাস্তি ভো করতেই হবে ওদের। পুরো ফ্লেমিং রকের ওপর নামবে চিরকালের অভিশাপ। স্ব থেকে নেমে আসবেন মহান প্রেত, এই অন্যায়ের বিচার করতে। আমাদের মহা পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করবেন সাদা মানুষদের, সেই সব ভূমি, যেগুলো ফেঁড়ে কেটে খনি বানিয়েছে ওরা, তছনছ করে ছেড়েছে। ফ্লেমিং রককে মহাকাশের কালে শূন্য গর্ভে বিলীন করে দেবেন মহান প্রেত।'

'ফ্যানটাস্টিক!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। পকেট থেকে নোটবুক আ পেন্সিল বের করে দ্রুত টুকে নিল কথাগুলো। তারপর চোখ পড়ল দেয়ালে লিখনের ওপর, যেটা থেকে পড়েছে রবিন। দুর্বোধ্য ইনডিয়ান ভাষা দেখে চো কপালে উঠল তার।

'রবিন!' কণ্ঠস্বর ফিসফিসানিতে নেমে এল কিশোরের, 'কি করে পড়লে তুমি তোমার তো এই ইনডিয়ান ভাষা জানার কথা নয়!'

মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজের ভেতর থেকে কি যেন দূর করতে চাইল রবিন। 'বি জানি! মনে হলো, কে যেন আমার ভেতরে ঢুকে লেখাগুলোর মানে করে দি ইংরেজিতে!'

‘আশ্চর্য! কথাগুলো বানিয়ে বলোনি তো?’

‘উঁহু,’ মাথা নাড়ল মুসা, ‘বানিয়ে বলেনি ও। এ ধরনের অভিশাপের কথা একটু আগে আমিও শুনে এলাম। একজন ইনডিয়ান যোদ্ধার মুখে।’

‘কার মুখে?’

‘ইনডিয়ান যোদ্ধা। জেনারেল স্টোরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। দরজার পাশে ঝোলানো কয়লার হাতার’বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ ফিরলে দেখি একজন ইনডিয়ান যোদ্ধা হাতে টমাহক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। ও আমাকে জানাল ফ্লেমিং রকে ইনডিয়ানদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কারণে অভিশাপ নেমেছে তাদের ওপর। চিরকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়ে থাকতে হবে তাদের। কোনদিন রেহাই পাবে না। মুক্তি পাবে না অভিশপ্ত অবস্থা থেকে। সে আমাকে শর্ত দিয়েছে, এ সব কথা যদি বাইরের দুনিয়াকে জানাব কথা দিই, তাহলে এখান থেকে মুক্তি পাব আমরা।’

‘তারপর? লোকটা কই?’

‘উধাও হয়ে গেল। স্রেফ মিলিয়ে গেল বাতাসে।’

‘তারমানে···তারমানে,’ বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, ‘সত্যিই একটা ভূত দেখেছ তুমি?’

‘হ্যাঁ। সে যে এসেছিল, তার প্রমাণও আছে আমার কাছে।’ পকেট থেকে হেডব্যান্ডটা টেনে বের করল মুসা। ‘আমাকে এটা উপহার দিয়ে গেছে সেই ইনডিয়ান যোদ্ধা।’

হেডব্যান্ডটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল কিশোর। কেমন বিমূঢ়ের মত হয়ে গেছে। ‘অবিশ্বাস্য!’ অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল সে। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। বিশেষ করে মুসার দিকে। ‘আর কি করতে বলেছে সে?’

‘এখান থেকে চলে যেতে।’

‘আমি আর রবিন থাকি, তুমি গিয়ে শেরিফকে ডেকে নিয়ে এসো।’

‘না,’ জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। ‘সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। সকাল হলে দেখা যাবে শহরটাই নেই, আবার গায়েব। বোকা বনতে হবে তখন আমাদের। তা ছাড়া শেরিফকে ডাকাডাকি করতে গেলে সেই ইনডিয়ান যোদ্ধা রেগে গিয়ে ক্ষতি করে বসতে পারে আমাদের।’

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। কি যেন ভাবছে। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। ‘আরেক কাজ করি না কেন? চলো, গাড়িতে গিয়ে বসে থাকি। কাটিয়ে দিই রাতটা। ভোরের আলো ফুটলে যদি দেখি তখনও রয়েছে শহরটা, ছবি তুলে নেব পটাপট। তাতে প্রমাণ করতে পারব, ফ্লেমিং রক নামে একটা শহর সত্যিই ছিল এক সময়।’

‘দারুণ! চমৎকার!’ একমত হয়ে মুঠো ঝাঁকাল রবিন।

‘চলো, বেরিয়ে যাই,’ তাগাদা দিল মুসা। ‘এ শহরে থাকতে আর একটা মুহূর্তও ইচ্ছে করছে না আমার।’

*

নিরাপদেই গাড়িতে ফিরে এল ওরা। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে কোনমতে

কাটিয়ে দিল রাতটা। সকাল হলো। আলো ফুটল। সূর্য উঠল। তারপরেও যখন শহরটা মিলাল না, কেন যেন খানিকটা হতাশই হলো ওরা।

গ্লাব কম্পার্টমেন্ট থেকে ৩৫এম এম ক্যামেরাটা বের করল কিশোর। প্রায় পুরো ফিল্মটাই খরচ করে ফেলল রহস্যময় শহরটার ছবি তুলে। টেলিফটো লেন্স লাগিয়ে হোটেল, জেনারেল স্টোর, স্কুলহাউস, গির্জা, জেলখানার ছবি তুলল।

'যাক, হয়ে গেল কাজ,' সন্তুষ্ট হয়ে ক্যামেরাটা রেখে দিল সে। 'এখন আর লোকে অবিশ্বাস করতে পারবে না আমাদের।'

কিন্তু মুসার মুখে হাসি নেই। 'এ শহরের গল্প তো গিয়ে আগেও লোকে বলেছে। লাভটা হয়েছে কি? মাঝখান থেকে নিজেরাই গায়েব। আমাদের বেলায়ও যদি সে-রকম কিছু ঘটে?'

'ঘটবে না,' কিশোর বলল। 'তোমার ইনডিয়ান ভূত-বন্ধুটি তো শর্তই দিয়েছে, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের কথা বাইরের দুনিয়াকে গিয়ে জানালে ছেড়ে দেবে আমাদের। আমার ধারণা, বেঁচে থাকতে ভাল লোক ছিল লোকটা। আমাদের ওপর সুনজর আছে তার।'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এ সব ভূতপ্রেতের কথা তুমি বিশ্বাস করছ?'

'করতে ইচ্ছে করছে,' জবাব দিল কিশোর। 'কি করব বলো? হয়তো ফ্লেমিং রক শহরটাই এর জন্যে দায়ী।'

'যাক,' খুশি হলো মুসা, 'ভূত সম্পর্কে তোমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে আমি খুশি।'

'বেশি খুশি হয়ো না,' সাবধান করল রবিন। 'আবেগের বশে এখন বলছে বটে, বাড়ি গিয়েই দেখবে বদলে গেছে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।

রাস্তার খাঁজকাটা সেই দাগে চাকা ফেলেই চালাতে হলো গাড়ি। দিনের বেলা এখন ভালমত দেখতে পারছে চারপাশটা। পথ কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। কোথাও পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে, কোথাও উপত্যকা ধরে। একটা পাহাড়ের মাথায় গাড়ি উঠলে শেষবারের মত ফ্লেমিং রককে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল কিশোর।

'মুসা! রবিন!' চিৎকার করে উঠল সে। 'শহরটা নেই!'

ব্রেক প্যাডালের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল গাড়ি। সে আর রবিন একই সঙ্গে ঘুরে তাকাল দেখার জন্যে।

সত্যিই নেই শহরটা!

*

'হুঁ, ভূতুড়েই!' দিন কয়েক পর ঘটনাটার কথা শুনে বলল ওদের বন্ধু টম।

'কিংবা টাইম-ডিসটরশন জাতীয় কোন কিছুর খপ্পরে পড়েছিলাম,' কিশোর বলল। 'কিছুক্ষণের জন্যে কোনও ধরনের স্পেস হোলেও ঢুকে গিয়ে থাকতে পারি আমরা।'

'শেরিফকে দেখিয়েছ ছবিগুলো?'

'কোত্থেকে দেখাব? ওঠেইনি।'

'মানে? তুমি নিজের হাতে তুলেছিলে বলেছ।'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু একটা ছবিও স্পষ্ট হয়নি। সব ঘোলা।'

একটু দূরে সোফায় বসে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে মুসা আর রবিন। ওদের দিকে একবার তাকিয়ে টমের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। 'শহর তো দূরের কথা, আশেপাশের পাহাড়-পর্বত, আকাশ কোন কিছুই ওঠেনি।'

'তাহলে ব্যাখ্যাটা কি এর?' প্রশ্ন করল বিমূঢ় টম। 'এমন হতে পারে না, পত্রিকায় লেখাটা পড়ে ফ্লেমিং রক গেঁথে গিয়েছিল তোমাদের মগজে, তারপর রাতবিরেতে দুর্যোগের মধ্যে ওই পাহাড়ের ওপরে গাড়িতে বসে পুরো ব্যাপারটাই কল্পনা করে নিয়েছ তোমরা?'

'তিনজনের অবিকল এক রকম কল্পনা?'

পকেট থেকে হেডব্যান্ডটা টেনে বের করল মুসা। 'তা ছাড়া এটা কি? কল্পিত জিনিস কি বাস্তবে আসতে পারে?'

'দেখতে তো জিনিসটা নতুনই লাগছে,' টম বলল। 'কয়েক বছরের বেশি ব্যবহার করেনি।'

'হ্যাঁ, তাই,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ভেতরের দিকটায় অ্যাপাচি ইনডিয়ানদের কিছু শব্দ লেখা রয়েছে। একজন ইনডিয়ান বন্ধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম অনুবাদ করানোর জন্যে। তাতে যাঁর নামটা লেখা রয়েছে তিনি একজন ইনডিয়ান সর্দার। ফ্লেমিং রকে খুন করা হয়েছিল তাঁকে এপ্রিলের চার তারিখে, আঠারোশো বায়াত্তর সালে। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ খনি-শ্রমিকেরা।'

মুসার হাত থেকে হেডব্যান্ডটা নিয়ে দেখতে লাগল টম। ভেতরের লেখাটা দেখে বলল, 'যদ্দূর জানি, ইনডিয়ানরা লেখার জন্যে এ ধরনের কালি ব্যবহার করে না। তারমানে বোকা বানানো হয়েছে তোমাদের।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রবিন। 'বোকা বানানো হয়নি। ইনডিয়ানরা সাদা মানুষের কালি ব্যবহার করত সেখানে। সাদা মানুষদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। তারপরেও সন্দেহ নিরসনের জন্যে সব রকম পরীক্ষা আমরা চালিয়েছি। একজন কেমিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব্যান্ডটা। কালি পরীক্ষা করে তিনি জানিয়েছেন, দেখতে নতুনের মত লাগলেও এ ধরনের কালি উৎপাদন আঠারোশো আশি সালের পরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।'

জবাব হারাল টম। কিশোরের দিকে তাকাল। 'যে দুটো লোক তোমাদের আগে ফ্লেমিং রকে গিয়েছিল, তাদের কি হয়েছে কোন খোঁজ পেয়েছ?'

'নাহ্! ওরা স্রেফ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোন সূত্র রেখে যায়নি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল টম। উঠে রওনা হলো টেলিফোনের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চেনাজানা সবাইকে ফোন করে জানিয়ে দিতে,' জবাব দিল টম, 'যাতে সর্বক্ষণ নজর রাখে তোমাদের ওপর। আমরা যারা ফ্লেমিং রকে যাইনি তাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে কিছুদিন বেরোতে পারবে না তোমরা। বলা যায় না, কখন গায়েব হয়ে যাও!'

—o—

কাকতাড়ুয়া

'ইঞ্জিনে বোধহয় কোন সমস্যা হয়েছে, মুসা,' বিরক্তকণ্ঠে বলল কিশোর পাশা।

পিকনিক করতে পাহাড়ে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা। সারাদিন ওখানেই ছিল। এখন বাড়ি ফিরছে। সাঁঝ ঘনিয়েছে। আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ। রাস্তার পাশের যব খেত ঝলমল করছে চাঁদের আলোয়। মনের আনন্দে গাড়ি চালাচ্ছিল মুসা, হঠাৎ ইঞ্জিনে গোলমাল। থেমে গেছে গাড়ি।

গ্যাস পেডালে চাপ দিল মুসা। ইঞ্জিনে কোন সাড়া নেই।

হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'মাঝ রাস্তায় এমন ঝামেলার কোন মানে হয়। একশো মাইলের মধ্যে কোন মানুষজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

হঠাৎ বিদঘুটে আওয়াজ করে উঠল ইঞ্জিন। তারপর চুপ। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। স্পোর্টস সেডানটাকে ঠেলতে ঠেলতে রাস্তার ধারে একটা খাদের কাছে নিয়ে এল। টর্চ লাইট দিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখল। স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল আরেকবার। লাভ হলো না

'বৃথা চেষ্টা।' হাল ছেড়ে দিল কিশোর। 'গ্যারেজে নিয়ে যেতে হবে।'

'ঠেলে তো আর নিতে পারব না,' মুসা বলল। 'রশি বেঁধে টেনে নিতে হবে। কিন্তু এখানে গ্যারেজ কই?'

চারদিকে চোখ বোলাল রবিন। উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, কিশোর। ওই দেখো, মাঠে একজন লোক। চাষা-টাষা হবে হয়তো। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, গ্যারেজ কোথায় আছে। গাড়িটাকে টেনে নেয়ার ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারবে।'

হাত দিয়ে যব খেত দেখাল মুসা।

মাঠের মাঝখানে লম্বা একটা আকৃতি দেখতে পেল কিশোর। দাঁড়িয়ে আছে। মানুষই মনে হচ্ছে। দূর থেকে ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

'চলো, লোকটার কাছে যাই,' প্রস্তাব দিল মুসা।

পরামর্শটা মনে ধরল কিশোরের। রাস্তা পার হয়ে মাঠে নেমে পড়ল তিনজনে। এখানে ওখানে খোঁড়া গর্ত ; চাষ করা জমিন। মাঠের মাঝখানে চলে এল ওরা। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

ঠিক এই সময় কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল চাঁদ। তবে লোকটাকে দেখতে অসুবিধে হলো না কারও। চেহারা দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওদের।

লোকটার মাথায় বালতির মত উঁচু হ্যাট, গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া কালো কোট-প্যান্ট, পায়ে কালো জুতো। কালো চোখে কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। লম্বা, বাঁকানো নাক, মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। লম্বা হাত সোজা সামনে

ধরে রেখেছে। বাঁকা আঙুল। যেন শিকারী পাখির নখওয়ালা থাবা।

গা ছমছম করে উঠল মুসার। কিশোরের মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা পানির স্রোত নামছে। রবিনেরও কেমন যেন লাগতে লাগল। নিজেদের অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা।

চাঁদকে গ্রাস করে ফেলেছে প্রকাণ্ড কালো মেঘটা। অন্ধকার হয়ে এল চারপাশ। চোখ কুঁচকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। লোকটাকে দেখার চেষ্টা করছে।

'অদ্ভুত লোক,' বিড়বিড় করল মুসা। 'বাজি ধরে বলতে পারি ব্যাটা কোন ভূতুড়ে বাড়িতে থাকে।'

'আশপাশে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,' ফিসফিস করল কিশোর। 'অদ্ভুত মনে হলেও ওর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।'

পা বাড়াল কিশোর। তার সঙ্গে রবিন।

মুসা লোকটার কাছে গিয়ে বলল, 'এই যে ভাই, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। ওটাকে গ্যারেজে নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য দরকার।'

কোন জবাব নেই। বাতাস শব্দ তুলে বয়ে গেল যব খেতের ওপর দিয়ে। বুক ঢিবঢিব করছে ওদের। ভয় লাগছে।

'এখানেই থাকি,' নিচু গলায় বলল মুসা। 'লোকটাকে চিনি না আমরা। জানি না কোন বদ মতলব আছে কিনা তার। পিছু ঘুরলেই যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে!'

'কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?' হিসিয়ে উঠল মুসা। 'এত অন্ধকার! ব্যাটা আমাদের পেছনে ঘাপটি মেরে নেই তো?' ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ও।

হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। আবার আলোর বন্যায় ভেসে গেল যব খেত। ভৌতিক চেহারাটাকে এবার পরিষ্কার দেখা গেল।

ওটা একটা কাঠের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাটের নিচে বেরিয়ে পড়েছে খড়। বাঁকানো আঙুলগুলো তারের তৈরি। সাদা মুখটা রং করা।

'কাকতাড়ুয়া!' দারুণ অবাক কিশোর। 'একটা কাকতাড়ুয়ার ভয়ে মরছি আমরা!'

'কিন্তু ওটাকে অবিকল মানুষের মত লাগছে,' বলল মুসা। 'এমন নিখুঁত জিনিস বানাল কে? ভয়ে আমার হার্টবিট বেড়ে গেছে।'

'আমারও, মুসা। তবে কাকতাড়ুয়া যেহেতু আছে, কাছেপিঠে খামার বাড়িও থাকার কথা। চলো, খামার বাড়ি-টাড়ির খোঁজ মেলে কিনা দেখি।'

তিনজনে হাঁটা শুরু করেছে এমন সময় খনখনে কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান! ভীষণ বিপদ! বাঁচতে চাইলে এখুনি এখান থেকে পালাও!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। কিশোরের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে খাড়া হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে গেল মুসার। রবিনের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে। বাকরুদ্ধ হয়ে কাকতাড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। কথাগুলো বেরিয়েছে ওটার মুখ থেকেই!

বাতাসে কাকতাড়ুয়ার কোট উড়ছে পতপত করে, পা নড়ছে। চাঁদের আলোয় মনে হলো হাসছে ওটা। বিদ্রূপের হাসি। আঙুলগুলো বাঁকা করে সামনে বাড়ানো,

যেন খামচি দিয়ে ধরার ইচ্ছে।

'আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তাই শুনেছ, মুসা?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।

'কিন্তু কাকতাড়ুয়া যে কথা বলতে পারে,' রবিন বলল, 'শুনিনি কোনদিন!'

'পরীক্ষা করে দেখি। সত্যি ওটা কথা বলেছে কিনা তা জানা যাবে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল কাকতাড়ুয়াকে, 'আমাদেরকে পালাতে বললে কেন? কেন পালাব? কিসের বিপদ?'

জবাব দিল না কাকতাড়ুয়া। আগের মতই তাকিয়ে রইল কটমট করে।

কিশোর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। চুপ হয়ে রইল কাকতাড়ুয়া। শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া আর সব নিশ্চুপ।

'খামোকাই সময় নষ্ট করছি,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'খড়ের তৈরি জিনিস কি আর কথা বলতে পারে? চলো, মুসা।'

'চলো,' বলল মুসা। 'কিন্তু যাব কোন দিকে?'

এদিক-ওদিক তাকাল কিশোর। খেতের শেষ প্রান্তে বড় একটা দালান চোখে পড়ল।

'ওটা নিশ্চয়ই খামার-বাড়ি,' বলল সে, 'চলো। ওখানেই যাই।'

'তাই ভাল।' সায় দিল মুসা। 'এই ভূতুড়ে জায়গা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

কাকতাড়ুয়াকে পেছনে রেখে দালানটার দিকে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা। মাঝে মাঝেই মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলছে বলে চলার গতি মন্থর ওদের। অন্ধকারে এবড়োখেবড়ো গর্তে ভরা মাঠ দিয়ে হাঁটা কঠিন। বার কয়েক মাটির ঢিবিতে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল ওরা।

'পাহাড়ে চড়ার চেয়েও বিশ্রী কাজ,' একটা গর্ত লাফ মেরে টপকাতে টপকাতে মন্তব্য করল মুসা।

'ঠিক বলেছে।' সায় দিল কিশোর।

'এরচেয়ে বেপোর্ট হিলসে ওঠা সহজ,' বলল রবিন।

এমন সময় পায়ের শব্দ কানে এল। কেউ দৌড়ে আসছে ওদের পেছন পেছন।

কনুই দিয়ে কিশোরকে গুঁতো মারল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'বুঝতে পারছি,' ফিসফিস করেই জবাব দিল কিশোর। 'পায়ের শব্দ আমিও শুনেছি। তবে অনুসরণকারী যে-ই হোক খারাবি আছে তার কপালে।'

পেছন ফিরে দেখল না ওরা, গুনে গুনে দশ কদম এগোল। যব খেতের মাঝ দিয়ে কেউ আসছে। শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ। ঠিক দশ কদম যাবার পরে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। কারাতে মারের কায়দায় দাঁড়িয়ে গেছে আত্মরক্ষার জন্যে। আসন্ন হামলার জন্যে প্রস্তুত। তবে মেঘে ঢাকা চাঁদের আবছা আলোয় কাউকে দেখতে পেল না। পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'বেহুদা কল্পনা করে আমরা খামোকাই ভয় পাচ্ছি, মুসা।'

'কি জানি!' নীরস শোনাল মুসার গলা। 'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। বাতাসের শব্দ শুনে ভাবছি কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে। তা ছাড়া এখানে আমাদের পিছু নিতেই বা যাবে কে?'

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় যব গাছের বড় একটা অংশ দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল। একই সঙ্গে মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল চাঁদ। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ঠোঁটে সেই বিশ্রী বিদ্রূপের হাসি নিয়ে ওদের সামনে হাজির হয়ে গেছে কাকতাড়ুয়াটা।

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে জমে গেল তিন গোয়েন্দা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভৌতিক মূর্তিটার দিকে। দু'হাতে যব গাছগুলোকে দু'পাশে ঠেলে ধরে একটা গর্তে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নিঃশব্দে হাসছে।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা চিরে খনখনে গলায় হেসে উঠল কাকতাড়ুয়া। তীব্রতর হয়ে উঠল আওয়াজ। তারপর হঠাৎই থেমে গেল।

দ্বিতীয়বার কথা বলল কাকতাড়ুয়া। কর্কশ শোনাল কণ্ঠ, 'ওই বাড়িতে যেয়ো না। এখুনি চলে যাও। নইলে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।'

দুই গোয়েন্দা আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। কথাগুলো সত্যি শুনেছে কিনা বিশ্বাস করতে পারছে না। কাকতাড়ুয়া ছেড়ে দিল যব গাছ। গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মুখটা। দ্রুত মিলিয়ে গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

পায়ের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল যেন তিন গোয়েন্দা। কাকতাড়ুয়াটা যেখান থেকে উঁকি দিয়েছে দৌড়ে গেল সে-জায়গায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না ওরা। শুনতেও পেল না।

'ওটার পিছু নেব,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

'কিন্তু যাব কোন্ দিকে?' রবিনের প্রশ্ন।

'যেখানে ওটাকে প্রথম দেখেছিলাম সেখানে।'

ছুটল ওরা। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল আগের জায়গায়। এখানেই কাকতাড়ুয়াটাকে দেখে গেছে।

কিন্তু খালি কাঠের খুঁটিটা দাঁড়িয়ে আছে। কাকতাড়ুয়াটা নেই!

হতভম্ব হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। বেদম হাঁপাচ্ছে। তবে যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি ভয়ে।

'কিশোর, আমরা সত্যি কি অশরীরী কিছু দেখছি?' কেঁপে গেল মুসার কণ্ঠ।

'আর অস্বাভাবিক কিছু কি শুনছি?' অবাক শোনাল রবিনের কণ্ঠ। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।

জবাব দিল না কিশোর। ভূতুড়ে এ সব কাণ্ডকারখানার মাথামুণ্ডু কিছু সে-ও বুঝতে পরছে না।

মাঠের মধ্যে কাকতাড়ুয়াটাকে খুঁজে বেড়াল ওরা। কোথাও দেখতে পেল না। শেষে ঠিক করল খামারবাড়িতেই যাবে। খামারবাড়িতে কেউ থাকলে কাকতাড়ুয়া রহস্যের জবাব হয়তো সে দিতে পারবে।

খা-:রবাড়িটা বেশ বড়। কতগুলো গাছ-পালার মধ্যে কাঠের বাড়ি। তবে খুবই দৈন; দশা। বাড়ির জানালায় কোন আলো জ্বলছে না।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল মুসা। দরজার কলিংবেল টিপল। ভিতরে কোথাও তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল বেল। কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। আবার বেল বাজাল মুসা। এবারও কোন সাড়া নেই।

'মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই,' বলল কিশোর। 'তবে নিশ্চিত না হয়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'পেছন দিকে কেউ থাকতে পারে,' রবিন বলল। 'চলো। ওদিকটা ঘুরে দেখি।'

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। চক্কর দিল বাড়িটাকে ঘিরে। কিন্তু জীবনের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ছোট ছোট গুল্মে পেঁচিয়ে যাচ্ছে পা, কাঁটা গাছের খোঁচা লাগছে হাতে। সেই সাথে কানের পাশে মশার ভনভনানি তো আছেই।

'গত কয়েক বছরেও এ বাড়ি কেউ সাফ-সুতরো করেনি মনে হচ্ছে,' অসন্তোষের গলায় বলল কিশোর।

জবাবে কেউ কিছু বলার আগেই ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার ভেসে এল। আঁতকে উঠল ওরা।

'কি-কি ওটা?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল মুসা।

'জানি না। কাকতাড়ুয়ার চিৎকার নয়তো?' বিড়বিড় করল রবিন।

কাছের একটা গাছ থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল। একটা পেঁচা। উড়ে আসছে গাছটা থেকে। বসল একটা ঝোপের ওপর। গোল গোল, বড় বড় চোখে কটমট করে তাকাল ওদের দিকে। তারপর ডানা ঝাপটে বুক হিম করা চিৎকারটা দিল আবার।

দুই গোয়েন্দা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হাসি হাসল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি চক্কর দেয়া শেষ। আবার চলে এসেছে বারান্দায়। বৃথা খোঁজাখুঁজি। মানুষ জন নেই। গলা ফাটিয়ে 'কেউ কি আছেন?' বলে ডাকাডাকি করল। কোন জবাব এল না।

'ফোন করা দরকার,' বলল মুসা। 'কাছেপিঠের কোন গ্যারেজে খবর না দিলেই নয়। কিন্তু সমস্যা হলো বাড়ির ভেতরে ঢুকব কি করে? দরজা ভেতর থেকে ছিটকানি দেয়া।'

'জানালা দিয়ে যে ঢুকব তারও উপায় নেই,' হতাশ শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। 'অনেক উঁচুতে জানালা!'

এদিক ওদিক তাকিয়ে রবিনও কোন উপায় বের করতে পারল না।

'উপায় একটা আছে,' মুসা বলল। 'পেঁচাটা যে গাছ থেকে উড়ে এসেছে, লক্ষ করেছি ওটার একটা ডাল চিলেকোঠার জানাল ছুঁই ছুঁই করছে। জানালা খোলা থাকলে গাছ বেয়ে উঠে গেলেই হলো। তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ব।'

গাছটার নিচে চলে এল ওরা। প্রথমে মুসা চড়ল গাছে। উঁচু ডালে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল ওটা ওর ওজনের চাপে ভেঙে পড়বে না। তারপর জানালা ছুঁই

ছুঁই ডালের ওপর চলে এল। হাত বাড়িয়ে জানালার কাঁচ স্পর্শ করল। ধাক্কা দিল। ক্যাঁঅ্যাঅ্যাচ শব্দে খুলে গেল জানালা।

'ভাগ্য ভাল আমাদের,' কিশোর আর রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল মুসা। 'জানালা খোলা। চলে এসো।'

গাছে উঠে পড়ল কিশোর। চলে এল মুসা'র পেছনে, মগডালে। খোলা জানালা দিয়ে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে পড়ল মুসা। তাকে অনুসরণ করল অন্য দু'জন। ভিতরে ঢুকে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করল ওরা।

টর্চের আলোয় বুঝতে পারল বেশ বড়সড় ঘর এটা। খালি। মেঝের ওপর ধুলোর ঘন আস্তরণ।

'মেঝেতে কারও পায়ের ছাপ দেখছি না,' বলল কিশোর। 'তার মানে অনেক দিন কেউ এ ঘরে ঢোকেনি।'

চিলেকোঠার দরজায় টর্চ মারল রবিন। 'এ ঘরে ফোন নেই। নিচে আছে কিনা দেখে আসি।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ওরা, এমন সময় ছাদ থেকে কিচকিচ শব্দ ভেসে এল। কালো কালো কি যেন ছাদের কড়ি-বর্গা থেকে নেমে এসে উড়তে লাগল ওদের মাথার ওপর।

'বাবাগো, ভূত!' বলে চিৎকার দিয়ে মেঝে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মুসা।

খেয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর আর রবিনও ঝাঁপ দিল মেঝেতে।

শিকার ফস্কে যাওয়ায়ই যেন দিক পরিবর্তন করল হামলাকারীরা, আবার উঠে গেল ছাদে। বর্গা ধরে ঝুলতে লাগল। সেই সাথে অনবরত কিচকিচ শব্দ করেই চলেছে।

'ভ্যাম্পায়ার! বাদুড়ের রূপ ধরে আছে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল মুসা। 'জলদি ভাগো!'

'ওঠো না,' সাবধান করল কিশোর। 'হামাগুড়ি দিয়ে এগোও। ভূত না হলেও আবার আক্রমণ চালাতে পারে ওরা।'

চিলেকোঠার মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল তিন গোয়েন্দা। দরজার সামনে পৌঁছে দ্রুত খুলে ফেলল কবাট। হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ওরা, চোখে পড়ল আরেকটা দরজা। ওটা খুলে একটা হলরুমে ঢুকে পড়ল তিনজনে।

'আমার কি মনে হয় জানো?' বলল কিশোর। 'বাড়িটা পরিত্যক্ত। মেঝেতে কার্পেট নেই, হলরুমে কোন আসবাব নেই; ইলেকট্রিসিটি নেই...'

হঠাৎ হলরুমের শেষ মাথায় কিসের যেন শব্দ হলো। থেমে গেল কিশোর। দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে। দরজাটা ভেড়ানো। ধাক্কা মেরে দরজা খুলল কিশোর। টর্চ জ্বালল। এ ঘরটাও খালি।

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল সে। হাসতে লাগল। 'ওই যে ভূতুড়ে শব্দের উৎস!'

একটা ইঁদুর। মানুষের সাড়া পেয়ে দৌড়ে পালাল মেঝের গর্তে।

এদিকের সবগুলো ঘর একে একে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে দেখল ওরা।

'দোতলায় কেউ নেই,' কাজ শেষ করে জানাল মুসা।

'আমিও কাউকে দেখতে পাইনি,' রবিন বলল।

'হুঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'এবার নিচতলাটা দেখা দরকার।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা, ঢুকল ডাইনিং রুমে। অন্যান্য ঘরগুলোর মত এটাও খালি এবং ধুলোয় ভর্তি। তবে এ ঘরে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ওদের।

'দেখো দেখো, পায়ের ছাপ!' বলে উঠল উত্তেজিত রবিন।

'কেউ এখানে ছিল!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'এবং মাত্র কিছুক্ষণ আগে!' ঢোক গিলল মুসা।

টর্চের আলোয় পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করল ওরা। ছাপগুলো রান্নাঘর হয়ে খিড়কির দরজার দিকে চলে গেছে। দরজাটা বন্ধ। আর দ্বিতীয় পায়ের ছাপ এসে মিশেছে লিভিং রুমে।

'পায়ের ছাপগুলো একজনেরই,' মন্তব্য করল কিশোর। 'খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে। আবার বেরিয়ে গেছে ও পথেই।'

মেঝেতে টর্চের আলো ফেলে আঁতকে উঠল মুসা। মেঝেতে কতগুলো খড় পড়ে রয়েছে। কেউ এ ঘরে খড়ের গাদা নিয়ে ঢুকেছিল। নাকি কাকতাড়ুয়াটাই…?' গায়ে কাঁটা দিল তার। 'যে-ই হোক, এখনও এ বাড়িতেই রয়েছে সে। সম্ভবত বেসিমেন্টে।'

'যেখানেই থাক, খুঁজে বের করব ওটাকে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর। 'রহস্যের সমাধান না করে যাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেছ,' বলল বটে রবিন, কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেছে ওর।

রান্নাঘরে ফিরে এল ওরা। লক্ষ করল আরও কিছু পায়ের ছাপ চলে গেছে বেসিমেন্টের দরজার দিকে। তারপর নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ভয়ে ভয়ে চোখ বুলাল চারপাশে। বেসিমেন্ট অর্থাৎ মাটির নিচের ঘরে কেউ নেই। ধুলো জমেছে পুরো হয়ে। জানালায় মাকড়সার জাল। এখান থেকে উঠান বা বাগানে যাবার কোন দরজা চোখে পড়ল না।

পায়ের ছাপ চলে গেছে ফিউজ বক্সের ধারে। ফিউজ বক্স পরীক্ষা করল কিশোর। তার ছেঁড়া। ইলেকট্রিসিটি থেকে থাকলেও বাতি জ্বালানোর কোন উপায় নেই।

'পায়ের ছাপের মালিক এখান থেকে চলে গেছে সিঁড়ির দিকে,' দেখেটেখে বলল সে।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ওরা। যেতে যেতে রবিন বলল, 'ফোনটোন তো দেখলাম না এখানে। কাজেই সাহায্য পাচ্ছি না আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'দুটো কাজ করতে পারি আমরা এখন। হয় গাড়িতে

ফিরে যেতে পারি, নয়তো এখানেই রাত কাটাতে পারি। তবে এখানে রাত কাটানোই বোধহয় ভাল হবে। মেঝেতে শুতে আমার কোন অসুবিধে নেই।'

হাই তুলল মুসা। 'আমারও নেই। খুব ঘুম পাচ্ছে। শোয়ার মত জায়গা যখন আছেই আর দেরি করি কেন?'

সে জ্যাকেট খুলে ভাঁজ করল। তারপর মাথার নিচে দিল। বালিশের কাজ দেবে জ্যাকেটটা। রবিন আর কিশোরও তা-ই করল।

শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল কিশোর। দেখল গাড়িতে করে একটা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে বলে খুঁজে পাচ্ছে না বাড়িটা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হচ্ছে না। বদমেজাজী লোকগুলো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না। হঠাৎ পেছন থেকে অদ্ভুত গলায় কে যেন বলে উঠল, 'যে বাড়িটা তোমরা খুঁজছ ওটা ডান দিকে। মোড় ঘোরো। মোড় ঘুরে নাক বরাবর চলে যাও। বাড়িটা দেখতে পাবে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর। দেখল পেছনের সীটে বসে আছে সেই কাকতাড়ুয়াটা।

ভৌতিক মূর্তিটা ওদের দিকে তাকিয়ে খনখনে গলায় হেসে উঠল। সরু, লম্বা টুপির ডগায় টোকা মেরে বলল, 'কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি কি ভাবে যেতে হবে। ডান দিকে টার্ন নাও।'

মুসা জানে ডান দিকে খাড়া খাদ। সে বাম দিকে হুইল ঘোরাল। তবু ডান দিকেই ঘুরে গেল গাড়ি। গতি কমাতে ব্রেক চেপে ধরল। কমার বদলে বেড়ে গেল স্পীড। আতঙ্কিত হয়ে দেখল সোজা খাদের দিকে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। গতি ক্রমে বেড়েই চলেছে।

পেছনের সীটে বসা কাকতাড়ুয়াটা হেসে উঠল ভয়ঙ্কর গলায়। খাদের কিনার লক্ষ্য করে ছুটে গেল গাড়ি। পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, সাঁ সাঁ করে নিচে পড়তে শুরু করল, নেমে যেতে থাকল খাদের অতল অন্ধকারের দিকে। পড়ছে তো পড়ছেই! প্রতি সেকেন্ডে খাদের বিকট হাঁ বড় হয়ে উঠছে।

বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠল কাকতাড়ুয়াটা। কানে হাত চাপা দিল কিশোর। খাদের পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ওদের গাড়ি। মারা যাবে ওরা।

ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কোথায় আছে বুঝতে সময় লাগল।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! ভাবল সে। কাকতাড়ুয়ার ভয় পেয়ে বসেছে আমাকে।

হঠাৎ বারান্দার কাঠের মেঝেতে ক্যাচকোঁচ শব্দ উঠল। কে যেন হেঁটে আসছে সামনের জানালার দিকে। উঠে বসল কিশোর।

কাকতাড়ুয়া!

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুখে বিকৃত হাসি।

'এখনও কি স্বপ্ন দেখছি?' ঢোক গিলল কিশোর। 'নাকি সত্যিই ঘটছে এ সব?'

কর্কশ সুরে ফিসফিস করল ভয়ঙ্কর মূর্তিটা। 'এক্ষুণি এ বাড়ি ছেড়ে চলে

যাও। শেষবারের মত সাবধান করছি।'

জানালা থেকে মুখ সরাল কাকতাড়ুয়া। অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে বসল কিশোর। দৌড়ে চলে এল দরজায়। জং ধরা ছিটকানি খুলতে সময় লাগল। এক ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল। চারপাশে তাকাতে লাগল।

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে মুসা আর রবিনেরও। ওরাও চলে এসেছে। চোখ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি হয়েছে?'

ঘটনাটা খুলে বলল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়াটা হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বুঝলাম না।'

'ওই তো!' হাত তুলে দেখাল মুসা।

যব খেতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ঝলমলে চাঁদের আলোয় কাকতাড়ুয়ার কুৎসিত চেহারাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'এসো আমার সঙ্গে!' চিৎকার করে বলল ওদেরকে কাকতাড়ুয়া। তারপর মাঠের দিকে ছুটতে লাগল।

'ওর পিছু নেব,' বলল কিশোর। 'ওকে ধরতে হবে। নইলে এ সব রহস্যময় কাণ্ডকারখানার কোন সদুত্তর মিলবে না।'

'ঠিক!' রবিন বলল।

মুসাও তার সঙ্গে একমত।

যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কাকতাড়ুয়া সেদিক লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওরা। রাতের আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা আরও বেড়েছে। ঝড় হবে মনে হচ্ছে। গাছের চূড়ায় হাওয়ার মাতম।

যব খেতে ঢুকে পড়ল ওরা। কাকতাড়ুয়া হেলান দিয়ে ছিল যে কাঠের খুঁটির সাথে, সেখানে এসে দেখল খুঁটি খালি। নেই ওটা।

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়া কোথায় গেছে তাই জানি না। কোথায় খুঁজব ওকে?'

'ভূতের মতই হুটহাট করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় ভূত।'

'ভূত হোক আর যাই হোক ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। এক কাজ করি–তিনজন তিনদিকে যাই। কারও চোখে কিছু পড়লেই চিৎকার করে জানাব। অন্য দু'জন ছুটে যাব তখন তার দিকে। কি বলো?'

'ঠিক আছে,' সায় দিল মুসা আর রবিন।

ডান দিকে মোড় নিল কিশোর, যব খেতের আরও গভীরে ঢুকে পড়ল।

সাবধানে হাঁটছে মুসা আর রবিন। দু'হাতে গাছ ঠেলে সরাতে সরাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে।

দূরে কোথাও কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল, আকাশে পলকের জন্যে ঝলসে উঠল রূপালী বিদ্যুৎ। চাঁদের আলো মেঘের আড়াল থেকে সামান্যই মুখ দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার এখন যব খেতে। মুসা'র কাছে সব কেমন অপার্থিব, ভূতুড়ে লাগছে। শিরশির করে উঠল গা। ভূতদের জন্যে আদর্শ একটি রাত, মনে মনে ভাবল ও।

শক্তিশালী বাতাস এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল মেঘ, হঠাৎ ঝলমলে জ্যোৎস্নায়

ভরে গেল যব খেত।

একটা যব গাছের গায়ে এক টুকরো কাপড় আটকে আছে। বাতাসে ফড়ফড় করে উড়ছে। ওদিকে দৃষ্টি আটকে গেল মুসা'র। টুকরোটা হাতে নিয়ে বুঝতে পারল এটা কাকতাড়ুয়ার সেই শতছিন্ন কালো কোটের অংশ।

কাকতাড়ুয়া এদিকে এসেছে বুঝতে পারল সে। হয়তো খেতের মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। লাফ মেরে ঘাড়ে পড়বে। কথাটা ভাবতেই বুক ঢিবঢিব শুরু হয়ে গেল তার। তবে থামল না সে। এগিয়ে চলল। বারবার ডানে-বামে তাকাচ্ছে। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। সম্ভাব্য হামলার জন্যে প্রস্তুত। তবে ভূত-প্রেতের বিরুদ্ধে কুংফু-কারাতে কতটুকু কাজে লাগবে ভেবে সন্দিহান মুসা।

বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পরেও কিছু ঘটল না দেখে মুসা ধারণা করল কাকতাড়ুয়াটা বোধহয় এ তল্লাটে নেই। ঠিক তখনই ওর সামনে খচমচ করে একটা শব্দ হলো। শস্যের ডগা দুলছে। কিছু একটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তাকে দেখতে পাচ্ছে না মুসা।

পাঁজরের গায়ে দমাদম পিটতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড, বেড়ে গেছে হার্টবিট। দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। অপেক্ষা করছে। কাকতাড়ুয়াকে দেখামাত্র চিৎকার করে জানান দেবে কিশোর আর রবিনকে।

খচমচ শব্দটা ক্রমে কাছিয়ে এল। মুখ হাঁ করল মুসা, চিৎকার দিতে যাবে এই সময় যব গাছের ফাঁক দিয়ে একটা লাফিয়ে পড়ল ওর সামনে। পেছন পেছন একটা শিয়াল। শিয়ালটা ধাওয়া করেছে খরগোশকে। দুটো প্রাণীই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল মুসার সামনে দিয়ে।

পেশীতে ঢিল পড়ল আবার ওর। খচমচ শব্দটা আবারও হচ্ছে। আবার ফিরে আসছে জানোয়ার দুটো। প্রথমে খরগোশটাকে দেখা গেল। এক দৌড়ে একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওটা। পরমুহূর্তেই হাজির হলো শিয়ালটা। তবে দেরি করে ফেলেছে সামান্য। শিকার হারিয়েছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ওটা। শিয়ালের ভঙ্গিতে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে রওনা হয়ে গেল উল্টো দিকে।

অকারণ ভয় পেয়েছে ভেবে মনে মনে হাসল মুসা। তারপর আবার কাকতাড়ুয়ার খোঁজে যাত্রা শুরু করল।

ওদিকে যব খেতের মাঝ দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে কিশোর। প্রতিটি পা ফেলছে সাবধানে। গর্তেটর্তে যাতে পড়ে না যায় সে-ব্যাপারে সতর্ক। এক জায়গার জমিন কাদায় । ওখানে পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। ছাপগুলো চলে গেছে একটা ঝোপের দিকে। সেদিকটায় যব গাছগুলো আরও ঘন।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল কিশোরের। এ কাকতাড়ুয়ার পায়ের ছাপ না হয়েই যায় না। ছাপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, সে-জায়গায় পা টিপে টিপে চলে এল সে। হঠাৎ যব গাছের পেছনে একটা আকৃতি দেখতে পেল। উপুড় করা বালতির মত টুপি পরা মূর্তি। কাকতাড়ুয়া!

মট করে কিশোরের পায়ের নিচে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কাকতাড়ুয়া। হার্টবিট বেড়ে গেল কিশোরের, গলা শুকিয়ে কাঠ।

'মুসা! রবিন! জলদি এসো! কাকতাড়ুয়াটা এখানে!' গলা লম্বা করে চিৎকার করতে লাগল কিশোর।

ওর কথা শেষ হবার আগেই ছুটতে শুরু করল ভৌতিক মূর্তিটা। পিছু নিল কিশোর। কাকতাড়ুয়ার পায়ের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। অনেক দূরে চলে গেছে। তবে একটু পরেই আবার বাড়তে লাগল শব্দটা।

'ওটা আমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে,' ভাবল কিশোর। এবার নির্ঘাত হামলা চালাবে। তবে আমিও ওকে ছাড়ছি না। জাপটে ধরব।'

পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল কিশোর। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদ। অন্ধকার হয়ে গেছে যব খেত। এমন সময় কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে। শক্ত হাতে জাপটে ধরল। কিশোরও ছাড়ল না। হামলাকারীকে সে-ও জাপটে ধরল প্রাণপণে। জড়াজড়ি করে দু'জনেই পড়ে গেল মাটিতে। রীতিমত কুস্তি শুরু হয়ে গেল।

লড়াইয়ের একটা পর্যায়ে দু'জনেই কুস্তির প্যাঁচ থেকে নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিল। হিংস্র আক্রোশে আবার পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখুনি চাঁদ বেরিয়ে এল মেঘের আড়াল থেকে। এবং সেই সঙ্গে রবিনও এসে দাঁড়াল ওখানে। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটা মুহূর্ত। পরক্ষণে চিৎকার করে উঠল, 'আরে কি করছ তোমরা? পাগল হয়ে গেছ নাকি? নিজেরা নিজেরাই মারামারি!'

'তোমাকে আমি কাকতাড়ুয়া ভেবেছিলাম!' ঢোক গিলল মুসা।

'আমিও তো তোমাকে কাকতাড়ুয়া ভেবেছি!' হাঁপাচ্ছে কিশোর।

হাসতে শুরু করল রবিন।

হাসিটা সংক্রামিত হলো অন্য দু'জনের মাঝেও।

'তবে কাকতাড়ুয়াটাকে দেখেছি আমি,' হাসি থামলে বলল মুসা। 'পালিয়েছে। ওটার চেহারা আর দেখব বলে মনে হচ্ছে না।'

'তবু আরেকবার খুঁজে দেখতে অসুবিধে কি?' কিশোর বলল।

আপত্তি করল না কেউ। এবার একসঙ্গে থেকে খোঁজ চালাল ওরা। কিন্তু ব্যর্থ হলো অভিযান। কাকতাড়ুয়ার টিকিটিরও দেখা মিলল না। আবার আগের জায়গায়, কাঠের খুঁটির কাছে ফিরে এল তিনজনে।

অদ্ভুত ব্যাপার! কাকতাড়ুয়াটা আগের মতই খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আবার কি বলবে ওটা?' আপনমনে বিড়বিড় করল মুসা।

'ওকে জিজ্ঞেস করো তো আমাদের পিছু নিয়েছে কেন?' রবিনকে উদ্দেশ্য করে বলল কিশোর।

জিজ্ঞেস করল রবিন। জবাব মিলল না। কাকতাড়ুয়া নিশ্চুপ।

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'খামারবাড়িতে ফিরে যাব। ওখানে বসে সিদ্ধান্ত নেব এরপর কি করব।'

যব খেতের শেষ মাথায় চলে এসেছে ওরা, গোটা আকাশ জুড়ে লকলকিয়ে উঠল বিদ্যুৎ। তীব্র আলোয় সাদা হয়ে গেল পুরো এলাকা।

পরক্ষণে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। আঘাত হেনেছে পুরানো খামারবাড়িটিতে।

বিস্ফোরিত হলো ছাদ। দাউ দাউ জ্বলে উঠল আগুন। লেলিহান শিখা এক লাফে উঠে গেল আকাশে।

দৃশ্যটা আতঙ্কিত করে তুলল গোয়েন্দাদেরকে। তবু বাড়ি লক্ষ্য করে ছুটল ওরা। বাড়ির কাছে এসে দেখল ওটা জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিণত হয়েছে। ধসে পড়েছে ছাদ, কড়ি-বর্গা দাউ দাউ করে জ্বলছে, জ্বলন্ত তক্তা দুড়ুম-দাড়ুম শব্দে ছিটকে পড়ছে মাটিতে।

আগাছায় ভরা ড্রাইভওয়েতে থমকে দাঁড়াল ওরা। আগুনের ভীষণ তেজ। কাছে যাওয়া যায় না।

'আমাদের কিছু করার নেই,' বিড়বিড় করল মুসা। 'বাড়িটা গেছে।'

'ভাগ্যিস বাজ পড়ার সময় বাড়ির ভেতরে ছিলাম না।' শিউরে উঠল কিশোর। 'কাকতাড়ুয়ার পিছু না নিলে এতক্ষণে পুড়ে কাবাব হয়ে যেতাম।'

'বাড়িটার শেষ পরিণতি তাহলে এভাবেই ঘটল,' কে যেন বলে উঠল পেছন থেকে।

চট করে ঘুরল ওরা। একজন লোক। একটা পিকআপের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। বাড়ি ধসে পড়ার শব্দে গাড়ির আওয়াজ শুনতে পায়নি ওরা।

পিকআপ থেকে বেরিয়ে এল আগন্তুক। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমি হ্যারি হ্যারিসন,' নিজের পরিচয় দিল সে। 'পাশের খামারবাড়িটা আমার। ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করেই দৌড় দিয়েছি। এখুনি চলে আসবে। কিন্তু তোমরা কারা?'

নিজেদের পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দা। জানাল ওদের গাড়িটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

'ও বাড়িতে ঢুকেছিলাম ফোন করার আশায়। গ্যারেজে গাড়িটা নেয়ার জন্যে সাহায্য দরকার,' কিশোর বলল। 'কিন্তু বাড়িতে ঢুকে কাউকে দেখলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকাল কম্পটন। 'কোত্থেকে দেখবে? বিশ বছরে কেউ এসেছে নাকি ও বাড়িতে। খালি পড়ে ছিল। ভাড়াও দিতে পারছিলাম না। বহুকাল আগেই কে জানি গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, ভূত বাস করে বাড়িটাতে। জায়গাটা আমার। ভাড়া দিতে না পেরে শেষে বিক্রি করে দেয়ার কথা ভাবছিলাম গত কয়েক দিন ধরে। কিন্তু হলো না। বাড়িটা তো গেল। একটা পয়সাও আর পাওয়া যাবে না ওটা থেকে। জমিটাই যা ভরসা এখন। তবে এক হিসেবে ভালই হয়েছে। বাড়িটার জন্যে জমিটাও বিক্রি করতে পারছিলাম না।'

যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ধরে খোঁচাচ্ছিল কিশোরকে, এবার জিজ্ঞেসই করে ফেলল সে, 'আপনি নিজেও কি ঢোকেননি এ বাড়িতে?'

'তা ঢুকেছি। গত কালই তো কিচেনে ঢুকেছিলাম একটা কাজে। কেন?'

'রান্নাঘরে পায়ের ছাপ দেখেছি।'

'লিভিং রুমে খড়ও পড়ে থাকতে দেখলাম,' মুসা যোগ করল।

'আমি মাঠ থেকে গিয়ে সরাসরি বাড়িতে ঢুকেছি,' জানাল হ্যারি হ্যারিসন। 'জুতোয় খড়-টড় লেগে ছিল বোধহয়।'

'যব খেতটার মালিকও নিশ্চয় আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আমার নতুন খামারবাড়ি ওই পাহাড়টার পেছনে।'

*

সকাল হয়ে গেছে। বজ্রাঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত খামারবাড়ি এখন স্রেফ অঙ্গারের একটা স্তূপ। পোড়া আবর্জনার ফাঁকে লকলকে জিভ বের করছে অগ্নিশিখা। ইতিমধ্যে দমকলের একটা গাড়ি চলে এসেছে। কি ঘটেছে অল্প কথায় দমকল অফিসারকে জানিয়ে দিল হ্যারিসন। তারপর ফিরল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। আমার বাড়িতে চলো। নাস্তা খাবে।'

মুচকি হাসল মুসা, 'নাস্তা পেলে মন্দ হয় না।' রবিনের দিকে তাকাল। 'কি বলো?'

নীরবে ঘাড় কাত করে সায় জানাল রবিন। মুখে হাসি।

কিশোর বলল, 'খিদেয় আমারও পেট চোঁ চোঁ করছে। সারাটা রাত যব খেতে যে হারে ছোটাছুটি করলাম।'

হ্যারিসন ওদের নিয়ে পিকআপে উঠল। সামনে জায়গা হলো না চারজনের। রবিন বসল সামনে। কিশোর আর মুসা পেছনের খোলা জায়গায়।

ড্রাইভিং সীট থেকে মুখ বের করে পেছনে তাকিয়ে হ্যারিসন বলল, 'নাস্তা খেয়ে তোমাদের গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

শুনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তিন গোয়েন্দা।

যাবার পথে রবিন বলল, 'কাল রাতে যব খেতে কার যেন চিৎকার শুনলাম।'

'আমার চিৎকার শুনেছ,' হ্যারিসন জানাল। 'কুকুরটাকে ডাকতে বেরিয়েছিলাম আমি। খরগোশ দেখলেই তাড়া করে ওটা।'

'মাঠে যা একটা কাকতাড়ুয়া বসিয়েছেন না!'

হেসে উঠল হ্যারিসন। 'কেউ ভয় পায় না। এমনকি কাকেরাও না।'

তবে আমরা পেয়েছি!–মনে মনে বলল রবিন।

'কাকতাড়ুয়ার পোশাকটা কিন্তু অদ্ভুত,' আলাপ চালিয়ে গেল সে।

'মজা করার জন্যে ওগুলো পরিয়েছি ওটাকে,' বলল হ্যারিসন। 'নিলামে পাওয়া কোট-প্যান্ট, জুতোজোড়াও।'

এরপর বাকি রাস্তাটুকু আর বিশেষ কথা হলো না। বাইরের দিকে তাকিয়ে গত রাতের কথা ভাবতে লাগল রবিন। ঘটনাগুলো যে সত্যি ঘটেছে, দিনের আলোয় এখন বিশ্বাস করা কঠিন।

মিসেস হ্যারিসন তাঁর স্বামীর মতই ভাল মানুষ। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন গোয়েন্দাদেরকে। পেট পুরে নাস্তা খাওয়ালেন। রকি বীচ চেনেন তিনি। ছোটবেলায় বহু বছর থেকেছেন। সে-সব নিয়ে গল্প করলেন ওদের সঙ্গে।

নাস্তা খেয়ে মিসেস হ্যারিসনকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোল ওরা। মিস্টার হ্যারিসন আবার ওদের নিয়ে এল ওদের গাড়ির কাছে।

স্পোর্টস সেডানটা আগের মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে খাদের পাশে। কম্পট্রন ওদের গাড়ির সামনের বাম্পারে একটা রশি বাঁধলেন। রশির অন্য প্রান্তটা বেঁধে নিলেন নিজের গাড়ির পেছনে। তারপর টেনে নিয়ে রওনা হলেন গ্যারেজে। মুসা

বসল তাদের গাড়িতে, হুইল ধরে। কিশোর আর রবিন উঠল পিকআপের পেছনে। দুই পাশের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল।

মাইল দশেক যাবার পরে গ্যারেজের দেখা মিলল। ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে হ্যারিসনকে বারবার ধন্যবাদ দিল তিন গোয়েন্দা। সময় আর গাড়ির পেট্রোল খরচ করার জন্যে টাকা সাধল। কিন্তু নিলেন না হ্যারিসন। বললেন, ওদের সাহায্য করতে পেরে তিনি খুশি। তারপর পিকআপ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন বাড়ির দিকে।

কিশোরদের ভাড়া করা গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখল গ্যারেজের মেকানিক। সমস্যাটা ফুয়েল পাম্পে। সারিয়ে দিল ক্রটিটা। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন। গাড়িতে উঠে পড়ল তিন কিশোর। হুইল ধরল মুসা।

'আবার সেই যব খেতের সামনে দিয়েই তো যেতে হবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কাকতাড়ুয়াটাকে আবার দেখতে পারব কিনা কে জানে!'

হাতের চেটো দিয়ে থুতনি ঘষতে ঘষতে বিড়বিড় করল রবিন, 'কিশোর, ওই কাকতাড়ুয়াটাই কিন্তু এবার আমাদের জীবন বাঁচাল।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'যেন বাড়িটাতে বাজ পড়বে যে তা সে আগে থেকেই জানত। ওই বাড়ি থেকে আমাদের দূরে থাকতে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারপরেও বাড়িতে ঢুকেছি দেখে কৌশলে বের করে এনেছিল।'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'এত সব চালাকি না করে আমাদেরকে বিপদটার কথা সরাসরি জানিয়ে দিলেই পারত।'

'তারমানে সন্দেহ আছে তোমার?' রেগে গেল মুসা। 'তুমি আসলেই বড় অকৃতজ্ঞ!'

হেসে ফেলল কিশোর। 'ভূতের কাছে কৃতজ্ঞ হতে বলছ?'

আর কোন কথা না বলে নীরবে গাড়ি চালাল মুসা।

যব খেতের সামনে চলে এল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাকতাড়ুয়াটাকে কাঠের খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় আগের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

'নামবে নাকি?' ঠাট্টার সুরে বলল কিশোর। 'প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসি?'

মুখটা গোমড়া করে রাখল মুসা। জবাব দিল না।

যব খেতের দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনেই। পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হলো কাকতাড়ুয়াটা হাসছে ওদের দিকে চেয়ে। তবে ক্রূর হাসি নয়, বোকা বোকা হাসি।

—o—

জাদুর পুতুল

অলস ভঙ্গিতে 'আন্ডারগ্রাউন্ড আটলান্টা'য় ঘুরে বেড়াচ্ছে তিন গোয়েন্দা। বেড়াতে এসেছে রাশেদ পাশার সঙ্গে। তিনি এসেছেন জরুরী কাজে।

রাস্তার মাটির নিচে কিছু দোকানপাট আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিয়ে গড়ে উঠেছে জায়গাটা।

একটা দোকান থেকে লেটেস্ট হিট অ্যালবাম কিনেছে রবিন। কিশোরের হাতে বুকস্টোর থেকে কেনা একটা ব্যাগ। মুসা কিছুই কেনেনি। ইয়া বড় এক কোণ আইসক্রীম খাচ্ছে।

'বাপরে, চারটে বাজে,' ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো, হোটেলে চলে যাই। গোসল করা দরকার। চাচার সাথে সাড়ে ছ'টায় ডিনার। মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা আর রবিন দু'জনেই। মনে আছে।

অদ্ভুত দোকানটা মুসার চোখে পড়ল প্রথমে। দোকানের সামনে বড় একটা জানালা। কালো রং করা। এক কোনায় প্রমাণ সাইজের একটা নরকঙ্কাল ঝুলছে। ডিসপ্লেতে ঝাড়ফুঁক, ভূত-প্রেত, জাদু-মন্ত্র ইত্যাদির ওপরে নানা বই সাজানো।

'অ্যাই, কিশোর,' আঙুল তুলে দেখাল মুসা, 'দেখো দেখো, সাইনবোর্ডটা: এখানে হাত দেখা হয়। চলো না, আমাদের ভাগ্যে কি আছে জেনে আসি।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'আবারও ভাগ্য গণনা! গত বারের কথা ভুলে গেছ? জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, আমাদের মাথায় শিং গজাবে। তিনজনেরই।'

'সম্ভাবনা এখনও ফুরিয়ে যায়নি,' হাসল রবিন। 'এবার হয়তো বলবে লেজ গজাবে।'

স্টোরের ভেতরে ঢুকল ওরা। ডাইনীর গুহার আদলে সাজানো হয়েছে ঘরটা। মৃদু আলো ধীরে ধীরে রঙ বদলাচ্ছে, আশপাশের সব কিছু ভূতুড়ে লাগছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে রোমাঞ্চকর মিউজিক। ঘরের দেয়ালে অদ্ভুত সব জিনিস সাজানো। কতগুলো বাক্স দেখা গেল। সেগুলোতে নানা ধরনের লেবেল সাঁটানো—'প্রেমের আরক', 'ঘৃণার আরক', 'কর্মজীবনে উন্নতির আরক', ইত্যাদি। বড় বড় খোলা পাত্র আছে কতগুলো। অদ্ভুত সব জিনিসে ভরা। লেখা দেখে বোঝা যায় ওগুলোতে আছে কুকুরের চুল, গোসাপের চোখ, ময়ূরের যকৃৎ, সাপের খোলস এবং ম্যানড্রেক গাছের শিকড়।

'শুকনো মাথাগুলো দেখো,' একটা কাঁচের বাক্সে আঙুল দিয়ে দেখাল মুসা। 'ভয়ঙ্কর লাগছে না?'

'সাবধান না হলে আমাদের দশাও ওগুলোর মতই হতে পারে,' ঠাট্টা করল কিশোর।

মুসা বলল, 'জায়গাটা জানি কেমন লাগছে আমার। ঠিক বোঝাতে পারব না...'

'হুঁ, তা ঠিক,' মাথা দোলাল রবিন। এই ভূতুড়ে আবহর মধ্যে গা ছমছম

করছে ওরও : ভয়ের কিছু নেই, এখানকার সব কিছুই সাজানো, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

'মনে হচ্ছে যেন অ্যাজটেকের মন্দির। বলি দেয়ার ঘর,' মন্তব্য করল কিশোর। এদিক ওদিক তাকাল। 'কিন্তু কেউ নেই নাকি এখানে?'

যেন তার কথার জবাবেই খসখসে একটা কণ্ঠ ভেসে এল ঘরের দূর প্রান্ত থেকে। 'কি চাই?'

পাক খেয়ে ঘুরে গেল ওরা। দেখল ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মহিলা। পরনে গোড়ালি ঢাকা কালো আলখেল্লা, লম্বা কালো চুল ঢেকে রেখেছে মুখের একটা পাশ। মহিলার কালো চোখের তির্যক দৃষ্টি. সবুজ আইশ্যাডো আর ঠোঁটের লাল টকটকে লিপস্টিকে তাকে ভ্যাম্পায়ারের মত লাগছে।

'হাত দেখাতে চাই,' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'কত লাগবে?'

'দশ ডলার,' জবাব দিল মহিলা।

'আমার কাছে চার ডলার আছে,' বলল মুসা। 'চলবে এতে?'

ইঙ্গিতে কিশোর আর রবিনকে দেখিয়ে মহিলা বলল, 'তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে নিতে পারো না?'

'তিনজনে মিলিয়ে তিরিশ তো?' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমাদের কাছেও অত টাকা নেই। চলো, মুসা, আজ আর হাত দেখানো হলো না।'

হাত তুলল মহিলা। তাড়াতাড়ি বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমাদেরকে আমার ভাল লেগেছে। যা আছে, তাতেই দেখে দেব। কে আগে দেখাবে?' ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে তাকাল মহিলা। 'তুমি?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'আমার আপত্তি নেই।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

দরজার পর্দা সরিয়ে ওদেরকে নিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকল মহিলা।

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা।

এ ঘরটা আগেরটার চেয়েও ভূতুড়ে। পুরো ঘর কালো মখমলে মোড়া। একটা বেগুনি রঙের বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে সবার দাঁত আর চোখের মণিও বেগুনি দেখাল। ভয়ঙ্কর লাগল তাতে। হঠাৎ করেই মনে হতে লাগল তিন গোয়েন্দার, এখান থেকে আর বেরোতে পারবে না কোনদিন। সময় থাকতে পালাবে কিনা চিন্তা করতে লাগল মুসা। কিন্তু মহিলা ততক্ষণে নিচু একটা টেবিলে বসে পড়েছে। কিশোরকে ইশারা করল তার পাশে বসতে। টেবিলটা কালো মখমলে মোড়া। ওপরে একটা কাঁচের বড় বল।

কিশোরের হাতের তালু মেলে ধরল মহিলা। চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। টেবিলের সামনে দুটো কুশনে বসেছে রবিন আর মুসা। গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে মহিলার কাজকর্ম।

'তোমার বয়স আঠারো,' কিশোরের হাত দেখে অবশেষে বলতে শুরু করল মহিলা। 'তুমি সাগরের ধারের কোনও শহরে, বড় একটা বাড়িতে বাস করো। সাংঘাতিক বুদ্ধিমান তুমি, ছাত্র হিসেবে ভাল, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র আর

কম্পিউটারে আগ্রহ। আরও একটা কাজে তুমি খুব দক্ষ, কারও ওপর নজর...অর্থাৎ সতর্ক দৃষ্টি রাখা...'

এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিল সে। 'তোমার জন্ম তারিখ কবে বলো।'

বলল কিশোর। মহিলা তারিখটা লিখে কাগজের ওপর কতগুলো লাইন টানল। লাইনগুলো কাটাকুটি করে তারপর আঁকল একটা বৃত্ত।

'ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাও!' হঠাৎ বলে উঠল সে।

তাকাল কিশোর। তবে ভেতরে ভেতরে সতর্ক। জানে ক্রিস্টাল বল দিয়ে জ্যোতিষীরা সম্মোহন করে ফেলে।

কিন্তু মহিলা সম্মোহন করল না কিশোরকে। সে-ও চেয়ে রইল ক্রিস্টাল বলের দিকে। ঝাড়া এক মিনিট ওদিকে তাকিয়ে থাকার পরে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

'তুমি গোয়েন্দা!' রেগে গেছে মহিলা। 'তোমরা এখানে কেন এসেছ? আমার লাইসেন্স আছে। আমি অন্যায় কিছু করছি না। পুলিস আমার কিছু করতে পারবে না।'

'আমি পুলিসের লোক নই, ম্যা'ম,' তাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'আমরা আসলে শখের গোয়েন্দা। আপনার কাছে এসেছি শুধুই হাত দেখাতে। অন্য কোন মতলব নেই আমাদের।'

'অ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা। 'তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। আমার কাছে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আসে। আমি তাদের নানা সাহায্য করি। দরকার হলে তোমরাও আমাকে ভাড়া করতে পারো। তোমাদের রহস্য উদ্ঘাটনে অনেক সাহায্য করতে পারব।'

'মনে হচ্ছে আপনার সেই ক্ষমতা আছে,' সন্দিহান সুরে বলল কিশোর। 'আপনি আমাকে আগে কখনও দেখেননি। অথচ আমার সম্পর্কে সব বলে দিলেন।'

'আসলে পত্রিকায় আমাদের ছবি দেখেছে,' রবিন বলল। 'পত্রিকায় আমাদের কেসের কথা তো মাঝে মাঝেই ছাপা হচ্ছে ।'

কড়া চোখে রবিনের দিকে তাকাল মহিলা। চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদের নামও কোনদিন শুনিনি আমি। যা বলেছি, আমার জাদুর ক্ষমতার জোরেই বলেছি। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ঠিক আছে। হাত দেখা শেষ করি আগে। তারপর ঠিকই বিশ্বাস করবে।'

আবার ক্রিস্টাল বলের দিকে তাকাল মহিলা। 'আমি মোটর সাইকেল দেখতে পাচ্ছি। দুটো মোটর সাইকেল। তোমাদের মধ্যে একজনকে পেছনে বসিয়ে আনা হয়েছে।' আবার উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠ। 'গোয়েন্দাগিরি তোমরা আগেও বহুবার করেছ। তবে এবার তোমাদের সামনে বিপদ দেখতে পাচ্ছি আমি। ভয়ানক বিপদ!'

'অ্যাক্সিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। নতুন কোন কেসে জড়িয়ে পড়বে তোমরা। দেখতে পাচ্ছি–দেখতে

পাচ্ছি এক চোখো একটা লোককে। নীল চোখ। সাদা গাড়িতে চড়ে সে। খুবই বিপজ্জনক লোক। তার ধারে কাছেও যেয়ো না। লোকটার কাছ থেকে সব সময় দূরে থাকবে।'

মহিলার কণ্ঠ ভীষণ জোরাল হয়ে উঠল, চেহারা দেখে মনে হলো সমাধিস্থ হয়ে পড়েছে সে। চোখ বোজা। যেন জানে না কোথায় আছে।

'সিলভার স্টার থেকে সাবধান!' ফিসফিস করল সে। 'ওখানে যেয়ো না।'

'সিলভার স্টার কি?' প্রশ্ন করল রবিন।

জবাব দিল না মহিলা। খামচে ধরল কিশোরের হাত। ব্যথা পেল কিশোর।

'এক চোখো লোকটার কাছ থেকে সাবধান!' ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে মহিলার। 'সিলভার স্টার থেকে সাবধান! আমি...আমি সোনা দেখতে পাচ্ছি! অনেক সোনা। কিন্তু ওই সোনা অশুভ। ধরতে যেয়ো না। ধরলে...ধরলে...মৃত্যু হবে! ওই সোনাকে ঘিরে আছে মৃত্যু আর...'

হঠাৎ চোখ খুলল মহিলা। বিস্ফারিত চাউনি। কিশোরের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিম্বু! সিম্বু আছে ওখানে! ওর কাছে যেয়ো না!' তারপরই চোখ উল্টে দিয়ে, অজ্ঞান হয়ে কালো মখমলে ঢাকা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'মুসা, রবিন–দেখো তো এখানে পানি-টানির ব্যবস্থা আছে কিনা। পানি নিয়ে এসো।'

জ্যোতিষীর জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। সিঙ্ক থেকে তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এল রবিন। ভেজা তোয়ালে দিয়ে তার মুখ মুছে দিতে লাগল কিশোর।

'প্রথমে ভেবেছিলাম ভঙ্গি ধরেছে,' কিশোর বলল। 'এখন তো দেখি সত্যি সত্যি বেহুঁশ।'

'কিন্তু মহিলা কি যেন বলছিল!' রবিনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'হুঁশ ফিরলে জিজ্ঞেস করব,' বলল কিশোর।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাল মহিলা।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল কিশোর।

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল জ্যোতিষী। 'ভীষণ শক্তিশালী কম্পন অনুভব করছি আমি!... যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আটলান্টা ছেড়ে চলে যাও তোমরা। তোমাদের অনুরোধ করছি আমি।'

'সিম্বুটা কে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'কে, জানতে চাও?' আস্তে উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'এসো আমার সঙ্গে।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল সে।

শেলফ থেকে কিশোরকে একটা বই বের করে দিল মহিলা। 'এটা পড়ো। সিম্বু কি জানতে পারবে। না, দাম দিতে হবে না। বইটা তোমাদের এমনিই দিলাম। এখন যাও। আর কোনদিন এদিকে এসো না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ভাগ্য খারাপ!'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিশোর, মহিলার চেহারা দেখে চুপ হয়ে গেল।

ভয় ফুটে আছে মহিলার মুখে। তাতে কোন ভণিতা নেই।

'চলো,' দুই সহকারীকে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। হাত নেড়ে মহিলাকে বলল, 'গুড-বাই। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।'

'উফ্, বাঁচলাম!' অদ্ভুত দোকানটা থেকে বেরিয়ে এসে যেন হাঁপ ছাড়ল মুসা। 'অভিজ্ঞতা একটা হলো বটে!'

রবিন বলল, 'তুমিই তো ঢুকতে চাইলে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কি যেন রয়েছে ওই মহিলা আর তার দোকানের মধ্যে। আরেকটু হলেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম তার কথা।'

ভুরু কুঁচকাল মুসা। অবাক। 'তারমানে করোনি?'

*

হোটেলে ফিরে কিশোর গেল বাথরুমে। মুসা বিছানায় চিৎ। আর রবিন শুয়ে শুয়ে মহিলার দেয়া বইটা পড়তে শুরু করল।

বইটা ভুডু চর্চার ওপরে লেখা।

ভুডু-তন্ত্রের জন্ম আফ্রিকায় হলেও হাইতি দ্বীপে এই রহস্যময় ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে চর্চা হয় বেশি। জাদুমন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, নরবলি এ সবের সাহায্যে কিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বইটাতে।

গোসল সেরে বেরিয়ে এল কিশোর।

রবিন বলল, 'জাদু করে তোমাদের যে কারও হাত এখন ভেঙে দিতে পারি আমি। এ জন্যে শুধু একটা পুতুল দরকার হবে আমার। পুতুলের হাতে সুচ ঢুকিয়ে দিলে মনে হবে তোমাদের হাতেও সুচ ঢুকে গেছে। বাবারে-মারে বলে চেঁচানো শুরু করবে।'

লাফ দিয়ে উঠে বসল মুসা। 'না না, প্লীজ, এখন ওকাজটিও কোরো না ভাই! পাশা আঙ্কেলের সঙ্গে ডিনারের দাওয়াতটা আগে সেরে নিই। হাতে ব্যথা থাকলে খাওয়াটা আর জমবে না।'

হেসে ফেলল কিশোর আর রবিন।

'তবে, এ বিদ্যেটাতে যদি বিশ্বাস না থাকে তোমার,' বলল রবিন, 'তাহলে আর কোন ভয় নেই। তোমার ক্ষতি হবে না।'

'অ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'তাহলে এটা কি আর এমন ক্ষমতা হলো। পচা জাদু।'

'সিম্বু কি জিনিস জানতে পেরেছ?' আলমারি থেকে পরিষ্কার একটা শার্ট বের করল কিশোর।

'ছোট, মোটাসোটা একটা পুতুলের নাম সিম্বু,' রবিন বলল। 'ভয়ঙ্কর চোখ জোড়া কোটর ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। এই যে, ছবিও আছে।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল কিশোর। সিম্বু দু'হাত শূন্যে তুলে রেখেছে। প্রতিটি হাতে দশটা করে আঙুল। পা জোড়া ফাঁক করা। পায়েও দশটা করে মোট বিশটা আঙুল। কোমরে চওড়া বেল্ট।

'বাপরে, চেহারা বটে!' মন্তব্য করল কিশোর। 'তা এই সিম্বুটা আসলে কে?'

'দুর্লভ একটা চরিত্র,' ব্যাখ্যা করল রবিন। 'সিম্বু তার মনিবের ধনসম্পদ পাহারা দেয়। এ ধরনের পুতুল এখন পাওয়া যায় না বললেই চলে। সংগ্রাহকদের কাছে খুবই মূল্যবান বস্তু। ইদানীং সিম্বুর আদলে বেশ কিছু মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। তবে কোনটাই আসল সিম্বুর ধারে কাছে যেতে পারেনি।' বইটা কিশোরকে দিল ও। 'নাও, তুমি পড়তে থাকো। আমি এই ফাঁকে গোসলটা সেরে আসি।'

কিশোর বসল বই নিয়ে। মুসাকে পড়ে শোনাল, 'সিম্বুর কাজ হলো সব সময় তার প্রভুর পাশে থাকা, তাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করা। কেউ সিম্বুর ক্ষতি কিংবা সে যাকে পাহারা দেয় তার ক্ষতির চেষ্টা করলে, মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ছাড়ে।

'একবার হাইতিতে দুটো সিম্বু পুতুল পাওয়া গিয়েছিল। মিউজিয়ামে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল ওগুলো। তার পর থেকেই ঘটতে শুরু করল অঘটন। যারা ওগুলোকে খুঁজে পেয়েছিল, রহস্যময় ভাবে ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটল তাদের। তাতেও অঘটন বন্ধ হলো না। মিউজিয়ামের পানির পাইপ বিস্ফোরিত হতে লাগল, ছাতের ভারী আস্তর খসে পড়ে কাঁচের বাক্স চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে শেষে যেখান থেকে পুতুল দুটো আনা হয়েছিল, ফিরিয়ে দিয়ে এল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। অবশেষে বন্ধ হলো দুর্ঘটনা।'

খানিক পরে মুসা আর রবিনকে নিয়ে হোটেলের লবিতে চলে এল কিশোর। রাশেদ পাশা ওখানেই আছেন। কিশোরের হাতে একটা ব্রীফকেস। ওতে তার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। রাস্তায় নেমে হাত তুলে ট্যাক্সি ডাকলেন।

'সিলভার স্টারে যাব,' জানালেন তিনি ড্রাইভারকে।

'কি!' চমকে উঠল কিশোর। 'কোথায় যাচ্ছি?'

'এই তো কাছের একটা রেস্টুরেন্টে,' বললেন রাশেদ পাশা। 'তোদের পছন্দ হবে। সিলভার স্টারের সী-ফুডও চমৎকার।'

তিন গোয়েন্দা আর কিছু না বলে চুপচাপ উঠে বসল ট্যাক্সিতে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কোণের দিকে একটা টেবিল দখল করল। বিকেলের ঘটনাটা চাচাকে জানাল কিশোর।

'সাদা গাড়িতে চড়ে নীল চোখো লোক?' আনমনা ভঙ্গিতে বললেন রাশেদ পাশা। 'এক চোখো। মনে হয় বুঝতে পারছি মহিলা কার কথা বলেছে।'

'কার কথা?' অবাক হলো কিশোর।

'লোকটার নাম পিয়েরে দুঁপা,' বললেন রাশেদ পাশা। 'নষ্ট একটা চোখ ঢেকে রাখে সাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে। সাদা মার্সিডিজ চালায়। ঠাণ্ডা মাথার ভয়ঙ্কর এক খুনী।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

'যখন পেশাদার গোয়েন্দা ছিলাম, দুঁপার সাথে বেশ কয়েকবার টক্কর লেগেছে আমার,' রাশেদ পাশা বললেন। 'কিন্তু লোকটা বাইন মাছের মত পিচ্ছিল। ওকে

ধরার জন্যে জাল গুটিয়ে এনেছি যতবার, ততবারই ও জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ওর বিরুদ্ধে ডাকাতির বহু অভিযোগ এনেছি, লাভ হয়নি। সব সময় ফস্কে গেছে। মহা ধুরন্ধর এক লোক। তার কাজে যে-ই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, পথের কাঁটা দূর করতে দ্বিধা করেনি কখনোই।'

'ওর বিশেষত্ব কি?' জানতে চাইল কিশোর।

'অ্যান্টিক চোর,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'বিবেক বর্জিত কিছু সংগ্রাহকের কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, চড়া দামে। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে অবশ্য ওসব সংগ্রাহক তাদের সংগ্রহের প্রদর্শনী করার সাহস পায় না কখনোই। কি এক সাংঘাতিক নেশায় যেন তবু কেনে ওরা।'

'মহিলা জ্যোতিষী সিম্বুর কথা বলেছিল,' বলল কিশোর। 'আর সিম্বু হলো দামী অ্যান্টিক। সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কিন্তু দুঁপা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। সিম্বুর অভিশাপ থেকে একশো হাত দূরে থাকার কথা তার। অবশ্য প্রচণ্ড লোভ তাকে কোন্ পর্যন্ত নিয়ে যাবে সেটা অনুমান করা কঠিন।'

'আঙ্কেল, জ্যোতিষী মহিলা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করল, সেগুলো কি বিশ্বাস হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

শ্রাগ করলেন রাশেদ পাশা। 'কে জানে! হয়তো কিছু ঘটার আভাস পেয়েছে মহিলা। বাস্তব প্রমাণ। অভিশাপ, ভবিষ্যদ্বাণী—এ সব জিনিসে বিশ্বাস নেই আমার। তবে জগতে অব্যাখ্যাত বহু জিনিসই ঘটে। সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই।'

'সিলভার স্টারে আসার পর থেকেই মনটা খচখচ করছে আমার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন।

'আমার ধারণা,' কিশোর বলল, 'দুঁপা যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক না কেন, সিম্বুকে পাবার লোভ ছাড়তে পারবে না কিছুতেই।'

কিশোরের কথা কানে গেল না রবিনের। সে কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে। রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কিশোর। হাঁ হয়ে গেল মুখ।

'ওই তো সেই লোক!' ফিসফিস করল সে। 'নীল চোখো লোকটা!'

রাশেদ পাশাকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে হলো না। দুঁপা নিজেই এগিয়ে এল তাদের টেবিলের দিকে। 'মঁশিয়ে পাশা, আপনাকে আবার দেখে খুব খুশি হলাম,' তার গলার স্বর তেলতেলে, বিরস।

'কিন্তু তোমাকে দেখে আমি খুশি হতে পারিনি, দুঁপা,' বললেন রাশেদ পাশা। 'কি চাও?'

'আপনারা আসার আগে এই টেবিলে এক বন্ধুকে নিয়ে বসেছিলাম আমি। সে একটা খাম নাকি ফেলে রেখে গেছে এখানে। খামটা কি আপনাদের চোখে পড়েছে?'

'না, পড়েনি,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

'কিছু মনে না করলে একটু উঠে দাঁড়াবেন দয়া করে?' বলল লোকটা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার পাশা। দেখাদেখি তিন গোয়েন্দাও।

দুঁপা টেবিলের নিচে, চেয়ারের নিচে, গদির তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজল। পেল না কিছুই। তার চেহারা কঠিন। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, মঁশিয়ে পাশা। তবে খামটা আপনাদের চোখে পড়ে গেলে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি জানি আপনার মত গণ্যমান্য ব্যক্তির ওপর ভরসা রাখা চলে, কি বলেন?'

রাশেদ পাশা কটমট করে তাকালেন দুঁপার দিকে। 'খামটা আমরা পাইনি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল দুঁপার কণ্ঠ। 'আমি চাই না পুলিস ডেকে আপনার এবং আপনার ছেলেদের সার্চ করাই।' চেয়ারের ওপর রাখা কিশোরের ব্রীফকেসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওটাতে নেই তো?'

রাশেদ পাশা বসে পড়েছিলেন, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ন্যাপকিনটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমি জানি না তোমার খামে কি আছে। তবে মনে হচ্ছে ওটা পড়তে পারলে খুশিই হবে পুলিস। যাও, ডেকে নিয়ে এসো পুলিসকে। আমরা অপেক্ষা করছি।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল দুঁপা, বিড়বিড় করে কি যেন বলল। বোধহয় গোয়েন্দাদের মজা দেখাবে বা এ রকম কিছু। তারপর জুতোর গোড়ালিতে ভর করে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'এতে কি প্রমাণ হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'জ্যোতিষীর কাছে গেলে জবাব মিলতে পারে,' ঠাট্টা করল কিশোর।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন রাশেদ পাশা। 'আমার ধারণা দুঁপা বা সিম্বুকে নিয়ে আরও ঘটনা ঘটবে।'

'সিম্বু সম্পর্কে আর কি জানো, চাচা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আটলান্টা রাজ্যের অনেকেই জানে সিম্বুর কথা। গৃহযুদ্ধের আগে এই পুতুলটাকে নিয়ে একটা গুজব চালু হয়েছিল,' রাশেদ পাশা বললেন। 'ধনী এক বুড়ো বাস করত এখনকার রুট থ্রী-এইটি রোডের ধারে, বিশাল এক বাড়িতে। আপনার বলে কেউ ছিল না বুড়োর। কালো চামড়ার এক চাকরকে নিয়ে থাকত বিশাল বাড়িতে। চাকরটাকে পছন্দ করত বুড়ো। চাকরটারও ছিল বুড়োর জন্যে জান-প্রাণ। ভুডু ম্যাজিকে বিশ্বাস করত চাকরটা। তার মালিককেও সে ভুডু চর্চায় উৎসাহিত করে তোলে। যা হোক, গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ইউনিয়ন আর্মি হামলা চালায় দক্ষিণ এবং পুবে। বুড়ো তার ধন-সম্পদের কি দশা হবে তা ভেবে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।'

'খুবই স্বাভাবিক,' মুচকি হাসল কিশোর।

'সোনার টাকা, মোহর–যা কিছু ছিল তার, সব গলিয়ে সোনার বার বানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখে বুড়ো। সে-সব পাহারা দেয়ার জন্যে ওগুলোর সঙ্গে রেখে দেয় একটা সিম্বু পুতুল। পুতুলটা বানিয়ে দিয়েছিল তার কালো-চাকর। ইউনিয়ন আর্মিকে ঠেকাতে পাথরের দেয়ালও তুলেছিল বুড়ো। কিন্তু ঠেকাতে পারেনি। সৈন্যরা বাড়িতে ঢুকে খুন করে বুড়ো আর তার চাকরকে। তবে যদ্দূর জানি,

সোনা-দানার সন্ধান আজতক কেউ পায়নি।'

'দারুণ গল্প!' রবিন বলল। 'সেই গুপ্তধনের খোঁজ করেনি কেউ?'

'করেছে নিশ্চয়। আমি জানি না,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা। 'তবে কেউ ওগুলোর খোঁজ পেলে মূল্যবান সিম্মু পুতুলটাও পেয়ে যাবে।'

'তা পাবে,' মুসা বলল। 'সেই সঙ্গে অভিশাপের শিকারও হওয়া লাগবে হয়তো।'

নীরব হয়ে গেল চারজনেই। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

তারপর এয়ারপোর্টে গেল তিন গোয়েন্দা, রাশেদ পাশাকে পৌঁছে দিতে। রাশেদ পাশা নিউ ইয়র্কে যাবেন বিশেষ কাজে।

যাবার পথে কেন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল কিশোরের। অদ্ভুত এক অনুভূতি। ট্যাক্সির রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে বলল, 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে।'

সামনের ট্রাফিক লাইটে দাঁড়াতেই চেনা গেল লোকটাকে। সাদা একটা মার্সিডিজ, কিশোরদের ট্যাক্সির প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এক চোখো সেই লোকটা।

'হয়তো ভেবেছে তার খামটা মেরে দিয়েছি আমরা!' নিচু স্বরে বলল রবিন।

'মনে হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন রাশেদ পাশা। 'আমাদেরকে খুন করার ইচ্ছে থাকলেও অবাক হব না। সাবধানে থাকতে হবে। বিশেষ করে তোমাদের।...আগামী ক'দিন কি প্ল্যান তোদের, কিশোর? কি করবি ভাবছিস?'

'কোস্টের দিকে যাব। সৈকতে ঘুরে বেড়াব। দেখি, আরও কি কি করা যায়।'

'যা-ই করিস, সাবধানে থাকিস। বলা যায় না...'

আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। পিয়েরে দুঁপার টিকিটিও দেখা গেল না আর আশেপাশে। চাচাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আবার ট্যাক্সি নিল কিশোর। হোটেলে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। রাস্তার ওপারে দুঁপার গাড়িটা দেখতে পেল কিশোর।

'লোকটা আসলে চায় কি?' মুসার প্রশ্ন।

'লোকটা বোধহয় ধরেই নিয়েছে আমরা তার খাম চুরি করেছি। তাই পিছু ছাড়ছে না,' কিশোর বলল। 'লোকটার ওপর আমাদেরও নজর রাখতে হবে।'

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। রুমে এসে ব্রীফকেসটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল কিশোর। ওটার দিকে তাকাতেই চোখ স্থির হয়ে গেল রবিনের।

'কিশোর! ব্রীফকেসের নিচে কি যেন লেগে আছে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'কি ওটা?'

একটা খাম। আটকে আছে ব্রীফকেসের তলায়।

'আরি!' কিশোরও অবাক। 'এটা এল কোত্থেকে!'

খামটা খুলে নিল সে। 'বুঝতে পেরেছি। ব্রীফকেসের গায়ে কোন ভাবে লেগে গিয়েছিল চিবানো চিউয়িং গাম। তাতে আটকে গেছিল খামটা। চেয়ারেই পড়ে ছিল ওটা, মিথ্যে বলেনি দুঁপা। বড়ই কাকতালীয় ঘটনা। এবং অদ্ভুত।'

'খোলো তো দেখি!' তাড়া দিল মুসা। 'ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তর সইছে না আমার।'

খাম খুলল কিশোর। ভেতরে জরাজীর্ণ, মলিন এক টুকরো কাগজ। তাতে অদ্ভুত কিছু কথা লেখা ছড়ার ঢঙে। কিশোর জোরে জোরে পড়ে শোনালঃ

ভাবছ ওটা আছে হোথায়
খুঁজলে পাবে নাকো সেথায়
পাহাড় বেয়ে ওঠো মাথায়
আবার নামো নিচে
অনেক গভীর শিকড় যেথায়
পাহারা দেয় সিম্বু সেথায়
সোনা চুরির ফন্দি ছাড়ো
মানে মানে কেটে পড়ো
নইলে আছে দুঃখ অনেক
বাঁচবে নাকো কেউ!

অবাক হয়ে গেল ওরা।

'রাশেদ আঙ্কেল যে বুড়ো লোকটার গল্প বলেছে এটা নিশ্চয় তার কাজ।' অবশেষে বলল রবিন। 'ওই লোক তার ক্রীতদাসের সাহায্যে সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছিল। পাহারার ব্যবস্থা করেছিল সিম্বুকে দিয়ে।'

'জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে,' ফাঁকা শোনাল মুসার কণ্ঠ। 'আমরা লোভে পড়ে গুপ্তধনের সন্ধানে বেরোলেই অভিশাপ নেমে আসবে আমাদের ওপর।'

'দূর, তোমার অভিশাপ! কে বিশ্বাস করে?' মুখ ঝামটা দিল রবিন।

'যা-ই বলো, অদ্ভুত কিছু যে ঘটছে এখানে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কি বলো, কিশোর?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকাল কিশোর, 'হুঁ!'

'আমাদের এখন কি করা উচিত তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। 'ব্যাপারটার শেষ দেখে ছাড়ব। সোনা যদি পেয়েই যাই পুলিস বা কোন চ্যারিটির হাতে তুলে দেব।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। দুঁপা ওদের দিকে নজর রাখছে কিনা দেখার জন্যে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। 'বৃষ্টি শুরু হয়েছে,' জানাল সে। 'আমাদের বন্ধুটি এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে···না না, চলে যাচ্ছে। ভেবেছে হয়তো ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমরা কোথাও বেরোব না।'

আকাশ ফুটো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। গাছের শাখায় ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি।

'চলো, এই সুযোগে বেরিয়ে পড়ি,' প্রস্তাব দিল মুসা। 'রেইনকোট আছে। কাজেই ভিজতে হবে না বৃষ্টিতে। আর ক্যাম্পিং-এর জন্যে গর্ত খোঁড়ার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম। ওগুলোও নেব সাথে।'

'প্রস্তাবটা মন্দ না,' নিমরাজি হলো কিশোর। 'ঠিক আছে, চলো। চুপচাপ হোটেলে বসে থাকতে ভাল্লাগবে না। দেখেই আসি সিম্বুকে পাওয়া যায় কিনা।'

কয়েক মিনিট পরে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। এখানে ওদের বাইক রেখেছে। সাবধানে মোটর সাইকেল দুটো নিয়ে উঠে এল মেইন রোডে। তাকাল এদিক-ওদিক। নাহ্, সাদা মার্সিডিজের চিহ্নও নেই কোথাও। রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য। গন্তব্য বুড়োর বাড়ি।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে। একটু পরেই থেমে গেল বৃষ্টি। মেঘ সরিয়ে দিয়ে হেসে উঠল ঝলমলে চাঁদ। নদীর ধারে চলে এসেছে ওরা। নদীর পাশের সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল। অনেকটা পথ যাবার পর চোখে পড়ল বুড়োর বাড়ি। রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। বড় বড় সব যন্ত্রপাতি। খানিক দূরে একটা পাথুরে দেয়াল। ঘিরে রেখেছে বুড়োর শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটাকে। মোটর সাইকেল থামাল ওরা। হেঁটে ঢুকে পড়ল গেট দিয়ে। চাঁদটাকে আড়াল করে দিতে শুরু করেছে মেঘ। বাতাস উঠছে। একটু পরেই আবার নামল বৃষ্টি।

'বাহ্, দারুণ!' বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'এই আসে এই যায়!'

টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে ওরা। বড় বড় ওক গাছের ডালে ঝুলে থাকা এক ধরনের শ্যাওলার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে যাত্রা। টর্চের আলোতে খুব কম জায়গাই আলোকিত হচ্ছে।

কানের পাশে নিশাচর পাখি তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠে দারুণ চমকে দিল ওদেরকে। ডাকতে ডাকতে বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ কোরাস ধরেছে ব্যাঙ। হাঁটু ডুবে যাওয়া গভীর জলায় নেমে পড়েছে কিশোর। পায়ের নিচে পিচ্ছিল কি একটা কিলবিল করে উঠল। আঁতকে উঠল ও। এক লাফে উঠে এল তীরে।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

'সাপ!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'গোখরো! আরেকটু হলেই গেছিলাম।'

পুরানো বাড়িটার কাছাকাছি এসেছে ওরা, এমন সময় মড়মড় করে একটা ডাল ভেঙে গেল। মুসা দেখল ডালটা সোজা রবিনের গায়ে পড়তে যাচ্ছে। সাবধান করে দেয়ার সময় নেই। প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল রবিনকে। ছিটকে পড়ে গেল রবিন। বিশাল মোটা ডালটা এক সেকেন্ডের জন্যে তার শিকার হারাল। ডালটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রবিন। 'আরেকটু হলে আমিও গেছিলাম,' খসখসে গলায় বলল ও।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। সিম্বু পুতুলের কারণে মিউজিয়ামে দুর্ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে তার। 'ফিরে যাবে নাকি?'

'নাহ্? ওই তো সামনেই বাড়িটা।'

ওটাকে এখন আর বাড়ি বলা যায় না। দেয়ালগুলো শুধু খাড়া হয়ে আছে, ছাদ অদৃশ্য। এবড়োখেবড়ো মেঝে। আবর্জনা, ভাঙা কাঠ আর অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্রে বোঝাই মাটির নিচের ঘরটা।

'ভাবছ ওটা আছে হোথায়, খুঁজলে পাবে নাকো সেথায়, পাহাড় বেয়ে ওঠো মাথায়, আবার নামো নিচে,' বিড়বিড় করে ছড়াটা আওড়াল কিশোর। ছোটখাট

একটা পাহাড়ের মত টিলার মাথায় চড়ে তরাইয়ের চারপাশে চোখ বোলাল। বেশির ভাগটাই সমতল।

'নেমে কোন্ দিকে যেতে হবে?' জানতে চাইল রবিন।

'মনে হয় বাড়ির পেছন দিকে যেতে বলেছে। চলো, দেখে আসি।'

দেখা গেল বাড়ির পেছন থেকে মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

'অনেক গভীর শিকড় যেথায়, পাহারা দেয় সিম্বু সেথায়,' এবার আবৃত্তি করল রবিন। 'কিসের শিকড়? এদিকে কোনও বড় গাছটাছ তো চোখে পড়ছে না।'

'রূট সেলারের কথা বলেনি তো?' বলে উঠল কিশোর। 'ঠিক! তা-ই বুঝিয়েছে। সেলার শব্দটা ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছে। গুপ্তধন শিকারীকে ধোঁকা দেবার জন্যে। রূট মানে শিকড়। সেলার বাদ দেয়াতে শুধু গাছপালাই খুঁজে বেড়াবে যারা গুপ্তধন খুঁজতে আসবে। আমরাও সেই ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলাম।...আগেকার দিনে ঘর-বাড়িতে রূট সেলার থাকত বলে জানতাম। লোকে শাক-সব্জি রাখত রূট সেলারে। তখন তো আর ফ্রিজ আবিষ্কার হয়নি।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলাল রবিন। 'প্রশ্ন হলো, রূট সেলারটা কোথায়?'

'চলো, ওই টিলায় উঠে লাফালাফি করি,' বুদ্ধি দিল কিশোর। 'ফাঁপা হলে শব্দ শুনেই বোঝা যাবে।'

'কিন্তু টিলায় চড়ব কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'পাহাড় বেয়ে ওঠো মাথায়, আবার নামো নিচে, বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে ছড়াকার,' জবাব দিল কিশোর। 'সে-জন্যেই উঠব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই টিলার নিচেই কোনখানে আছে গুপ্তধন।'

পাহাড়ের গায়ে লাফালাফি করতে গিয়ে কাদা মেখে ভূত হয়ে গেল তিনজনেই।

ঘণ্টাখানেক এ ভাবেই চলল। হঠাৎ মুসা বলে উঠল, 'দাঁড়াও। দাঁড়াও। এখানে ফাঁপা একটা আওয়াজ শুনেছি। খুঁড়ে দেখা যাক।'

পরের আধঘণ্টা নিবিষ্ট মনে মাটি খুঁড়ে চলল তিন গোয়েন্দা। পরিশ্রমের ফল মিলল অবশেষে। মাটি সরে বেরিয়ে এল কাঠ। আধ পচা কাঠে শাবল দিয়ে বার কয়েক গুঁতো মারতেই ভেঙে গেল। টর্চের আলোতে একটা গর্ত দেখতে পেল ওরা। বারো ফুট মত গভীর হবে। খালি গর্ত।

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'খামোকাই এত খাটলাম!'

'এক মিনিট,' বলল কিশোর। 'এখানেই কোথাও আছে। নইলে এত খাটতে যেত না বুড়ো। রূট সেলারের কাঠের মেঝের নিচেই রেখেছে সোনার বারগুলো।'

সঙ্গে করে আনা টুল কিট থেকে রশি বের করল কিশোর। রশির এক মাথায় হুক লাগিয়ে মাটিতে গাঁথল। রশি বেয়ে প্রায় বারো ফুট নিচে নেমে এল। মেঝেতে আবার ঠুকতে শুরু করল ফাঁপা আওয়াজ শোনার আশায়। এবার বেশিক্ষণ পরিশ্রম করতে হলো না। শুনতে পেল প্রত্যাশিত শব্দটা।

কুঠুরির কাঠের তক্তা ভেঙে খুলে ফেলেছে ওরা, এ সময় রূট সেলারে ঢুকতে শুরু করল বৃষ্টির পানি। পরিস্থিতি আরও খারাপ করে দেয়ার জন্যেই যেন ওপরের একটা গর্তে জমা পানিও উপচে গিয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল

সেলারে।

দেখতে দেখতে গোড়ালি ডুবে গেল ওদের। ক্রমেই বাড়ছে পানি।

'এখানে থাকলে তো দেখছি ডুবে মরব,' মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে রবিনের। 'জ্যোতিষীর কথাই শেষ পর্যন্ত ফলে যাবে মনে হচ্ছে!'

'সত্যি চলে যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দেখি আরেকটু.' গুপ্তধন পাওয়ার আশা কিশোরের মতই ছাড়তে পারল না রবিনও।

দেয়ালের আরেকটা তক্তা খুলে আনল মুসা। পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গ চোখে পড়ল। উচ্চতায় পাঁচ ফুটেরও কম। ওপরের দিকে উঠে গেছে সুড়ঙ্গটা। ফলে পানি ওটার নাগাল পাবে না।

'বুড়ো এটা তৈরি করে রেখে গেছে,' বলল কিশোর। 'জানত, বৃষ্টি হলে পানি ঢুকতে পারে। তাই এমন জায়গায় বানিয়েছে, যাতে পানি না জমে।'

মাথা নিচু করে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। দশ ফুট যাবার পরে বাম দিকে মোড় নিল। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল হামাগুড়ি দিয়ে।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল। এবং ঠিক ওই মুহূর্তে অযাচিত ভাবে সিম্বুর মুখোমুখি হলো ওরা। একটা লোহার সিন্দুকের ওপর চুপ করে বসে রয়েছে ছোট্ট মূর্তিটা। হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনজনেই।

সিন্দুকে কি বারগুলো আছে?–সবার মনেই খেলে গেল একই প্রশ্ন।

'বাক্সটা খুলব?' ফিসফিস করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর।

'কি-কি-কিন্তু, সিম্বুর অভিশাপ...' ভয়ে কথা শেষ করতে পারল না মুসা।

'বাক্সটা খুললে যদি...!' রবিনও ভয় পাচ্ছে।

সিম্বুর কদাকার ছোট্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে ভয় লাগছে ওদের। ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'সিম্বু, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। তোমার সোনা চুরি করার ইচ্ছেও আমাদের নেই। আমরা শুধু দেখতে চাই বাক্সের ভেতরে সোনাগুলো আছে কিনা।'

আস্তে করে মূর্তিটা এক পাশে সরিয়ে রাখল কিশোর। বাক্স খোলার চেষ্টা করল। খুব মজবুত তালা। ওদের কাছে এই তালা খোলার যন্ত্র নেই।

'এখন কি করা?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'সিম্বুকে নিয়ে যেতে পারি আমরা...'

কথা শেষ হলো না তার। বিকট শব্দে বাজ পড়ল আবার।

'রুট সেলারে পানি জমছে জানা কথা,' কিশোর বলল। 'বেশি দেরি করলে ভরে যাবে। বেরোনোর উপায় থাকবে না আমাদের। তারচেয়ে চলো এখন চলে যাই। কাল বৃষ্টির পানি নেমে গেলে আবার আসা যাবে। তালা খোলার যন্ত্র নিয়ে আসব কাল।'

'ঠিক বলেছ,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। স্বস্তি পেল সিম্বুর প্রহরায় রাখা সোনা দেখতে গিয়ে তাকে রাগিয়ে দিতে হলো না বলে।

প্যাসেজওয়ে ধরে পিছিয়ে এল ওরা। রুট সেলারে ঢুকল। পানিতে থই থই করছে সেলার।

'গর্ত থেকে পানি সরানোর ব্যবস্থা করতে না পারলে সকালের মধ্যে সেলার পুরো ডুবে যাবে,' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

শাবল দিয়ে খুঁচিয়ে সেলার থেকে পানি সরে যাওয়ার জন্যে একটা মুখ তৈরি করল ওরা। সেলারের ছাত যাতে ভেঙে ধসে পড়তে না পারে, সে-জন্যে তক্তা দিয়ে আটকে রাখার ব্যবস্থা করল।

'করলাম তো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'কিন্তু থাকবে কিনা জানি না। চলো, যাওয়া যাক।'

দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা।

মোটর সাইকেলে চড়ে হোটেলে ফিরল ওরা। কারও নজরে পড়ল না। দুঁপার সাদা মার্সিডিজটাও দেখতে পেল না কোথাও।

ঘণ্টাখানেক পরে রকি বীচ থেকে অপ্রত্যাশিত একটা ফোন এল। কিশোরের চাচী মেরিচাচীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন। অপারেশন লাগবে।

চাচাকে খবর পাঠাল কিশোর। তক্ষণি বাড়ি যেতে তৈরি হলো। আফসোস করে বলল, 'সিম্বুর সোনা দেখা আর হলো না আমাদের। যাকগে, কি আর করা! চাচী ভাল হয়ে গেলে আবার আসব। এখন আমি এয়ারপোর্টে ফোন করছি টিকেটের জন্যে।'

পরদিন সকালের ফ্লাইটের টিকেট পেল ওরা। এয়ারপোর্টে আসার পথে লক্ষ করল পিছু পিছু সাদা মার্সিডিজটাও আসছে।

'বাজি ধরে বলতে পারি, আমাদেরকে চলে যেতে দেখে খুবই অবাক হচ্ছে দুঁপা,' রবিন বলল।

*

মাসখানেক পরে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে বসে গল্প করছে কিশোর, মুসা রবিন ও ওদের বন্ধু বিড ওয়াকার।

সিম্বুর গল্প শুনে বিড জিজ্ঞেস করল, 'সোনার বারগুলো দেখতে গিয়েছিলে আর?'

'গিয়েছিলাম,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে যেতে দেরি করে ফেলেছিলাম।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল বিড। 'তুলে নিয়ে গেছে নাকি কেউ গুপ্তধনগুলো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বুড়োর বাড়ির পাশে যে রাস্তাটা বানানো হচ্ছিল, দেখে এসেছিলাম, পরের বার গিয়ে দেখি সেটা তৈরি হয়ে গেছে। বুড়োর বাড়ি ভেঙে ফেলেছে। টিলা সমান করে বাড়ির ওপর দিয়ে চলে গেছে ছয়-লেনের, কংক্রিটের ঝকঝকে রাস্তা।'

'তারমানে,' হতাশ হলো বিড, 'বুড়োর গুপ্তধন চিরকালের জন্যে চাপা পড়ে গেল মাটির নিচে?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'হ্যাঁ। সিম্বু তার মনিবের জিনিস বেশ ভালমতই পাহারা দিয়ে রেখেছে। মনে হয় কাউকে ছুঁতে দেয়নি। দুঁপাকেও না।'

—০—

ভূতের জাহাজ

মোটর বোট নিয়ে সাগরে বেড়াতে বেরিয়েছে তিন গোয়েন্দা। সময় পেলেই এ রকম বেরোয়। তবে আজ সাগরের মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না। মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে ফুঁসে উঠছে ঢেউ। বোটের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে উঠছে পানি।

কপালে হাত রেখে ঢেউ দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তীরে ফিরে যাওয়া দরকার।'

হাতের চেটো দিয়ে মুখ থেকে পানির ছিটা মুছল মুসা। হাল ধরে রেখে বলল, 'হ্যাঁ। সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। তবে তীর থেকে বেশি দূরে নই আমরা। বাড়ি ফিরে যাই চলো। আমি ইঞ্জিনের স্পীড বাড়াচ্ছি।'

রবিন কিছু বলল না। তাকিয়ে আছে ঢেউয়ের দিকে।

মোটর বোট নিয়ে বেড়াতে বেরোয় ওরা, ঝড়-টর দেখে না তা-ও না। তবে সে-সম্ভাবনা দেখলেই দ্রুত উপকূলে ফিরে আসে।

অ্যাকসিলারেটরে চাপ বাড়াল মুসা। গতি পেয়ে লাফ মেরে ছুটল মোটর বোট।

হঠাৎ খকখক করে কাশতে শুরু করল ইঞ্জিন। তারপর থেমে গেল। স্থির হয়ে পানিতে ভাসতে লাগল বোট।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। কাজ হলো না।

'নাহ্, হচ্ছে না,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'কোথাও কিছু গড়বড় হয়ে গেছে।'

ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে দেখতে শুরু করল সে। কাজ শেষ করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'কই, কোথাও তো কোন গলদ দেখতে পাচ্ছি না। ট্রান্সমিশন, তেল, গ্যাস—সবই ঠিক আছে।'

'ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'সাহায্য দরকার আমাদের। সাঁতার কেটে তো আর তীরে পৌঁছুতে পারব না,' কিশোর বলল।

শিপ-টু-শোর রেডিও ট্রান্সমিটারের সুইচ অন করল সে। কিছুই ঘটল না। কয়েকবার সুইচ অন-অফ করল। পরীক্ষা করে দেখল তার, ব্যাটারি।

'রেডিওতেও কোন সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'কিন্তু এটাও অকেজো হয়ে পড়েছে! অদ্ভুত ব্যাপার তো! এ কেমন ঝামেলায় পড়লাম।'

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সেই সাথে বাড়ছে বাতাস। বেড়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের তীব্রতাও। ঢেউয়ের আঘাতে অসহায়ের মত পানিতে দোল খাচ্ছে বোট। আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। কালো মেঘ ঢেকে রেখেছে নক্ষত্রপুঞ্জ। ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগল ওদের। শীত করছে।

'অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে সারা রাত এখানেই কাটাতে হবে,' অস্পষ্ট স্বরে বলল রবিন। 'ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট উল্টে না গেলেই বাঁচি।'

'কেউ যে আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সে-চান্সও নেই,' মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের। 'এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। জাহাজ-টাহাজ এলেও আমাদের দেখতে পাবে না।'

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কালো, প্রকাণ্ড কি একটা ওদের সামনে ছুটে আসতে লাগল। কর্কশ একটা কণ্ঠ ভেসে এল সাগর থেকে; 'কে তোমরা?'

'জাহাজ!' উল্লসিত হয়ে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে।' মুখের সামনে দুই হাত জড় করে এনে চিৎকার করে জবাব দিল, 'আমরা সাগরে আটকা পড়েছি। আমাদেরকে আপনাদের জাহাজে তুলে নেবেন?'

'দাঁড়াও। আসছি,' জবাব এল।

কালো পাহাড়ের মত জিনিসটা এগিয়ে এল ওদের দিকে, থেমে পড়ল বোটের পাশে।

জাহাজটা বিশাল। বাতাসে দুলতে থাকা লণ্ঠনের আলোয় গলুই চোখে পড়ছে। তার নিচে সাদা অক্ষরে লেখাঃ অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ।

'অদ্ভুত নাম!' বিড়বিড় করল রবিন।

বোট লক্ষ্য করে জাহাজ থেকে একটা দড়ির মই ছুঁড়ে দেয়া হলো।

মইটা দু'হাতে ধরে ফেলল কিশোর। দ্রুত উঠে এল ওপরে।

বোটের সাথে মই বেঁধে ফেলল মুসা। রবিনকে উঠে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর নিজেও অনুসরণ করল তাকে।

লাফ মেরে জাহাজের রেলিং টপকাল তিনজনে। দাঁড়াল এসে প্রকাণ্ড ওক কাঠের ডেকে। পুরানো আমলের লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেখল এটা একটা পাল তোলা জাহাজ। বাতাসে পতপত করে উড়ছে পাল। মূল মাস্তুল খাড়া উঠে গেছে অন্ধকার আকাশে। একটা কাঠের সিঁড়ির মাথা গিয়ে ঠেকেছে হুইল হাউজে।

ডেকে বেশ কয়েকজন রুক্ষ চেহারার নাবিক। সবার পরনে পুরানো আমলের পোশাক। দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। ভ্রূ কুঁচকে দেখছে ওদেরকে। একজনের হাতে একটা হার্পুন। অস্ত্রটা ভীতিকর ভঙ্গিতে দোলাল সে।

'ট্রেনিং শিপ,' নিচু গলায় দুই সহকারীকে বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছে।'

'এমন ভূতুড়ে ট্রেনিং শিপ জীবনে দেখিনি আমি,' ফিসফিস করল মুসা।

নোনা পড়া জ্যাকেট গায়ে এক লোক এগিয়ে এল ওদের সামনে। লোকটা লম্বা, মুখভর্তি কালো দাড়ি। তীক্ষ্ণ, কালো চোখ। কথা বলার সময় গলার স্বর শুনে গোয়েন্দারা বুঝল, খানিক আগে এই লোকই ওদের পরিচয় জানতে চেয়েছিল।

'নাম কি তোমাদের?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'তোমরা যে-ই হও তাতে আমার কিছু এসে যায় না।'

সাহস করে জানতে চাইল রবিন, 'আপনি কে?'

'আমি এডওয়ার্ড নাইল। অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চের ক্যাপ্টেন। তিমি শিকারী জাহাজ এটা। আমরা এসেছি নানটুকেট থেকে। ওখানেই ফিরে যাচ্ছি আবার।

শক্ত সমর্থ কয়েকজন লোক দরকার আমাদের। তোমাদেরকে দিয়ে কাজ হবে মনে হচ্ছে। নানটুকেট না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা আমার ক্রু হিসেবে কাজ করবে।'

অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। এ লোক বলছে কি? উনবিংশ শতাব্দীর পরে আর কোন পাল তোলা তিমি শিকারীর জাহাজ তৈরি করা হয়নি। লোকটা ঠাট্টা করছে ভেবে কিশোর বলল, 'ক্যাপ্টেন নাইল, আপনার জাহাজে থাকতে আসিনি আমরা। আমাদের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। মেরামতের জন্যে লোক দরকার। দয়া করে যদি বোটটা সহ আমাদের তীরে পৌঁছে দেন, কৃতজ্ঞ থাকব।'

'ইঞ্জিন? ইঞ্জিন আবার কি জিনিস?' খেঁকিয়ে উঠল নাইল।

লোকটা কি রসিকতা করছে নাকি! কিশোর বলল, 'জাহাজ চালাতে আপনার শক্তির দরকার হয় না?'

'গাধা নাকি! হয় না মানে? শক্তি ছাড়া জাহাজ চলে? সে-জন্যেই তো বাতাস দরকার, আর বাতাসের শক্তিকে ব্যবহার করার জন্যে পাল!' গমগমে গলায় বলল ক্যাপ্টেন। 'এ ছাড়া সাগরে জাহাজ চালাতে আর কোনও শক্তি জোগাড় করতে পারবে তুমি? আরেকটা কাজ অবশ্য করা যায়–সাগরে লগি ঠেলে জাহাজ চালাতে পারো।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল নাবিকরা। নাইলও হাসছে। যেন খুব মজার একটা রসিকতা করে ফেলেছে।

'লোকগুলো ভারী অদ্ভুত!' রাগ লাগল কিশোরের। 'চলো। এই পাগলদের সঙ্গে থাকার চেয়ে নিজেদের বোটে নেমে যাই। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে ভেসে থাকব, সে-ও ভাল।'

রেলিং-এর ধারে ছুটে এল ওরা। যেখান দিয়ে মই বেয়ে উঠেছে। উঁকি দিল।

সাথে সাথে জমে গেল যেন।

বোটটা নেই!

'ধরো ওদেরকে!' নাইল হুকুম দিল তার ক্রুদেরকে। 'ধরো! ধরো!'

নাবিকরা ছুটে এসে ধরে ফেলল তিন গোয়েন্দাকে। জোর করে নিয়ে এল মাঝ ডেকে। ক্যাপ্টেন নাইল গনগনে মুখ নিয়ে দাঁড়াল ওদের সামনে।

'তোমাদের মতলব ভালই বুঝতে পারছি আমি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'তোমরা অন্য তিমি শিকারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইছ। কিন্তু সে-সুযোগ আর পাবে না। পাঞ্চেই থাকতে হবে তোমাদেরকে। আমরা কেপ হর্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাচ্ছি। তোমাদেরকে তিমি শিকারী বানিয়েই ছাড়ব। আমাদের কথা না শুনলে স্রেফ হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

অবাক লাগছে কিশোরের। না বলে পারল না, 'প্রশান্ত মহাসাগরেই তো রয়েছি আমরা। আবার যাব কি ওখানে?'

'আমাকে জাহাজ চালানো শেখাবে, না?' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'চল্লিশ বছর ধরে সাগরে সাগরে ঘুরছি, আমাকে সাগর চেনাবে? আর একটা কথা বলেছ কি ভাল হবে না বলে দিলাম।'

নাইলের হুমকি তিন গোয়েন্দার মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা শিহরণ জাগাল। কিশোরের

মনে হলো একদল পাগলের কবলে পড়েছে। মুসা আর রবিনের মনে হচ্ছে জ্যান্ত দুঃস্বপ্ন দেখছে।

হুইল হাউজের দিকে ঘুরল নাইল। চেঁচিয়ে আদেশ দিল, 'ডেভিড পুকার। এখানে এসো।'

বিশালদেহী, মোটাসোটা এক নাবিক হাজির হলো হুইল হাউজের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ডেকে। নাইল তাকে হুকুম করল তিন গোয়েন্দাকে নিচে নিয়ে যেতে। ডিউটির জন্যে প্রস্তুত করতে হবে।

পুকার নিয়ে চলল ওদের। পেছন থেকে ভেসে এল ক্যাপ্টেন এবং তার আজব নাবিকদের ভৌতিক হাসি।

'আমি ফার্স্ট মেট,' সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় নিজের পরিচয় দিল পুকার। 'ডিউটি যখন থাকবে না, তখন তোমরা কোথায় থাকবে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'এ সব কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল।

'কি ঘটছে ঠিকই জানো তোমরা,' কড়া গলায় বলল ফার্স্ট মেট।

'না, জানি না!' প্রতিবাদ করল কিশোর।

সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে ঘুরে দাঁড়াল পুকার। ধমকে উঠল, 'তাহলে আগে জেনে নাও কি কি করতে হবে তোমাদের। সব সময় নির্দেশ মেনে চলবে। নির্দেশ অমান্যকারী নাবিককে সাগরে, হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়।'

ক্যাপ্টেন নাইলের হুমকির কথা মনে পড়তে কেঁপে উঠল রবিন।

ওদের নিয়ে ক্রুদের লিভিং কোয়ার্টার্সে চলে এল পুকার। বেশ বড় ঘর। দেয়ালের সাথে লাগানো কতগুলো বাঙ্ক। প্রতিটি বাঙ্কের নিচে ঝুলছে একটা করে হারপুন। হারপুনের পাশে বর্ষাতি আর সাউথ ওয়েস্টার। ঝড় বাদলার দিনে চামড়ার জ্যাকেটের ওপর বর্ষাতি চাপাতে হয়। মাথা ঢাকতে হয় সাউথ ওয়েস্টার দিয়ে।

*

'ওই খালি বাঙ্ক তিনটে তোমাদের,' হাত তুলে দেখাল ফার্স্ট মেট। 'ডেকে কাজ করার জন্যে রেডি হয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

হুকুম দিয়ে চলে গেল সে।

চলতে শুরু করেছে জাহাজ, টের পেল ওরা। ক্যাঁচকোঁচ করছে কড়িকাঠ, দুলছে এদিক-ওদিক। মাথার ওপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে মিটমিট করে। চর্বি আর তেলের গন্ধ আসছে ওটা থেকে।

'তিমির তেল,' মন্তব্য করল রবিন।

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে সব ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের। তাই গন্ধ পেয়েই বুঝতে পেরেছে লণ্ঠন জ্বলছে তিমির তেলে।

'যদ্দূর জানি,' বলল কিশোর, 'কেরোসিনের ব্যবহার শুরু হবার পর থেকে তিমির তেলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাহলে ওটা এল কোত্থেকে? আসলে ঘটছে কি এখানে?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল মুসা। 'তবে মন বলছে সাবধানে থাকা

দরকার। ভূত-প্রেত...'

'আরে ধুত্তেরি তোমার ভূত-প্রেত!' খেঁকিয়ে উঠে তাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'সারাক্ষণ খালি ভূতের ভয়...'

বাঙ্কে এসে শুয়ে পড়ছে নাবিকরা। তাদের দিকে হাসি মুখে তাকাল রবিন। কিন্তু ওর দিকে ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল তারা।

'আমরা এখানে নতুন,' ভাব জমানোর চেষ্টা করল জো। কিন্তু পাথর-মুখ করেই থাকল জাহাজীরা।

'নাবিকরা শুনেছি হাসিখুশি থাকে,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'কিন্তু এরা তো কবরের লাশ একেকটা।'

'বললেই তো খেপো,' গম্ভীর কণ্ঠে মুসা বলল। 'কিন্তু না বলেও পারছি না। লোকগুলোর মতই জাহাজটাকেও ভূতুড়ে মনে হচ্ছে আমার।'

'এ জাহাজে বেশিদিন থাকতে হলে আর ভূতের প্রয়োজন পড়বে না,' বলার সময় গলার স্বর কেঁপে উঠল রবিনের। 'নিজেরাও ভূত হয়ে যাব।'

সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে তুড়ি বাজাল মুসা, 'এতক্ষণ ধরে ঠিক এই কথাটাই বোঝাতে চাইছি আমি।'

ওদের কাছে বসা ষণ্ডামার্কা চেহারার এক নাবিক তার হারপুনের ধারাল, লম্বা ফলায় তেল মাখছে। সেই সাথে পালিশ করছে কাঠের ডাণ্ডাটা। একটা উঁকো হাতে নিল সে। ঘষে ঘষে ডগাটা তীক্ষ্ণ ও ধারাল করে তুলল। উঁকোটা লম্বা, মাছ ধরার বড়শির মত বাঁকানো।

লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। উঁকো দেখতে দেখতে বলল, 'বিপজ্জনক অস্ত্র মনে হচ্ছে।'

'বিপজ্জনক তো বটেই। তবে তিমির জন্যে,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। 'কিছু বোকা ছাগলের জন্যেও, বাজি ধরে বলতে পারি, নইলে নাম বদলে রাখব আমার।'

'কি নাম আপনার?' খাতির জমানো ভঙ্গিতে নিরীহ স্বরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হোগার্ট ল্যাম্বার্ট,' খসখসে কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। 'কি, নাম শুনে কোন সুবিধে হলো, বোকা ছাগল?'

ল্যাম্বার্টের ভাবভঙ্গি মোটেও সুবিধের লাগল না কিশোরের কাছে। আর কিছু বলল না তাকে। ওদের চেয়ে দু'এক বছরের বড় এক কিশোরের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল। একে গুণ্ডার মত লাগছে না। 'তোমার নামটা কি, ভাই?'

'বাফার। আমি নিউ বেডফোর্ড থেকে এসেছি। আমার বাপ-দাদারা বহু কালের পুরানো তিমি শিকারী।'

এক প্রশ্ন করে তিনটের জবাব পেয়ে গিয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এডওয়ার্ড পাঞ্চের ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

বিস্মিত দেখাল বাফারকে। 'কেন, এটা নানটুকেটের একটা তিমি শিকারী জাহাজ।'

'যাচ্ছে কোথায়?'

'কেপ হর্ন। কিন্তু আমাকে এ সব প্রশ্ন করছ কেন? জাহাজ কোথায় যাচ্ছে যদি না-ই জানো তাহলে উঠলে কেন?'

কিশোর কিছু বলার আগেই রবিন বলে উঠল, 'আমি তো জানতাম, কেপ হর্নে তিমি শিকার করা হত উনবিংশ শতব্দীতে।'

আরও অবাক হলো বাফার। 'তা তো বটেই। আর এটা তো উনবিংশ শতাব্দীই। ১৮৫০ সাল।'

বাফারের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ওদের কথা শুনছিল ল্যাম্বার্ট। মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'কোন্ সাল তা-ও জানে না! এমন বোকা তো জীবনে দেখিনি।'

বাফার ছাড়া বাকি সবাই তিন গোয়েন্দার বোকামিতে হেসে উঠল। খনখনে, ভৌতিক হাসি। গা শিরশির করে উঠল গোয়েন্দাদের।

কিন্তু রেগে গেল মুসা। নাবিকদের দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ল, 'আমরা জানি এটা কোন্ সাল! আর এখান থেকে যে এখুনি চলে যাওয়া উচিত তা-ও জানি। আপনারা থাকুন আপনাদের অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ আর তিমি নিয়ে। আমরা গেলাম…'

কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা ঝটকা দিয়ে হারপূনটা তুলে নিল ল্যাম্বার্ট। ছুঁড়ে মারল ওকে লক্ষ্য করে।

সাঁৎ করে সরে গেল মুসা। অল্পের জন্যে মিস হলো ধারাল অস্ত্রটা। ঘ্যাচ করে বিঁধল গিয়ে জাহাজের গায়ে। তিরতির করে কাঁপতে থাকল ওটার দণ্ডটা।

'বাপরে! আরেকটু হলেই তো গেছিলে!' ঢোক গিলল রবিন।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'বিপদ এখনও কাটেনি।'

দলবল নিয়ে ছুটে এল ল্যাম্বার্ট। আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা। হাত বাড়িয়ে দিল কারাতে মারের ভঙ্গিতে।

খেঁক খেঁক করে হেসে উঠল জাহাজীরা। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডেক থেকে ভেসে এল চিৎকার। 'তিমি! তিমি! ওই যে, বাঁ দিকে!'

দোরগোড়ায় হাজির হলো পুকার। 'এই জলদি এসো তোমরা!…কিশোর, মুসা, রবিন–তোমরাও তোমাদের হারপূন নিয়ে ডেকে চলে এসো।'

আপাতত ল্যাম্বার্টের দলের হাত থেকে বেঁচে গেল তিন গোয়েন্দা। অকারণে মারমুখী হয়ে ওঠা নাবিকরা ছেড়ে দিল ওদেরকে। কিশোর, মুসা ও রবিন যার যার বাঙ্কের মাঝখান দিয়ে হেঁটে দরজার দিকে এগোল। তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

এখনও চারদিকে অন্ধকার। তবে সাগর আগের চেয়ে শান্ত। মৃদু ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে চলেছে জাহাজ।

ক্যাপ্টেন কুপারের আদেশে দশ-বারো জন নাবিক একটা তিমি শিকারের নৌকা পানিতে ভাসানোর তোড়জোড় করছে। কপিকলের সাহায্যে শিকলে বাঁধা নৌকা নামানো হলো জাহাজের এক পাশে। খানিক নেমে শূন্যে ঝুলে রইল নৌকাটা।

দেখতে দেখতে বলে উঠল কিশোর, 'এখানে তিমি এল কোত্থেকে?'

'কেপ হর্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়েছি,' কড়া গলায় বলল ক্যাপ্টেন। 'এখানেই তো তিমির আড্ডা।'

অবাক হয়ে রবিন বলল, 'এক রাতের মধ্যে কেপ হর্ন পৌঁছা কি সম্ভব? অ্যাটমিক জেট প্লেনের পক্ষেও এত দ্রুত চলা সম্ভব না।'

'জেট প্লেন! জিনিসটা কি?' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠে সন্দেহের সুর। 'আর অ্যাটমিক কথাটারই বা মানে কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রবিন। 'আরও একশো বছর পার না করে দিলে এ প্রশ্নের জবাব জানতে পারবেন না।'

'মানে! কি বলছ তুমি?'

'বলছি বিংশ শতাব্দীর কথা। জেট প্লেন জিনিসটা বিংশ শতাব্দীর আকাশ যান।'

'ছোঁড়াটার মাথাটাই গেছে,' বিড়বিড় করল নাইল। 'ওর কথার মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কনুই দিয়ে রবিনকে গুঁতো লাগাল কিশোর। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বেশি কথা বলে আর ঝামেলা বাড়িয়ো না তো।'

তিমি শিকারের নৌকা পানিতে ভেসে পড়তে প্রস্তুত। নাবিকরা উঠে পড়ল নৌকায়। বৈঠা ধরে বসল। পুকার চলে এল নৌকার মাঝখানে।

'কিশোর পাশা, হারপূন ছোঁড়ার দায়িত্ব তোমার। তুমি গলুইয়ে গিয়ে বসো,' আদেশ দিল ফার্স্ট মেট। 'মুসা আমান, তুমি ধরবে হাল। রবিন, তুমি পেছন দিকের একটা বৈঠার ধারে বসো।'

নৌকায় চড়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ার পর কপিকলের লোকজন চাকা ঘুরিয়ে নৌকাটা পানিতে নামিয়ে দিল। দাঁড়িরা বৈঠা বাইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চ থেকে। ডেভিড পুকারের নির্দেশমত হাতল ঘুরিয়ে কোর্স ঠিক রাখছে। উদ্যত হারপূন হাতে গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।

'ওই যে তিমির ফোয়ারা! তিমির ফোয়ারা!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল পুকার। 'মুসা, বাঁ দিকে ঘুরাও।'

তাড়াতাড়ি বাঁয়ে কাটল মুসা। 'কই, আমি তো কিছু দেখছি না।'

'কানা নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল পুকার, 'তোমার কিছু দেখার দরকার নেই। যা বলছি করো। নইলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব সাগরে।'

অন্ধকার পানিতে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ছুটে চলল নৌকা। মাথার ওপরে কালো মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা তারা। বৈঠা পানিতে পড়ছে আর উঠছে ছন্দময় গতিতে।

'এই যে এসে পড়েছি,' ঘোষণা করল পুকার। 'কিশোর পাশা, হারপূন ছোঁড়ো।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল কিশোর। 'কই, তিমি কই? কিসের গায়ে ছুঁড়ব?'

'ওই যে তিমি। ছুঁড়লেই বুঝবে কিসের গায়ে পড়েছে,' খেঁক-খেঁক করে উঠল ফার্স্ট মেট।

হারপুন ছুঁড়ল কিশোর। তারপর রশি ধরে টেনে তুলল অস্ত্রটা। কোন কিছুর গায়ে হারপুন বেঁধেনি দেখে মন মনে খুশি হলো ও।

রাগে কাঁপতে লাগল পুকার। 'তিমিটাকে মিস করেছ তুমি! ইচ্ছে করে ওটাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছ।'

কিশোরের কথা সমর্থন করে রবিন বলল, 'আমারও কিন্তু কোন তিমি চোখে পড়েনি।'

'নিশ্চয় তারমানে ভুল দিকে নৌকা ঘুরিয়েছ!' চিৎকার করে উঠল পুকার। 'দাঁড়াও, জাহাজে ফিরে নিই। তারপর বোঝাব মজা। ক্যাপ্টেনের কাছে নালিশ করে তিনজনের পিঠের চামড়া না ছাড়িয়েছি তো আর কি বলব...নাও, ঘোরো এখন। পুরো এক পাক ঘোরো। আবার দেখা যেতে পারে তিমিটাকে। এবার যদি মিস করো কিশোর পাশা, তাহলে...' দাঁতে দাঁত চাপল ফার্স্ট মেট।

হাল ঘুরিয়ে আবার নৌকার মুখ ঘোরাল মুসা। ছপাৎ-ছপাৎ দাঁড় ফেলছে দাঁড়িরা। গলুইয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাগরে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। নৌকাটা চক্কর মেরে মেরে ঘুরতেই থাকল।

তিমির চিহ্নও দেখা গেল না আর। হাল ছেড়ে দিল পুকার। জাহাজে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিল।

জাহাজের কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল নৌকা। ওপর থেকে দড়িতে বাঁধা হুক নামিয়ে দেয়া হলো। সেগুলোতে আটকে আবার জাহাজে তুলে নেয়া হলো নৌকা। আগের জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হলো।

'তিমিটাকে মারতে পারিনি ক্যাপ্টেন,' ক্ষোভের সঙ্গে রিপোর্ট করল পুকার। 'এ জন্যে ওই ছোকরা তিনটে দায়ী।'

এ কথা শুনে রেগে আগুন হলো নাইল। হুকুম দিল, 'জেলে ভরে তালা দিয়ে রাখোগে!'

তিন গোয়েন্দাকে ঠেলা-ধাক্কা মেরে নিচে নিয়ে আসা হলো। একটা শিক লাগানো ছোট ঘরে ঢোকানো হলো। এটাই জাহাজের জেলখানা। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ওদেরকে একা রেখে চলে গেল জাহাজীরা। তিমির তেল ভরা একটা লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে গারদে। গোটা দু'য়েক কাঠের বাঙ্ক আর মাঝখানে একটা ছোট টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাব নেই ঘরটাতে। বাঙ্কে বসল ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল।

'ঘটনা দেখছি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে,' মন্তব্য করল মুসা। 'একটা ভূতুড়ে জাহাজের কতগুলো নাবিক-ভূতের হাতে আমরা এখন বন্দী।'

'আর এজন্যে দায়ী একটা ভূতুড়ে তিমি,' খিটখিটে গলায় যোগ করল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে কিশোর বলল, 'অথচ পুকার বলছে সে তিমিটাকে দেখেছে।'

'আমাদেরকে ফাঁসানোর জন্যে বলেছে, এ তো সোজা কথা। আর নাইল যে ওর কথাই বিশ্বাস করবে সেটাও স্বাভাবিক। তবে আমার কি মনে হয় জানো—পুকার নিজেই একটা ভূত।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে বলো তো?'

জবাবে নিচের ঠোঁটে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। 'বুঝতে পারছি না।'

চুপ হয়ে গেল তিনজনেই। নাইলের হুমকির কথা ভাবছে ওরা।

'নাইল আমাদেরকে হাঙর দিয়ে খাওয়াবে বলেছে,' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'হাঙুরে-ভূত বলে আবার কিছু নেই তো? আর ওগুলো নিশ্চয় মানুষখেকো নয়?'

'হাঙরের মানুষখেকো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল কিশোর। 'সেটা আসল হাঙরই হোক, কিংবা ভূতুড়ে...'

হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লাফিয়ে সিধে হয়ে বসল ওরা।

পায়ের আওয়াজ ক্রমে কাছিয়ে আসছে। একটু পরেই লোকটাকে দেখা গেল। ল্যাম্বার্ট। ডান হাতে একটা হারপূন। ঘরের মাঝখানে চলে এল তিন গোয়েন্দা। লোকটা কোন্ মতলবে এসেছে দেখতে চায়।

'তোমাদের দোষেই আজ তিমিটাকে হারাতে হলো,' নাক সিটকাল ল্যাম্বার্ট। 'কিভাবে নৌকা বাইতে হয়, কিভাবে হারপূন দিয়ে মাছ শিকার করতে হয়, কিচ্ছু জানো না তোমরা। আমি থাকলেই হয়েছিল আজ। তিমির বাপও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি কোনদিন।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'আপনার বদলে হারপূনার হিসেবে আমাকে পাঠানোটা আসলে সহ্য হচ্ছে না আপনার।'

শুনে মুখ লাল হয়ে গেল ল্যাম্বার্টের। হারপূন ছুঁড়ে মারল দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে।

ব্যাপারটা আগেই আঁচ করতে পেরেছিল মুসা। চট করে টেবিলটা দু'হাতে তুলে ধরল, ঢালের মত করে। টেবিলে লাগল হারপূন। এত জোরে আঘাত হানল, কাঠ ফুটো করে ফেলল ধারাল ফলা। কয়েক ইঞ্চির জন্যে মুসার গায়ে বিঁধল না।

টেবিলটা নামিয়ে রাখল সে। হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। একটানে টেবিল থেকে খুলে আনল হারপূন।

'ল্যাম্বার্ট, এ নিয়ে দ্বিতীয়বার হলো। আর ছাড়ব না তোমাকে,' বলেই হারপূন তুলল ল্যাম্বার্টকে সই করে।

বেগতিক দেখল ল্যাম্বার্ট। ধীরে ধীরে পিছু হঠল সে। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালাল।

গারদের এক কোনায় হারপূনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মুসা। হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি সত্যি মারতাম না। ভয় দেখালাম শুধু। তবে জিনিসটা আর হাতে নিতে দিচ্ছি না ওকে। তিমি শিকারে যাবার সময় ফার্স্ট মেটকে হারপূন হারানোর কি ব্যাখ্যা দেবে তাই ভাবছি।'

এমন সময় আবার কার পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে।

'আবার বোধহয় এসেছে ল্যাম্বার্ট,' নিচুস্বরে বলল রবিন। 'মারামারি করতে। কিংবা হারপূনটা ফেরত নিতে।'

'বেশ। এবার আমরাও প্রস্তুত,' হারপূন তুলে নিল কিশোর। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরল অস্ত্রটা।

তবে আগন্তুক ল্যাম্বার্ট নয়, বাফার।

ওকে দেখে হারপূন নামাল কিশোর।

জেলখানার দিকে আসার সময় বারবার পেছন ফিরে দেখছে বাফার। 'আমার এখানে আসা উচিত হয়নি,' ফিসফিস করল বাফার। 'আমার ডিউটি এখন ওপরে। তোমাদের একটা জরুরী কথা জানাতে এসেছি?'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'ক্যাপ্টেন তোমাদেরকে এখনই হাঙরের মুখে ফেলে দিত। জেলে পুরে রাখার কারণ তোমাদেরকে তার দরকার হতে পারে। তবে নানটুকেটে ফেরার আগে হাঙরের মুখে ফেলবেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তারমানে তার আগেই আমাদেরকে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে,' কিশোর বলল। 'তুমি আমাদের সাহায্য করবে?'

'দরকার হলে লড়াই করব,' বুকে চাপড় দিয়ে বলল মুসা। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব...'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল বাফার। 'আমি সাধারণ একজন ডেকহ্যান্ড। তোমাদেরকে রা করার ক্ষমতা আমার নেই। আর মুক্তি পেলেও লাভ হবে না। কারণ এখন আমরা মাঝ সমুদ্রে। কি করবে তোমরা? হাজার মাইল পথ সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠবে?'

'তিমি শিকারের নৌকা নিয়ে পালাতে পারি,' উত্তেজিত গলায় বলল রবিন।

আবার মাথা নাড়ল বাফার। 'হুইল হাউজ আর ডেকে সব সময়ই কেউ না কেউ নজর রেখে চলেছে। ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া নৌকা পানিতে নামানোও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। শব্দ না করে পারবে না। যাকগে, তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করো,' কিশোর বলল। 'শত হলেও তুমি ঝুঁকি নিয়ে নিচে এসেছ। সাবধান করে দিয়েছ আমাদের।'

'তোমরা এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলছ কেন?' জানতে চাইল বাফার। 'এটা ১৮৫০ সাল। অথচ তোমরা বিংশ শতাব্দীর কথা বলছ। পালের বদলে অন্য শক্তির কথা বলছ। ঘটনাটা কি?'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা। এ সব কি বলছে ছেলেটা?

'ওকে যে আমরা ভূত ঠাউরে বসে আছি তা বলা যাবে না,' ফিসফিস করে কিশোরের কানে কানে বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সত্যি কথা বলব?' বাফারকে বলল সে, 'এটা আসলে কোন্ সাল সেটাই শিওর হতে পারছি না আমরা।'

দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেন্ডার দেখাল বাফার। বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখা: ১৮৫০ সাল।

'এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে,' বিড়বিড় করল মুসা, 'এই জাহাজটাতেই কেবল সময় বদলে গেছে। পিছিয়ে গেছে। এখানে থাকলে এই সালটাকেই মেনে নিতে হবে আমাদের।'

ভুরু কুঁচকে গেল বাফারের। 'তোমরা পাগলা গারদ-টারদ থেকে পালিয়ে আসোনি তো?' উদ্বিগ্ন শোনাল তার কণ্ঠ।

'না, পাগলা গারদ থেকে পালাইনি,' তাকে আশ্বস্ত করল কিশোর। 'তবে এই জাহাজ থেকে পালাতে চাই।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বাফার। 'পরে যদি সম্ভব হয় সাহায্য করব তোমাদের। এখন ডিউটিতে যেতে হবে,' কথা শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মাথার নিচে হাত রেখে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল কিশোর। আরেকটা বাঙ্কে গিয়ে বসল রবিন। টেবিলের ওপর উঠে বসল মুসা। পা ঝোলাতে লাগল। ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আলোচনা করতে লাগল ওরা। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল।

'সমস্যাটা হলো,' মন্তব্য করল কিশোর, 'ভূত না আসল মানুষ সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে একদল পাগলের সঙ্গে চলেছি আমরা। কিন্তু ওদের কাজ-কর্ম দেখে তো পাগল বলেও মনে হচ্ছে না।'

'ভূত! ভূত! কোন সন্দেহই নেই আমার,' মুসা বলল। 'তুমি তো আর বিশ্বাস করবে না।'

'নাকি কোনও ধরনের টাইম মেশিনের মধ্যে পড়ে গেলাম আমরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যময় কোন কিছুতে? এক টানে সময়কে পার করে নিয়ে এসেছে ১৮৫০ সালে!'

মাথা চুলকাল মুসা। 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আবার নিজেদের সময়ে ফিরে যাব কি করে?'

'চালাকি করতে হবে আরকি আমাদের,' রবিন বলল। 'ক্যাপ্টেন নাইল আমাদেরকে এখান থেকে বের করলে এমন ভান করব যেন আমরা খুব ভাল নাবিক। জাহাজের নানা কাজে লাগছি দেখলে হয়তো তার মন বদলাতেও পারে। তখন নিশ্চয় আর আমাদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলার চিন্তা করবে না।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' হাতঘড়িতে নজর বোলাল কিশোর। 'আমরা জাহাজে উঠেছি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে এত কিছু ঘটল কি করে?'

জবাবে মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গা-টা কেন যেন শিরশির করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নাবিকের পোশাক পরা এক লোককে ওদের জেলখানার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। মুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে একই দিকে তাকাল কিশোরও।

লোকটা নীরবে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ভূতুড়ে একটা আকৃতি। মুখটা অস্বাভাবিক সাদা। সরু, সাদা সাদা লম্বা আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে জেলের গরাদ। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। নীল চোখ জোড়া স্থির।

'লোকটা এখানে এল কি করে?' জড়ানো গলায় বলল মুসা। 'সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ পাইনি।'

উঠে বসল কিশোর। 'আমিও না।'

রবিন বলল, 'লোকটাকে এ জাহাজের কেউ মনে হচ্ছে না।'

তার পেছন পেছন যাওয়ার জন্যে হঠাৎ ইশারা করল ওদেরকে রহস্যময় আগন্তুক।

'কে আপনি?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'আপনার সঙ্গে আমাদের যেতে বলছেন

কেন?'

'বেরোতে যে বলছেন, বেরোব কি করে?' ইঙ্গিতে বন্ধ দরজাটা দেখাল মুসা। 'ফার্স্ট মেট দরজায় তালা মেরে রেখে গেছে। চাবি আছে নাকি আপনার কাছে?'

ওদেরকে তাজ্জব করে দিয়ে তালায় হাত রাখল লোকটা। খুলে গেল তালা। টান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে। কোঁচকানো চামড়াওয়ালা আঙুল দিয়ে আবার বেরোনোর ইশারা করল লোকটা।

'খাইছে! চাবি ছাড়াই তালা খুলে ফেলল!' মুখ হাঁ হয়ে গেছে মুসার।

'দেখাই যাক না ওর সঙ্গে গিয়ে,' কিশোর বলল। 'মুক্তির পথ দেখিয়েও দিতে পারে। কিংবা নতুন কোনও বিপদের পথ। অতএব সাবধান।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল তার দুই সহকারী।

জেল থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে।

নিঃশব্দে আবার দরজা লাগিয়ে দিল ওদের ভৌতিক পথ প্রদর্শক। তালাটা তুলে লাগিয়ে দিল জায়গামত। তারপর হেঁটে গেল সিঁড়ির ধারে। উঠতে শুরু করল। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কোন শব্দ হলো না।

অস্বাভাবিক নীরবতায় গা ছমছম করতে লাগল তিন গোয়েন্দার। মুসার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তলপেট শিরশির করছে রবিনের। কিশোরের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফের পানি নামছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপ টপকে লোকটা উঠে গেল ডেকে। এগিয়ে গেল জাহাজের সামনের দিকে।

তিন গোয়েন্দাও উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়ির দোরগোড়ায়। উঁকি মেরে দেখল কাছে-পিঠে কেউ আছে কিনা। অন্ধকারে শুধু টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। খালি ডেক।

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রহস্যময় আগন্তুক। আবার ইশারা করল তিন গোয়েন্দাকে। অনুগতের মত লোকটার পেছন পেছন ডেক ধরে এগোল ওরা। বড় বড় ঢেউ ধাক্কা মারছে জাহাজের গায়ে। জাহাজের কিনার ঢেউয়ের দোলায় উঠছে আর নামছে। নিচে তাকাল ওরা। ঢেউগুলো মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে যেন টগবগ করে ফুটছে। দূরের তারাশূন্য অন্ধকার আকাশ থেকে ভেসে এল নাম না জানা নিশাচর পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার।

থেমে দাঁড়াল ভূতুড়ে লোকটা। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। পলকহীন চাহনি।

এরপর কি করবে লোকটা? ভাবল কিশোর। ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না তো!

আঙুল তুলে জাহাজের পেছন দিকটা দেখাল আগন্তুক। ওদিকটা অন্ধকার। চোখ কুঁচকে ওদিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। অস্পষ্ট ভাবে আরেকটা জাহাজ দেখা গেল। ওদের জাহাজটার পেছন পেছন আসছে।

রহস্যময় আগন্তুক সাগরের দিকে ইশারা করল। তারপর জাহাজটা দেখাল।

লোকটা কি বলতে চাইছে বুঝে ফেলল মুসা। 'ও বলছে আমরা যেন সাঁতার কেটে ওই জাহাজে উঠে পড়ি। জাহাজটা কাছেই আছে। চলো, সাগরে নেমে

পড়ি।' রেলিং বেয়ে উঠে পড়ল সে, ডাইভ দেবে পানিতে।

ওর হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'দাঁড়াও। দাঁড়াও। লোকটা সত্যি এটাই বোঝাতে চেয়েছে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিই আগে।'

লোকটার দিকে ঘুরল ওরা। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে আগন্তুক! বোকা বনে গেল ওরা। আবার ঘুরে তাকাল পেছন দিকে। অন্য জাহাজটাকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

ভীষণ অবাক হয়ে গেল ওরা।

দেখার জন্যে রেলিঙে উঠেছিল মুসা, নেমে এল সেখান থেকে।

'সত্যি কি এ সব আমাদের চোখের সামনে ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার হচ্ছি?'

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন কথা বলে উঠল, 'বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তোমরা।'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

বাফারকে দেখতে পেল! চেহারায় উদ্বেগ। 'আমি হুইল হাউজের ডিউটিতে ছিলাম,' জানাল সে। 'তাই তোমাদের দেখে ফেলেছি। জেলখানা থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলে বুঝতে পারছি না। ধরা পড়লে কপালে কিন্তু সত্যি খারাবি আছে তোমাদের।'

বোকা বোকা গলায় জানতে চাইল মুসা, 'নাবিক লোকটা কোথায় গেল দেখেছ?'

'নাবিক? তোমাদের দু'জনকে ছাড়া ডেকে তো আর কাউকে চোখে পড়েনি আমার।'

'আর যে জাহাজটা আমাদের পিছু নিয়ে আসছিল ওটা?' প্রশ্ন করল কিশোর।

এমন ভাবে ওদের দিকে তাকাল বাফার, যেন ওরা পাগল হয়ে গেছে। 'এদিকে জাহাজ! তোমাদের উল্টোপাল্টা কথাবার্তা শুনে এখন আমারই পাগল হওয়ার জোগাড় হয়েছে।...যাও, নিচে গিয়ে বিশ্রাম নাও। যে কোন সময় ডিউটি দিতে চলে আসতে পারে পুকার। তার চোখে পড়ে গেলে ভীষণ বিপদ হবে।'

চলে গেল বাফার।

জেলখানায় ফিরে এল আবার তিন গোয়েন্দা। দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। দরজা বন্ধ হতে তালাটাও আপনা-আপনি লেগে গেল।

'দরজাটাও দেখছি ভূতুড়ে!' বিড়বিড় করল কিশোর।

যে যার বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ওরা। ভাবছে একের পর এক ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলো নিয়ে। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে।

রবিন কথা বলল প্রথম। 'নাবিকটা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু হতে পারে।'

শিউড়ে উঠল মুসা। 'ভূতুড়ে জাহাজে প্রেতাত্মা! ভয়ঙ্কর ব্যাপার।'

বলা নেই কওয়া নেই, কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথাও। জাহাজটা দুলতে শুরু করল ভীষণ ভাবে। ডেক থেকে ভেসে এল চিৎকার-চেঁচামেচি।

পুকার নেমে এল নিচে। চেঁচিয়ে বলল, 'ঝড় শুরু হয়েছে। ডেকে চলে এসো

সবাই।' জেলখানার দরজা খুলে দিল সে। 'যাও, ডেকে যাও, জলদি। সবাইকেই দরকার।'

দৌড়ে চলে গেল পুকার।

ঘুমানোর ঘরে ছুটে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। যার যার বাঙ্কের কাছে রাখা বর্ষাতি, মাথায় সাউথ ওয়েস্টার আর পায়ে রাবার বুট গলিয়ে উঠে এল ওপরে।

আলকাতরার মত কালো আকাশ। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সাথে চলছে গুড়ুম গুড়ুম বজ্রপাত। প্রবল বাতাসে বিশাল ঢেউ উঠছে সাগরে। ঢেউয়ের আঘাতে থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। ঢেউ ভেঙে পড়ছে গলুইয়ের ওপর দিয়ে। ভাসিয়ে দিচ্ছে ডেক।

মুখের সামনে দুই হাত জড় করে ধরে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ক্যাপ্টেন নাইল। হুকুমের পর হুকুম দিয়ে চলেছে নাবিকদের। ঝটপট পাল গুটিয়ে ফেলল কয়েকজন নাবিক। আর কয়েকজন নিচে নামার গর্তের মুখের ঢাকনা আটকে দিল পেরেক ঠুকে, যাতে ভেতরে পানি ঢুকতে না পারে। অনেকেই বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রেলিং ধরে ধরে জাহাজের সামনের দিক থেকে পেছনে যাবার চেষ্টা করছে।

পুকার এসে জানাল, 'জাহাজের খোলে ফুটো হয়ে গেছে।'

'এই ছেলেগুলোকে নিয়ে যাও,' তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'ফুটো মেরামত করুক।'

ফার্স্ট মেটের সঙ্গে দেখতে গেল ওরা। দেখল খোলের একটা তক্তা ভেঙে গেছে। পানি ঢুকছে হুড়মুড় করে। মেঝের কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে পানিতে।

'কিশোর পাশা, লকার থেকে পাম্পটা নিয়ে এসো,' হুকুম করল পুকার। 'কোনার ওই ব্যারেলে পাম্প করে পানি ফেলো তুমি আর রবিন। মুসা আমান, আমার সঙ্গে এসো। ফুটো মেরামত করতে হবে।'

যন্ত্রপাতি রাখার একটা বাক্স নিয়ে এসে ফুটোর কাছে ফেলল পুকার। এক টুকরো তক্তা নিয়ে ফুটোর ওপর চেপে ধরল। বাক্স থেকে হাতুড়ি বের করে পেরেক ঠুকে তক্তাটা আটকে দিতে শুরু করল মুসা। দু' হাতে দ্রুত কাজ করছে সে। একেক বাড়িতে একেকটা করে পেরেক বসিয়ে দিচ্ছে তক্তায়।

দেখতে দেখতে ফুটোটা বন্ধ করে ফেলল দু'জনে মিলে। খোলে পানি ঢোকা বন্ধ হলো।

'গুড!' মুসার প্রশংসা না করে পারল না পুকার।

ওদিকে খোলের লকার থেকে পাম্প নিয়ে এসেছে কিশোর। ছোট, হস্ত চালিত যন্ত্র। অনেক পুরানো মডেল। টিউবওয়েলের হাতলের মত হাতল। সেটাকে ওপরে-নিচে করে পাম্প করতে হয়। এ জিনিস এর আগেও দেখেছে সে, তবে রকি বীচ মিউজিয়ামে। পাম্পের সঙ্গে হোস পাইপ যুক্ত করে পানি সেচতে শুরু করল সে। সেচা পানি ফেলতে লাগল খালি ব্যারেলে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভরে গেল একটা ব্যারেল। দ্বিতীয় আরেকটা ব্যারেলে পাইপের মুখ ঢোকাল কিশোর। ওকে সাহায্য করছে রবিন। এই ব্যারেলটাও কানায় কানায় ভরে গেল। মেঝের পানিও শেষ।

'ভালই তো দেখালে,' পুকার বলল। 'ঠিক আছে, যাও এবার। ওপরে যাও। ওখানে যারা আছে তাদের সঙ্গে হাত লাগাওগে।'

ডেকে উঠে এল তিন গোয়েন্দা। লক্ষ করল ঝড়ের বেগ কমে গেছে অনেক। থেমে গেছে বৃষ্টি, বাতাসের তীব্রতা কমছে। ঢেউয়ের মাতামাতিটাও আর আগের মত নেই।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি,' নাবিকদের বলল ক্যাপ্টেন নাইল। 'তবে ক্ষতিটা কম করেনি। জাহাজের যে সব জায়গায় ক্ষতি হয়েছে, মেরামত করে ফেলো।'

বৃষ্টি নেই। অকারণে ভারী বর্ষাতি আর গায়ে চাপিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। খুলে রেখে এল তিন গোয়েন্দা। দেখল, ঝড়ে জাহাজের ক্ষতি হওয়া জায়গাগুলো মেরামত করে ফেলেছে নাবিকেরা। মূল মাস্তুলের পালের একটা দড়ি ছুটে গেছে। ওপরে উঠে সেটা লাগানোর চেষ্টা করছে একজন নাবিক।

কিশোরের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন নাইল । 'কিশোর পাশা, আড়কাঠের উল্টো দিকে উঠে যাও তো। ওকে সাহায্য করো।'

মাস্তুলের সাথে লাগানো সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল কিশোর। আড়কাঠে চড়ে বসল। লোকটাকে চিনতে পারল এতক্ষণে। ল্যাম্বার্ট।

'ঠিকঠাক মত কাজ করবে বলে দিলাম,' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কিশোরকে বলল ল্যাম্বার্ট। 'পালের দড়িটা ধরো। গিঁট দাও…ওই যে ওই জায়গাটায়।'

জবাব দিল না কিশোর। ওর দিকের পালের প্রান্তটা পতপত করে উড়ছে বাতাসে। ওটাকে ধরতে হলে তাকে আড়কাঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত লম্বা করে দিতে হবে। মাত্র কাপড়টা ধরেছে ও, এমন সময় পাল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ল্যাম্বার্ট।

ভারসাম্য হারাল কিশোর। আড়কাঠ থেকে পড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো তার। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা ও রবিন। ডেকের ওপর ছিটকে পড়তে যাচ্ছে কিশোর।

তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওরা, যখন দেখল শেষ মুহূর্তে আড়কাঠটা ধরে ফেলেছে কিশোর। জাহাজের দুলুনির তালে তালে মাস্তুলটাও দুলছে। কিশোরও ঝুলে থেকে দুলতে লাগল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে প্রাণপণ চেষ্টায় একটা পা রাখল আড়কাঠে। উঠে এল ওটার ওপর।

'আপনি আমাকে ইচ্ছে করে ফেলে দিচ্ছিলেন!' কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর।

খিকখিক করে হাসল ল্যাম্বার্ট। 'আমি ফেলব কেন? আড়কাঠে কি ভাবে কাজ করতে হয় জানো না তুমি। তাই পড়ে গেছ।'

'জানি কি জানি না দেখাচ্ছি আপনাকে,' ওকে চ্যালেঞ্জ করে বলল কিশোর। 'আপনার আগেই পাল খাটাব আমি।'

কিছুদিন আগে কোস্ট গার্ড ট্রেনিং শিপে তার দুই সহকারী সহ কাজ করে এসেছে কিশোর। জানে কি ভাবে পাল খাটাতে হয়। বাতাসে উড়তে থাকা পালের অংশটা থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ও। ওটার ধাতব ফুটোয় চামড়ার ফালি ঢুকিয়ে দিল। ফালিটা গোল করে আড়কাঠের হুকের মধ্যে ঢোকাল। তারপর গিঁট দিয়ে দিল শক্ত করে, নাবিকরা যে ভাবে দেয়। ব্যস, হয়ে গেল পাল খাটানো।

কাজ শেষ করে মইয়ের কাছে চলে এল কিশোর। ল্যাম্বার্টের তখন শোচনীয় অবস্থা। কিশোর যখন মই বেয়ে ডেকে নেমে এসেছে, তখনও পাল নিয়ে যুদ্ধ করছে ল্যাম্বার্ট।

'চমৎকার দেখিয়েছ, কিশোর পাশা,' পুকার বলল। সে সবই দেখেছে। 'ল্যাম্বার্ট ভুল করেছে। ওর তুলনায় তুমি অনেক বেশি দক্ষ। এক নম্বরের তিমি শিকারী হতে পারবে তুমি।'

মুচকি হাসল কিশোর। মুসা আর রবিনের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল, 'প্ল্যানটা কাজে লাগছে। অন্তত ফার্স্ট মেটের মন গলাতে পেরেছি। আশা করি আমাদের পক্ষ নিয়ে এখন ক্যাপ্টেনের কাছে কথা বলতে দ্বিধা করবে না। বলবে আমাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত হবে না। কারণ আমরা কাজের লোক।'

'আমারও তাই ধারণা,' নিচু গলায় বলল রবিন। 'তবে বিপদ নিশ্চয় কাটেনি এখনও আমাদের...'

ক্যাপ্টেনের চিৎকারে থেমে গেল সে।

'এই, এদিকে এসো,' হাত নেড়ে ডাকল ক্যাপ্টেন।

তাড়াহুড়া করে তার কাছে চলে এল রবিন।

'যাও, ক্রো'জ নেস্টে গিয়ে বসো,' হুকুম দিল ক্যাপ্টেন। 'তাহিতির কাছাকাছি এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। ডাঙা কত দূরে জানা দরকার। আন্দাজে চলতে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে চাই না। তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে মরতে চাই না।'

নাবিকদের ভঙ্গিতে 'আই, আই, স্যার,' বলে মূল মাস্তুলের দিকে ছুটল রবিন। মই বেয়ে উঠতে লাগল। আড়কাঠ আর মাস্তুলের সবচেয়ে ওপরের পাল পার হয়ে এল। মাস্তুলের মাথায় ঝোলানো একটা ঝুড়িতে উঠে বসল। এটাকেই বলে ক্রো'জ নেস্ট। এখান থেকে সাগরের চতুর্দিকে নজর রাখা হয়। সাগরের অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।

তবে রাতের বেলা অন্ধকারে খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। ঝুড়িতে বসে চোখ টানটান করে রাখল সে। আবছা অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করছে। জাহাজের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটাও দুলছে। জাহাজ যখন কাত হচ্ছে, মাস্তুল কাত হচ্ছে, দুলতে দুলতে প্রায় পানির ওপর চলে আসছে তখন ঝুড়ি। জাহাজ সোজা হলেই আবার অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। ভীষণ বেকায়দা এক অবস্থা। অনেক সময় কোনও নাবিককে শাস্তি দেবার জন্যেও অতিরিক্ত সময় এই ঝুড়িতে বসিয়ে রাখা হয়।

ঝুড়ির বেকায়দা আসন, সেই সঙ্গে নোনা পানি মেশানো ঝোড়ো বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা। অস্থির লাগছে রবিনের। চোখ কড়কড় করছে।

'আহোয়,' নিচ থেকে ভেসে এল ক্যাপ্টেনের নাবিক-সুলভ হাঁক। 'কিছু দেখছ?'

'পানি ছাড়া আর কিছু তো দেখছি না,' জবাব দিল রবিন। 'অন্ধকারে বেশি দূর নজরও যায় না।'

'তাহিতির দেখা অবশ্যই মিলবে,' চেঁচিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। 'অন্ধকার হলেও। দেখার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

পাহারা দিতে লাগল রবিন। হঠাৎ রাতের আবছা পর্দা ভেদ করে কালো একটা কাঠামো ফুটে উঠতে শুরু করল। মনে হলো পানিতে ভেসে রয়েছে জিনিসটা।

নিশ্চয়ই ডাঙা! উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'আহোয়। নিচে কেউ আছেন!' ডেকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল সে। 'ডাঙা দেখা যাচ্ছে। ডানে! ডানে!...জাহাজ ঘোরান!'

ডেক থেকে ওর কথার প্রতিধ্বনি করল কিশোর, 'ডাঙা ডাঙা! জাহাজ ঘোরাতে বলছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ শোনা গেল ক্যাপ্টেনের। হুইল ধরেছে যে, তাকে বলছে জাহাজ ঘোরাতে।

ডানে ঘুরে গেল জাহাজ। ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল।

'ঠিক সামনেই ডাঙা!' চিৎকার করে জানাল রবিন। 'বাঁয়ে ঘোরান এখন।'

ওর কথারই পুনরাবৃত্তি করল ডেকে দাঁড়ানো কিশোর।

যে লোকটা হুইল ধরেছে, তাকে কি যেন বলতে শোনা গেল। ওপর থেকে রবিনের মনে হলো 'একা কুলাতে পারছি না' এ রকম কিছু বলল লোকটা।

আদেশ দিল ক্যাপ্টেন, 'মুসা আমান, তুমি যাও, ওকে সাহায্য করোগে।'

'আই আই, স্যার,' বলে এক মুহূর্ত দেরি না করে দৌড় দিল মুসা।

ক্যাপ্টেন বলল, 'নাক বরাবর সোজা চলো। ডাঙার দিকে। পাল টানটান করো। গতি বাড়াও।'

এ-কি পাগলামি! শুনে গা হিম হয়ে গেল কিশোরের। ক্যাপ্টেন কি আত্মহত্যা করতে চাইছে নাকি? জাহাজসুদ্ধ সবাইকে ডুবিয়ে মারতে চাইছে?

প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করল জাহাজ। কালচে কাঠামোটা ভীতিকর গতিতে কাছে চলে আসছে। আরও কাছে যেতে বোঝা গেল, তাহিতির ভূখণ্ড নয় ওটা। সাগরের মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ।

ভয়ানক গতিতে প্রবাল প্রাচীরে এসে ধাক্কা মারল জাহাজ। বিকট শব্দে ভেঙে পড়ল মূল মাস্তুল। আছড়ে পড়ল দড়ি-দড়ার জঙ্গলের ওপর। ক্রো'জ নেস্ট থেকে ছিটকে পড়ল রবিন। দড়ি আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাল কোনমতে। তবে পুরোপুরি বাঁচতে পারল না। দড়াম করে এসে পড়ল ডেকে, কিশোরের পাশে।

'রবিন! রবিন!' উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কিশোর।

'ভয় নেই, আমি ঠিকই আছি,' জবাব এল রবিনের। ভয় পেয়েছিল হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না। কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দৌড়ে এল মুসা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'শয়তানিটা ইচ্ছে করে করেছে ক্যাপ্টেন। আমাদের ঝামেলায় ফেলার জন্যে। বাফার বলেছে আমাকে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের গর্জন। গালি দিয়ে বলল, 'সর্বনাশ করেছিস তোরা! আমার জাহাজের বারোটা বাজিয়েছিস! তোদের আমি ছাড়ব না!'

'কিন্তু আমি তো ঠিক মতই জানিয়েছি, কোন্ দিকে যেতে হবে...' প্রতিবাদ করতে গেল রবিন।

কিশোরও বোঝানোর চেষ্টা করল ক্যাপ্টেনকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। গর্জন থামল না ক্যাপ্টেনের। একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলতে থাকল, 'তোরা আমার জাহাজ ধ্বংস করেছিস! তোরা বিদ্রোহী! তোদের আমি ছাড়ব না!' নাবিকদের দিকে ফিরে আদেশ দিল, 'ওদের সাগরে ফেলে দাও। হাঙরে ছিঁড়ে খাক।'

বিকৃত আনন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল কয়েকজন নাবিক। ল্যাম্বার্টের দলের লোক এরা। এদের মধ্যে ল্যাম্বার্টকেও দেখা গেল। সবাই মিলে জাপটে ধরল তিন গোয়েন্দাকে। ঠেলা-ধাক্কা মেরে নিয়ে চলল রেলিং-এর ধারে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল এ সময়। এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। সেই লোকটা, যে ওদেরকে জেলখানা থেকে বের করে এনেছিল। তারপর রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল ডেক থেকে।

ভাবলেশহীন মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল। আঙুল তুলে নাবিকদের ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগল কোন্ দিকে ফেলতে হবে বন্দিদের।

চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে তিন গোয়েন্দাকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলল নাবিকেরা।

পানিতে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল গোয়েন্দা। কিন্তু পড়ল কাঠের মেঝেতে। হতবুদ্ধি হয়ে গেল তিনজনেই। উঠে বসল। তাকাতে লাগল চারপাশে।

যখন দেখল, নিজেদের মোটরবোটেই রয়েছে, বাকহারা হয়ে গেল একেবারে। ভূতুড়ে জাহাজ অ্যাড্রিয়াটিক পাঞ্চের চিহ্নও নেই কোথাও। দিগন্তে ভোরের আভাস। ভালমত খেয়াল করে দেখে বুঝল, রকি বীচের কাছাকাছিই রয়েছে ওরা।

বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে।

বোটের ইঞ্জিনের কাছেই বসে আছে মুসা। ইগনিশনে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মোটর। কিশোর দেখল, রেডিওটাও ঠিক মতই কাজ করছে।

'অকেজো জিনিস হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে গেল কি ভাবে?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'অতি সহজ জবাব,' বলে উঠল মুসা। 'কাল সন্ধ্যায় ভূতে নষ্ট করে দিয়েছিল এগুলো। সকাল বেলা ভূতের আসর কেটে যেতেই আবার ঠিক হয়ে গেছে সব।'

'সত্যিই কি পুরো একটা রাত একটা ভূতুড়ে জাহাজে কাটিয়ে এলাম?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

'এখনও কি সন্দেহ আছে তাতে?' ভুরু নাচাল মুসা।

'আসলে স্বপ্ন দেখেছি,' ভূতের জাহাজ, এ কথাটা মানতে রাজি না কিশোর। '১৮৫০ সালের একটা তিমি শিকারী জাহাজের স্বপ্ন।'

'দুঃস্বপ্ন,' শুধরে দিল রবিন।

'তিনজনেই কি দুঃস্বপ্ন দেখলাম?' মুসার প্রশ্ন। 'একই সময়ে? অবিকল এক স্বপ্ন?'

তার এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না কিশোর কিংবা রবিন।

***

রক্তমাখা ছোরা

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

কাঁসার ঘণ্টার মত বেজে উঠল জোরাল কণ্ঠস্বর *'টুউউউ বিইইই...'*

'কে?' চমকে উঠল কিশোর।

শোনার জন্যে রবিন আর মুসাও কান পাতল।

'...অর নট টুউউউ বিইইই...'

রবিন বলল, 'কে জানি পদ্য বমি করছে!'

জুনের চমৎকার রোদেলা দিন। হাতে কাজকর্ম নেই। বনের ভেতরে বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। সাথে করে খাবার নিয়ে এসেছে, লাঞ্চটা এখানেই সারবে। খাবার খুলে সবে খেতে বসেছে, এ সময় এই কাণ্ড!

'দ্যাট ইজ দা কোয়েশ্চেন...' বলে চলেছে কণ্ঠটা।

'না না, পদ্য নয়,' ভুরু কুঁচকে বলল কিশোর। 'হ্যামলেটের ডায়ালগ। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, আত্মহত্যা করতে চলেছে হ্যামলেট।'

'মনে হয় কোন হতাশ অভিনেতার কাজ!'

'অভিনেতা না ছাই,' মুসা বলল। 'আমার তো মনে হচ্ছে পাগল।'

গমগম করে উঠল কণ্ঠটা, *'টু ডাই, টু স্লীইইপ–নো মোর!...'*

'অবাক কাণ্ড!' রবিন বলল। 'কিন্তু...'

'চলো তো দেখি।' উঠে পড়ল কিশোর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল নদীর দিকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল রবিন।

কণ্ঠটা বলছে, *'ফর ইন দ্যাট স্লীপ অভ ডেথ হোয়াট ড্রীমস মে কাম...'*

'এবার সত্যি সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার!' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।

নদীর একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সামনে একটা কাঠের সেতু। ঝুলে রয়েছে যেন নদীর ওপর, যে কোন মুহূর্তে ঝুপ করে খসে যেতে পারে। খুঁটিগুলোর অবস্থা করুণ। সেতুর মাঝের অনেক কাঠ নেই, কিছু কিছু জায়গা থেকে সরে গিয়ে ঝুলছে, নাড়া লাগলেই খুলে পড়ে যেতে পারে। দু'পাশে দড়ির রেলিঙ।

নদীতে তীব্র স্রোত। মাথা খারাপ না হলে ওই সেতু দিয়ে এখন নদী পারাপারের চেষ্টা করবে না কোন মানুষ।

কিন্তু লোকটার বোধহয় মাথাই খারাপ। সব চুল সাদা। কালো পোশাক পরনে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সেতুর মাঝখানে। চোখ আরেক দিকে।

বলল, *'ফর হুউউ উড বিয়ার দা হুইপস অ্যান্ড স্করন্‌ন্‌নস অভ টাইইম...'*

'বদ্ধ উন্মাদ!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। 'বলে কি শুনছ!'

দু'হাত ওপরে তুলে ফেলেছে লোকটা। চলার গতি বাড়াল কিশোর। বলল, 'শুনছি। হ্যামলেট এ-সময় জীবন শেষ করে দেয়ার কথা ভাবে...'

'হোয়েন হি হিমসেল্ফ মাইট হিজ কোয়ায়েটাস মেইক উইথ...'

'কি করার ইচ্ছে ওর?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'জানি না...'

'আ বেয়ার বডকিন!'

'বেয়ার বডকিনটা আবার কি জিনিসরে বাবা!' মুসার প্রশ্ন।

সেতুর দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে কিশোর। 'একটা ড্যাগার! ছুরি! লোকটা সত্যিই কিছু করবে!'

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'না না, কিছু করবেন না, স্যার! সব ঠিক হয়ে যাবে!'

চমকে ফিরে তাকাল লোকটা। তিন গোয়েন্দাকে দৌড়ে আসতে দেখল। মুখে অসংখ্য ভাঁজ। বয়েসের। চেহারা বিধ্বস্ত, কিন্তু মাথার চুল সব ঠিক আছে, এলোমেলো নয়। একঘেয়ে গলায় বলল, 'আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। নিজের হাতেই জীবন দিয়ে দেব আমি।'

ঝট করে একটা ছুরি বের করল। তুলে আনল বুকের ওপর।

কিশোর বুঝল, সেতুতে চড়ার সময় নেই। নদীর কাদাটে ঢালু পাড়ে ধপ করে বসে পিছলে নেমে গেল একটা খুঁটির কাছে।

'ইনটু দা গ্রেট এভারলাসটিং আই কমেন্ড মাই স্পিরিট!' ভারী গলায় চিৎকার করে উঠে ছুরিটা বুকে বসাতে তৈরি হলো লোকটা।

'নাআআআ!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

নড়বড়ে খুঁটিটা দু'হাতে চেপে ধরল কিশোর। গায়ের জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল। ক্যাঁচম্যাচ করে দুলে উঠল পুরানো সেতু। তাল সামলাতে না পেরে তাড়াতাড়ি একদিকের দড়ির রেলিঙ আঁকড়ে ধরল লোকটা। ঝুলে থাকা কয়েকটা তক্তা খসে পড়ল পানিতে।

ঝাঁকিয়েই চলেছে কিশোর। মড়াৎ করে ভাঙল সেতুর একটা বীম, পুরানো আরেকটা বীম ভার রাখতে পারল না, ভেঙে গেল ওটাও। বিকট শব্দ করে ঝটকা দিয়ে পড়ে গেল সেতুর একপ্রান্ত। দড়িটড়ি কোন কিছু ধরেই আর কাজ হলো না। সামলাতে পারল না লোকটা। ঝপাং করে পড়ল পানিতে। ছুরিটা তখনও ধরে রেখেছে শক্ত করে।

ডুবে যাওয়ার আগে লোকটার রক্ত পানি করা চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল নদীর দুই তীর আর পাহাড়ে। মাঝপথে থেমে গেল চিৎকারটা, যেন গলা টিপে থামিয়ে দেয়া হলো। আতঙ্কিত চোখে মুসা দেখল, তীব্র স্রোত লোকটাকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে তার দিকে।

'চলে যাবে! মরবে! পাথরে গিয়ে বাড়ি খাবে!'

মুসার চিৎকার কানে পৌঁছল কিনা বোঝা গেল না, তবে কোনমতে মাথা তুলল লোকটা। 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! সাঁতার জানি না...!' নাকে মুখে পানি ঢুকে গেল বোধহয় ওর।

প্রায় একই সঙ্গে পানিতে ডাইভ দিল তিন গোয়েন্দা। মাথা তুলল লোকটা, আবার ডুবে গেল। এরই মাঝে পলকের জন্যে নজরে পড়ল তার আতঙ্কিত দৃষ্টি। তীব্র স্রোত ঠেলে তার কাছে পৌঁছল ওরা। হাত বাড়িয়ে কাঁধ ধরতে গিয়েও ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল মুসা। মুখ সরাল। আরেকটু হলেই তার গাল চিরে

দিয়েছিল ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা।

'কাছেই তো যেতে পারছি না!' বলল সে।

'শান্ত হোন, স্যার!' অনুরোধ করল কিশোর! 'হাত নাড়বেন না। চুপচাপ ভেসে থাকার চেষ্টা করুন।'

'আমি···আমি···সাঁতার···' আবার পানির নিচে ডুবে গেল লোকটার মাথা।

লোকটা সহযোগিতা করতে পারবে না, চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে, বুঝল মুসা। হঠাৎ চার হাত পায়ে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়ল, লোকটার বুক জড়িয়ে ধরল। লাথি মেরে, ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল যেন লোকটা, ছুরি নাচাল অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে মুসাকে সাবধান করল কিশোর।

ডান হাতে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে রেখে অন্য হাতে লোকটার ডান কব্জি চেপে ধরল মুসা। একটা বিশেষ দুর্বল জায়গায় বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই নিমেষে খুলে গেল ছুরি ধরা আঙুলগুলো। পানিতে পড়ে গেল ছুরিটা।

ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে এসেছে লোকটা। নড়াচড়া আর তেমন করছে না। তাকে নিয়ে সাঁতরে তীরে ওঠার চেষ্টা চালাল মুসা। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে চোখা পাথরের দেয়াল, দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে, মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে বয়ে চলেছে পানি। লোকটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মুসা দেখল না সেটা, কিন্তু রবিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'ছেড়ে দাও, মুসা, ছেড়ে দাও! তুমিও মরবে!'

'জলদি এসে ধরো! আমি একলা পারছি না!'

কিছুতেই ছাড়বে না মুসা, বুঝতে পেরে প্রাণপণে সাঁতরে এগোল অন্য দু'জনে। কোনমতে কাছে এসে চেপে ধরল লোকটার হাত।

তিনজনে মিলে টেনেটুনে তীরের কাছে নিয়ে এল লোকটাকে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল লোকটা। চোখা পাথরের দেয়াল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে তীরে এসে উঠল ওরা।

ভেজা মাটিতে চিত করে শুইয়ে দেয়া হলো লোকটাকে। চোখ মুদে রয়েছে সে। বেহুঁশ হয়ে গেছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি ওর মুখে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা চালাল কিশোর।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কেশে উঠল লোকটা। 'আ-আমি···কো-কোথায়···'

চোখ মেলল লোকটা। ঘোলাটে দৃষ্টি। শূন্য চাহনি। ঠিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। 'আমি বেঁচে আছি, তাই না?'

'আছেন। অল্পের জন্যে বেঁচেছেন,' জবাব দিল কিশোর। 'সময় খারাপ যাচ্ছে নাকি আপনার?'

'খারাপ?' বিড়বিড় করল লোকটা। দুর্বল কণ্ঠ, কিন্তু রাগ চাপা পড়ল না, বলল, 'শুধু খারাপ বললে কম বলা হবে। কোনমতে জীবনটাকে টিকিয়ে রেখেছি আমি!'

'আস্তে। আস্তে।' হাত নাড়ল কিশোর, 'সহজভাবে কথা বলুন। আপনি কে? এখানে কি করতে এসেছেন?'

'আমি একজন বিপদে পড়া মানুষ, স্যার,' নাটক করতে করতে যেন নাটকীয়

ভঙ্গিতে কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেছে লোকটার। মাথা ঝাড়ল, যখন তাকে তুলে বসানোর চেষ্টা করল রবিন। 'নাম আমার নিভার ব্রাউন।' চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল বিষণ্ন ভঙ্গিতে। 'হ্যাঁ, থিয়েটার আর সিনেমার সেই নিভার ব্রাউন। চমকে গেলে তো?'

কারও কাছ থেকে জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখল ওদের শূন্য দৃষ্টি। 'আর্ট ফিল্ম বোধহয় দেখো না তোমরা!'

মাথা নাড়ল তিনজনেই।

'তাহলে আর চিনবে কিভাবে? পচা নাটক আর সিনেমা দেখলে আমার নাম জানার কথা নয়। যাকগে! এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কেন বাধা দিলে আমাকে?'

'আত্মহত্যা একটা অপরাধ, মিস্টার ব্রাউন,' কোমল গলায় বলল রবিন। 'আপনার পরিবারের কথা ভাবুন…'

কঠিন হয়ে গেল লোকটার ধূসর চোখজোড়া, দৃষ্টি যেন ধারাল ছুরির ফলার মত ভেদ করে ঢুকে গেল রবিনের অন্তরে। 'পরিবার? সেই চরিত্রহীন মেয়েমানুষটার কথা বলছ, যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে হলিউডের এক ফিল্ম এডিটরের সঙ্গে!'

'স্-সরি, মিস্টার ব্রাউন, আমি সত্যি দুঃখিত!'

'আরে শোনোই না, আমার দুঃখের ইতিহাস শুরুই তো করিনি এখনও। আর্ট ফিল্ম আর খুব একটা হয় না আজকাল, ফলে কাজ পাওয়া যায় না। একজন নিয়মিত একটা বেতন দিয়ে যাচ্ছিলেন, এখন সেটাও গেছে। তা ছাড়া মনের খোরাকই যদি গেল একজন মানুষের, বেঁচে থাকার আর কি অর্থ বলো? জীবনের সব কিছু হারিয়ে আমার বয়েসী একজন মানুষ বেঁচে থেকে কি করবে? অ্যাঁ! কি করবে?' আশপাশে মাটিতে চোখ বোলাল সে। 'আমার ছুরি কই?'

'পানির তলায়,' কিশোর জানাল। 'নদীতে। শুনুন, ওসব পাগলামি চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন। গাড়ি আছে। বাড়ি পৌঁছে দেব। বিশ্রাম নিলেই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছেন এখন আপনি।'

'হবে না, হবে না! ওই ছুরিটা হারিয়ে তো মন আরও খারাপ হয়ে গেল! ওই ছুরিটা আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি। আমার বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবার কাছ থেকে এসেছে! করলে কি তোমরা! আমাকে মরে তো বাঁচতে দিলেই না, মাঝখান থেকে ওরকম একটা সম্পদ খোয়ালাম…'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। তারপর জোর করে ধরে তুলল ব্রাউনকে। কিছুতেই যাবে না লোকটা। শেষে অনেকটা হাল ছেড়ে দেয়ার ভান করে ঘুরে দাঁড়াল তিনজনে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।

একবার দ্বিধা করে পিছু নিল ব্রাউন। অভিযোগের পর অভিযোগ করে চলল। সমস্ত দুনিয়ার ওপর তার ঘৃণা জন্মেছে। তবে থামল না আর। বন পেরিয়ে এসে দাঁড়াল মুসার ভটভটানি জেলপি গাড়িটার কাছে।

ট্রাংক থেকে উলের একটা শাল বের করল মুসা। ব্রাউনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ভেজা শরীর জড়িয়ে নিতে ইশারা করল লোকটাকে।

মুসা যখন ইঞ্জিন স্টার্ট দিল; শাল জড়ানো, এমনকি পেছনের সীটে রবিনের পাশে উঠে বসার কাজটাও সমাপ্ত হয়েছে লোকটার, ফোঁপাতে আরম্ভ করল। যেন কত কষ্ট।

'প্লীজ, মিস্টার ব্রাউন,' মুসা বলল, 'এত ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। কোথায় থাকেন, বলবেন?'

'নাইনটি ফোর লেকভিউ এভিন্যু!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছল বেচারা ব্রাউন। 'আমার জীবন যদি রক্ষাই করলে, আরেকটু উপকার করো, দয়া করে একটা টিস্যু পেপার দাও।'

একটা টিস্যু পেপার বের করে দিল কিশোর।

গাড়ি চালিয়ে রকি বীচের একটা পুরানো অঞ্চলে ঢুকল মুসা। শহরতলি দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়ার প্রতি এক নাগাড়ে অনর্গল অভিযোগ করে চলেছে ব্রাউন।

'মিস্টার ব্রাউন!' আর সইতে না পেরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মুসা, 'দয়া করে একটু থামবেন? গাড়ি চালাতে পারছি না...'

মাছ ধরার সরঞ্জামের একটা দোকানের পরেই তীক্ষ্ণ মোড়। উইন্ডশীল্ডের ওপাশে চোখ পড়তেই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ব্রাউনের।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

ভুল সাইড দিয়ে ধেয়ে আসছে আরেকটা লাল স্পোর্টস কার। নাক বরাবর ছুটে আসছে যেন ওদেরকে গুঁতো মারার জন্যেই!

দুই

শাঁই করে ডানে স্টিয়ারিং কাটল মুসা। নাকের একপাশ দিয়ে একটা গার্ড রেইলে গুঁতো মারল গাড়িটা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে পাশ দিয়ে প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল লাল ল্যামবোরগিনি গাড়িটা।

বিচ্ছিরি একটা ধাতব আওয়াজ ভরে দিল যেন বাতাসকে। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে দিল মুসা। ফিরে তাকিয়ে দেখল একটা টেলিফোন পোস্টে ধাক্কা লাগিয়েছে লাল গাড়িটা।

'ঠিক আছো তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছি। উফ্, বড় বাঁচা বেঁচেছি!' মুসা বলে উঠল।

দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে লাল গাড়িটার দিকে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। ক্ষতি তেমন হয়নি, শুধু সামনের দিকে খানিকটা জায়গার ছাল উঠে গেছে।

'আমিও ভাল আছি, বুঝলে!' জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে বলল পেছনের সীটে বসা ব্রাউন। 'কিছুই জিজ্ঞেস করলে না আমাকে! আমার জীবনের কি কোন দাম নেই?'

কানেও তুলল না তিন গোয়েন্দা। ওরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল বাঁ পাশের দরজা। শোনা গেল তীক্ষ্ণ মেয়েলী চিৎকার, 'এই, দেখেশুনে গাড়ি চালাতে পারো না?'

গাড়ি থেকে নেমে এল এক তরুণী। বয়েসে ওদের একআধ বছরের বড় হতে পারে। লাল চুল। গলার তিনটে সোনার হারকে ঠিক করল। হাত দিয়ে ডলে সমান করে দিল আঁটো জাম্পসুটের ভাঁজ। নাকে সানগ্লাস বসানোর আগে একবার বিষদৃষ্টি হানল কিশোর, রবিন আর মুসার ওপর। তারপর গটমট করে এগিয়ে এল। মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগল কিশোরের।

'দেখো, আমার গাড়ির কি করেছ!' ধমক দিয়ে বলল মেয়েটা। 'এক্কেবারে শেষ!'

'না, খুব একটা ক্ষতি হয়নি,' মুসা বলল। 'তবে দোষটা তো আপনার...'

'তোমার দোষ!'

'দোষ যারই হোক,' মেয়েটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর, 'এখন আর বলে লাভ নেই। আর গাড়ির যা ক্ষতি হয়েছে, তার জন্যেও চিন্তা নাই। বীমা কোম্পানিই যা করার করে দেবে। আসল জিজ্ঞাসাটা হলো, আপনি জখম-টখম হয়েছেন কিনা। ভাল আছেন?'

দাঁত খিঁচিয়ে বলল মেয়েটা, 'তোমাদের চাঁদমুখ দেখার আগে তো ছিলামই! কি যে বিপদে ফেলে দিলে! এখন গ্যারেজে খবর দিতে হবে। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হবে আমাকে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ভাল ঝামেলা বাধিয়েছ।!'

আবার ড্রাইভিং সীটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। ভেতর থেকে বের করল একটা মোবাইল টেলিফোন। কিশোর মনে করার চেষ্টা করছে, মেয়েটাকে কোথায় দেখেছে।

'হাল্লো, মারলিন?' ফোনে বলল মেয়েটা 'হাল্লো, আরে জোরে বলো না!...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি...ডায়না, ডায়না!...কী?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে টেলিফোনটা প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'যাই কি করে এখন? হাঁটব!'

'দৌড়ে যাও!' মুখে এসে গিয়েছিল কথাটা মুসার। কিন্তু বলল না। তার বদলে বলল, 'আমার গাড়িতে করে যাবেন?'

'তুমি চালাবে?' তিক্তকণ্ঠে বলল মেয়েটা।

'হ্যাঁ।'

'যেতে পারি, যদি ও চালায়,' বুড়ো আঙুল দিয়ে কিশোরকে দেখাল ডায়না। 'কারণ আমার মনে হচ্ছে ও ভাল চালাবে। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। আবার গুঁতো লাগাবে কারও গাড়ির সঙ্গে।'

কিশোরের দিকে একটা অদ্ভুত চাহনি দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল মুসা। ফিরে চলল গাড়ির কাছে।

মুচকি হাসল রবিন।

মেয়েটার ব্যাপারে কৌতূহল বাড়ছে কিশোরের। কোথাও দেখেছে। ডাকল, 'আসুন।'

ঝাঁকুনি দিয়ে মুখের ওপরে এসে পড়া সিল্কের মত নরম লাল চুলগুলো সরিয়ে দিল ডায়না। এগোল মুসার গাড়ির দিকে।

'আপনাকে চিনে ফেলেছি আমি,' বলে উঠল কিশোর। 'আপনি ডায়না মরগান। পত্রিকায় পড়েছি...'

'...পারসোনালিটি ম্যাগাজিনে,' কিশোরের বাক্যটা শেষ করে দিল ডায়না। 'হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে। উদ্ভট আর্টিকেল, তাই না? হেডিংটা কি দিয়েছে! পড়লেই গা জ্বলে! ওটা একটা লেখা হয়েছে? গরু ছাগল কতগুলোকে নিয়ে ভরেছে পত্রিকা অফিসে। আহারে, আমার জন্যে কি দুঃখ ওদের, আমার বাবা-মায়ের অকাল মৃত্যুতে কেঁদেকেটে অস্থির। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। যত্তোসব!'

কাছেই একটা ফোন বুদ দেখে এগিয়ে গেল ডায়না। ফোন সেরে ফিরে এসে উঠল গাড়িতে, সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে। এমন ভঙ্গি করল, যেন মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়িতে উঠেছে। নাক কুঁচকে নির্দেশ দিল কিশোরকে, 'রকি বীচ মিউজিয়ামে যাও। জলদি।'

পেছনের সীটে তখন একেবারে গুটিয়ে গেছে ব্রাউন। মুসার দেয়া শাল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে আপাদমস্তক। মুখও দেখা যায় না।

সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকাল ডায়না। 'ব্যাপার কি? রোগী নাকি! এই, কি রোগ? এইডস?'

ব্রাউনের প্রতিক্রিয়া খুব একটা হলো না, সামান্য নড়েচড়ে বসল শুধু শালের তলায়। তার পাশে গাদাগাদি করে বসল মুসা ও রবিন।

'না, রোগী না,' জবাবটা দিল কিশোর। 'খুব দুর্বল। তা মিউজিয়ামে কেন? মরগানদের কালেকশন চেক করা হচ্ছে?'

মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করল ডায়না। 'চেক-ফেক না। যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' আগ্রহ দেখাল কিশোর। 'পারসোনালিটি তো বলছে, মিউজিয়ামের অর্ধেক জিনিসই নাকি আপনাদের। নিয়ে গেলে খালি হয়ে যাবে তো।'

'তা যাবে। পত্রিকা ভুল তথ্য দিয়েছে। অর্ধেক নয়, ষাট ভাগই আমাদের। এখন ওগুলো সব আমার সম্পত্তি। মিউজিয়ামে ফেলে রাখার পক্ষপাতি নই আমি। বাড়ি সাজাব। নিজের বাড়ির দেয়ালে ঝোলাব পেইন্টিংগুলো। ওদেরকে দিয়ে রাখব কেন শুধু শুধু?'

অর্ধেকের বেশি জিনিস মিউজিয়াম থেকে চলে যাচ্ছে দেখে কিউরেটরের মুখটা কেমন হবে, আন্দাজ করতে চাইল কিশোর।

নিজের চোখেই দেখতে পেল খানিক পরে। মিউজিয়ামের কাছে চলে এসেছে গাড়ি। দেখা গেল, বাড়িটার পাশে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ওটার পেছনে জড়ো হয়েছে পাঁচজন লোক। চারজনের পরনে ধূসর রঙের ইউনিফর্ম। বড় একটা বাক্স ট্রাকে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। পঞ্চমজনের গাঁট্টাগোট্টা শরীর, নীল সুট পরেছে, চোখে সরু তারের চশমা। চারজনে ধরাধরি করে বাক্সটা ট্রাকের পেছনে নিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে চলেছে নীল সুট। বার বার হাত নেড়ে কি বোঝাতে চাইছে, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চোখমুখ। পাতলা হয়ে আসা সোনালি চুলের কয়েকটা গোছা এসে লেপটে রয়েছে ঘামে ভেজা কপালের ওপর। লোকগুলোকে কাজ থেকে, অর্থাৎ ট্রাকে বাক্স তোলা থেকে বিরত রাখতে চাইছে।

'এটাই বোধহয় শেষ বাক্স,' আনমনে বিড়বিড় করল ডায়না। হুকুমের সুরে কিশোরকে বলল, 'আহ্, তাড়াতাড়ি চালাও না। মোটোর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

ধনুকের মত বাঁকা ড্রাইভওয়ে ধরে বাড়িটার পাশে এনে গাড়ি রাখল কিশোর। একটানে দরজা খুলে লাফিয়ে নামল ডায়না। 'কি হলো জুভেনার, ওদের ধমকাচ্ছেন কেন?'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল লোকটা। সরে যাওয়া চশমাটা আবার ঠেলে দিল নাকের ওপর। 'মিস মরগান, আপনার নিশ্চয় মনে আছে এই জিনিসগুলো মিউজিয়ামকে দান করে দেয়া হয়েছে। তিরিশ বছর আগে দলিল সই করে দিয়েছেন আপনার দাদা। কিউরেটর হয়ে কি করে আমি এগুলো নিয়ে যেতে দিই?'

অসহিষ্ণুতা চলে গেছে ডায়নার। শান্তকণ্ঠে বলল, 'জুভেনার, আপনিই বলেছেন, ওই দলিলটা পাওয়া যাচ্ছে না। ছিল যে তার ঠিক কি?'

'ছিল, নিশ্চয় ছিল! খুঁজে বের করার জন্যে সময় তো দেবেন? গত বছর আগুন লেগেছিল, জানেন। তখন সমস্ত পুরানো ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়েছিল...'

'ওসব কথা অনেক শুনেছি,' বাধা দিয়ে বলল ডায়না। 'আমার বাবার উইলের কপি আপনি দেখেছেন। জিনিসগুলো এখন আমার সম্পত্তি। এবং আমি ওগুলো ফেরত চাই। অনেক দিন তো রাখলেন, আর কত? নতুন করে সাজিয়ে নিন আবার।'

'নতুন করে! মাই ডিয়ার লেডি, এটা মিউজিয়াম, বেডরুম নয় যে বললেই সাজানো হয়ে যাবে। এত দামী দামী ছবি, শিল্পকর্ম, চাইলেই কি পাওয়া যায়? আর ওসব জিনিস ছাড়া মিউজিয়াম বাতিল।'

মোলায়েম হেসে পরিবেশ হালকা করে ফেলতে চাইল ডায়না। কিশোর যতটা মাথামোটা ভেবেছিল মেয়েটাকে, এখন দেখল ততটা নয়। বরং বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমতী।

'আহ্হা, এত মন খারাপ করছেন কেন?' ডায়না বলল। 'অন্য ভাবেও তো ভেবে দেখতে পারেন। তিরিশটা বছর অন্যের জিনিস দিয়ে মিউজিয়ামের মান বাড়িয়েছেন, নাম কামিয়েছেন, এটা কি কম পাওয়া হলো?'

'ওগুলো রাখতে পারলেই শুধু খুশি হব আমি। আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছেন। আপনার বাবাও মেনে নিতেন না এটা।'

লোকটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করল চারজনের একজন। 'আহ্হা, মিস্টার জুভেনার, কি শুরু করলেন? সরুন না! ভীষণ ভারী এটা। সরুন, জায়গা দিন। ম্যাডাম যা বলছেন, শুনুন।'

'না, নিতে হলে আমার লাশের ওপর দিয়ে নেবে!' ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিতে গেল জুভেনার।

আরেকজনের পায়ে পা বেধে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। গেল রেগে। গাল দিয়ে লাফিয়ে উঠে ঘুসি মেরে বসল জুভেনারের চোয়ালে।

পড়ে গেল জুভেনার।

কিউরেটরকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে এল মিউজিয়ামের তিনজন কর্মচারী। এসেই যে লোকটা জুভেনারকে মেরেছে তার পেটে ঘুসি মারল একজন। আরেক ঘুসি মেরে ফেলে দিল একটা বাক্সের ওপর।

চোয়াল ডলতে ডলতে চিৎকার করে উঠল কিউরেটর, 'এই কি করছ নিক, ওটা রডিনের স্ট্যাচু! ভাঙবে তো!'

তার চিৎকার কানেই তুলল না কেউ। পাইকারী মারামারি শুরু হয়ে গেছে। মিস ডায়না মরগানের শ্রমিক বনাম মিউজিয়ামের কর্মচারী। টেনে-হিঁচড়ে বাক্স সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জুভেনার।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা, কিছুক্ষণের জন্যে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিশোর। তারপর সংবিৎ ফিরল। 'দেখি, থামাই! রবিন, জলদি পুলিসকে ফোন করো! মুসা, এসো আমার সঙ্গে!' বলেই দৌড় দিল সে।

একজন শ্রমিকের ওপর থেকে নিককে টেনে সরিয়ে আনল মুসা। ঘুরতেই দেখল, ঘুসি পাকিয়ে তারই দিকে ছুটে আসছে আরেকজন শ্রমিক। ঝট্ করে মাথা নিচু করে ফেলল সে। ঘুসিটা চলে গেল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। সোজা হয়েই জুজিৎসুর প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলে দিল লোকটাকে।

'আরে থামুন, থামুন আপনারা! শুরু করলেন কি!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। পেছন থেকে এসে তাকে জাপটে ধরল মিউজিয়ামের এক কর্মচারী। মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। পারল না। কারাতের প্যাঁচে কুপোকাৎ হলো। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডায়নার, এ রকম কিছু ঘটবে আশা করেনি। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে মুসার গাড়িটার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইরেনের শব্দ যেন মধু বর্ষণ করল কিশোরের কানে। পুলিসের সাইরেন। ড্রাইভওয়েয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে। দুটো গাড়ি চোখে পড়ল। পুলিসের। আগেরটাতে ড্রাইভারের পাশে অফিসার পল নিউম্যানকে বসে থাকতে দেখল।

'ব্যস, ব্যস, অনেক হয়েছে!' বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল টঙটঙে যান্ত্রিক কণ্ঠ, পেট্রোল কারের মেগাফোনে কথা বলছে পল। পুলিসের নির্দেশ উপেক্ষা করার সাহস হলো না কারও। লড়াই থামিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল, যেন গোবেচারা, কিচ্ছু করেনি।

গাড়ি থেকে নেমে এল পল আর তার সহকারী। আরেক দিক থেকে এল রবিন, ফোন করতে গিয়েছিল রাস্তার মোড়ের একটা ফোন বুদে। ভ্যান থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল মুসা।

'মিস্টার জুভেনার,' জিজ্ঞেস করল পল, 'কি হয়েছে? মালগুলো কার, মরগানদের না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিউরেটর। 'জোর করে নিয়ে যেতে এসেছে এই লোকগুলো।'

'নাকি আপনি জোর করে রেখে দিতে চাইছেন? মিস মরগানের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে আমার। দলিল যতক্ষণ দেখাতে না পারছেন, জিনিসগুলো রাখতে পারছেন না আপনি। বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।'

'কিন্তু…কিন্তু…'

'যা বলার আদালতে গিয়ে বলবেন। আমাকে বলে লাভ হবে না।'

পলের সঙ্গে তর্ক করছে কিউরেটর, রবিন চলে এল কিশোরের পাশে। জোর একটা লড়াই যে হয়ে গেছে, লোকগুলোর নাকমুখের অবস্থা দেখেই আন্দাজ করতে পারল। শিস দিয়ে উঠল আপনমনে। মাথার চুলে হাত বোলাল। 'মনে হয় মিসই করলাম! কেমন চলল?'

'দারুণ,' জবাব দিল মুসা। মুখে মৃদু হাসি। ছড়ে যাওয়া কনুই ডলছে। 'তুমি ছিলে না বলে আমারও দুঃখ হচ্ছিল। কারাত আর জুজিৎসুর কি প্যাঁচগুলোই না কষলাম। দেখলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে…'

কথা শেষ হলো না তার। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। ঝট্ করে ফিরে তাকাল সবাই ড্রাইভওয়ের শেষ মাথার দিকে।

মুসার গাড়ির গায়ে যেন সেঁটে রয়েছে ডায়না। পেছন থেকে তার গলা চেপে ধরেছে একজোড়া হাত।

দৌড় দিল দুই ভাই। পেছনে রবিন। চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ব্রাউন তো মেরে ফেলল মেয়েটাকে!'

তিন

ডায়নাকে সাহায্য করছে কিশোর, ইতিমধ্যে ব্রাউনের কলার ধরে টেনে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এল মুসা।

'ডায়না, লেগেছে কোথাও?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, না, আ-আমি ঠিক আছি!' ফুঁপিয়ে উঠল একবার ডায়না। হাত চলে গেছে গলায়, যেখানটায় চাপ লেগেছে। 'শুধু মাথাটা কেমন যেন করছে!'

'অনেক সহ্য করেছি আমি, ডায়না মরগান,' চিৎকার করে বলল ব্রাউন, নাটকের সংলাপ বলছে যেন, 'আর নয়। তোমাকে ছাড়ব আমি ভেবেছ! সর্বনাশ করে দেব। খুন করব!' দুই হাত বাড়িয়ে এগোল সে।

ভয় পেয়ে গেল ডায়না। পিছিয়ে এল এক পা। লাফ দিয়ে তার আর ব্রাউনের মাঝে চলে এল কিশোর। বাধা হয়ে দাঁড়াল মাঝখানে। পল আর তার সহকারীও পৌঁছে গেল ওখানে। ব্রাউনকে টেনে সরিয়ে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল তার হাতে। কিশোরের দু'পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।

'আমাকে ছাড়ুন অফিসার, আমার কোন দোষ নেই,' সংলাপ চালিয়ে গেল অভিনেতা। 'ও আমাকে বাধ্য করেছে এসব করতে। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারিনি, তা-ই করিয়ে ছেড়েছে আমাকে দিয়ে।'

ব্রাউনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পল। চকচক করে উঠল চোখ। 'ও, আপনিই সেই লোক, না? *হরর হাই স্কুল থ্রী* নাটকটার বারোটা বাজিয়েছেন?'

'আমার কোন দোষ ছিল না,' মাটির দিকে তাকিয়ে বলল ব্রাউন। 'পার্টটাই

ছিল ওরকম, বাজে।'

ডায়নার দিকে নজর দিল কিশোর। 'সত্যি ঠিক আছেন তো আপনি?'

'হ্যাঁ, ভালই আছি,' গলায় জোর নেই। কিশোরের চোখে চোখে তাকাল, দৃষ্টিতে স্বস্তি দেখা গেল এতক্ষণে। 'থ্যাংকস।'

হাত ডলছে মুসা। দাঁতের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কামড়ে দিয়েছে ব্রাউন। জলাতঙ্কই না হয়ে যায় শেষে–ভাবল সে। পাগলই মনে হচ্ছে লোকটাকে! পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি তো!

'ধন্যবাদটা কিন্তু আমাকে দেয়া উচিত ছিল,' হালকা গলায় বলল মুসা। 'আপনাকে ছাড়িয়ে আনার সময় কামড়টা ব্রাউন আমাকে দিয়েছে,' কিশোরকে দেখাল সে। 'ওকে নয়।'

শূন্য দৃষ্টিতে মুসার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ডায়না। তারপর কিশোরকে বলল, 'লোকটা সাংঘাতিক! বদ্ধ পাগল···'

'এই, আমি সব শুনছি কিন্তু!' গর্জে উঠল ব্রাউন। 'মাত্র তো কয়েকটা বছর। এর মধ্যেই আমার সম্পর্কে ধারণা পাল্টে গেল?'

'আপনি শান্ত হোন, মিস্টার ব্রাউন,' বলে ডায়নার দিকে ফিরল কিশোর। 'একে চেনেন নাকি?'

শীতল দৃষ্টিতে ব্রাউনের দিকে তাকাল ডায়না। 'চিনি না মানে। ওর নাম ব্রাউন না, এনুডা, বার্ব এনুডা। আব্বার কাছে চাকরি করত···'

'ওই পাপ মুখে ওঁদের নাম আর নিও না,' চেঁচিয়ে উঠল এনুডা। 'সাহেব আর মেমসাহেব কত ভাল ছিলেন! তাঁদের ঘরে যে তোমার মত একটা খাণ্ডারনী কি করে জন্মাল বুঝতে পারি না! বিশটা বছর ওদের গাড়ি চালিয়েছি, অথচ একটা দিনের জন্যেও অসুখী হইনি। কত ভালবাসতেন আমাকে, যেন একেবারে আপন ভাই! প্রাসাদ ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে দিতেন না। আরে মেয়ে, এত যে বড় বড় কথা বলো, তোমাকেও কি কম আদর করেছি নাকি আমি? কোলেপিঠে করে মানুষ করিনি? তোমাদের জন্যে আমার থিয়েটারের ক্যারিয়ার নষ্ট করলাম।' কড়া চোখে তাকাল ডায়নার দিকে। 'বিনিময়ে কি পেয়েছি? একটা আজীবন ভাতার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তোমার বাবা, সেটাও তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি কি মানুষ?'

'যারা কাজ করে না তাদেরকে বেতন দিই না আমি,' ডায়না বলল। 'আপনারাই বলুন, বসে বসে কারও টাকা নেয়া কি উচিত? কিচ্ছু করে না। দিন-রাত চব্বিশটা ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে, আর পুরানো ছবির ডায়লগ নকল করে।'

'বেশ, আমি নাহয় কাজ করি না, কিন্তু বাড়িতে অন্য যে সব কাজের লোক ছিল? তাদেরকে তাড়িয়েছ কেন? সবাই কি অকাজের? তাড়াবেই তো। সবাই বাপের আমলের লোক যে। তোমার পার্টিতে যাওয়া, আড্ডা মারা, অকাজ-কুকাজ সইতে না পেরে কিছু বলতে আসে যদি···'

'হয়েছে, হয়েছে, থামুন,' হাত তুলল পল। 'মিস, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান?'

হঠাৎ ভয় দেখা দিল এনুডার চেহারায়। দো২াই তোমার ডায়না, এই কাজটা অন্তত কোরো না! আমাকে রেহাই দাও। তুমি জানো, আমি লোক খারাপ নই। মাঝে মাঝে মাথাটা বিগড়ে যায়, তখন কি যে করে বসি!···সময় খুব খারাপ যাচ্ছে তো···'

মাথা নাড়ল ডায়না। 'না, অফিসার, ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। আমি আশা করব, এরপর থেকে ভাল হয়ে যাবে এনুডা। আমার ব্যাপারে আর নাক গলাতে আসবে না।'

অবাক হলো পল। 'বেশ, আপনি যখন বলছেন···' হাতকড়া খুলে দিল এনুডার।

'থ্যাংক ইউ,' মৃদু স্বরে বলল এনুডা। ঝাড়া দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করল, যদিও লাভ হলো না খুব একটা, ভালমতই লেগে গেছে। চিবুক সোজা করে, কারও দিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'ওকে ছাড়াটা বোধহয় ঠিক হলো না,' কিশোর বলল। 'মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।'

মাথা ঝাঁকাল ডায়না। 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাঝে মাঝেই করে ওরকম। দেখে নেয়, কাছাকাছি লোক আছে কিনা। থাকলে করে, যাতে সময়মত ওকে থামাতে পারে ওরা। অভিনয় করতে পারেনি বলেই বোধহয় ওর এই ক্ষোভ। মাথায় ছিট আছে, তবে কারও কোন ক্ষতি করে না।'

এনুডা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে পল বলল, 'লোকটাকে একটুও ভাল লাগল না আমার। হুঁশিয়ার থাকবেন। কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাদেরকে। কিশোর, মিস মরগানকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে?' মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল একবার, হাসল, তারপর সহকারীকে নিয়ে এগিয়ে গেল নিজেদের গাড়ির দিকে।

উষ্ণ, উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিল কিশোরকে ডায়না। 'যে ভাবে সামলেছ না পাগলটাকে, খুব ভাল লেগেছে আমার। আর ওই মিউজিয়ামের শয়তানগুলোকে যে সামাল দিলে, সে তো অবিশ্বাস্য।'

'ও কিছু না,' মুসার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর।

'শোনো,' কিশোরের হাত ধরে বলল ডায়না, 'আজ রাতে বাড়িতে একটা বিরাট পার্টি দিচ্ছি। তুমি এলে খুব খুশি হব।'

অযথাই কাশল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল, চোখে অস্বস্তি। সেটা নজরে পড়ে গেল ডায়নার। তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমার বন্ধুদেরও নিয়ে আসবে।'

মুহূর্তে চোখের আগুন নিভে গেল মুসার। চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল, 'আমি মুসা আমান।'

'খুশি হলাম,' ডায়না বলল। 'ও কে?'

'ওর নাম রবিন মিলফোর্ড,' কিশোর বলল।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে ডায়নাকে বলল কিশোর, 'এখনও কি আমি গাড়ি

চালাব? মুসা কিন্তু অনেক বেশি ভাল চালায়। তা ছাড়া গাড়িটাও ওর।'

'তা চালাক,' নিমরাজি হলো ডায়না। 'কিন্তু ও চালালে ভটভটানি কি কিছুটা কমবে?'

হাসি চাপতে পারল না রবিন।

কিশোর বলল, 'কি জানি, কমতেও পারে। হাজার হোক, ওর গাড়ি যখন, ওর কথা শুনতেও পারে। কি বলো, মুসা?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'সরি। আমি চালালে আওয়াজ বরং আরও বাড়বে। কিশোর গাড়িটার কাছে পর মানুষ, ওর সঙ্গে তো রাগ-ঝাল দেখাতে পারে না। তবে আমার সঙ্গে হরহামেশাই দেখায়।'

আঁতকে উঠল ডায়না। 'বলো কি! আরও বেশি শব্দ করবে! থাক বাবা, থাক। কিশোর, তুমিই চালাও।'

হাসিমুখে গিয়ে পেছনের সীটে উঠে বসল মুসা। পাশে রবিন। ব্রাউন নেই। ঠাসাঠাসি হলো না আর। আরামেই বসতে পারল।

*

'পার্টিটা নিশ্চয় দারুণ জমবে আজ!' বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল মুসা।

পায়ের মোজা খুলে কার্পেটে ছুঁড়ে ফেলল কিশোর। 'কি জানি। তোমার মত এতটা ভাবতে পারছি না।' তাক থেকে একটা পার্সোনালিটি ম্যাগাজিনের কপি নিয়ে এসে বিছানায় বসল।

'বললে বিশ্বাস করবে না,' বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল মুসা। 'যা-ই বলো, অত বড় বাড়ি কমই দেখেছি। বনের মধ্যে এ রকম বাড়ি বানিয়ে বসে আছে কেউ, কল্পনাই করতে পারিনি!'

'হুঁম্‌ম্! ছবি আছে এখানে।' পত্রিকাটা নাড়ল কিশোর। সেজন্যেই বের করলাম। 'তা ছাড়া আরও একটা জিনিসের কথা মনে পড়ল।'

কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের বেডরূমে কথা বলছে ওরা।

'কী?' কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকাল রবিন।

'মরগানদের আরেক সংগ্রহ–মারাত্মক বোরজিয়া ড্যাগার!' পত্রিকাটা উল্টে দেখাল কিশোর। 'এই দেখো হেডলাইন। ওটাও ছিল মিউজিয়ামে। রত্ন বসানো একটা ছুরি। চারশো বছর আগে ওটার প্রথম মালিক ছিল সেই নিষ্ঠুর ইটালিয়ান পরিবার, বোরজিয়ারা, নাম শুনেছ নিশ্চয়। গোঁড়া ধার্মিক ছিল ওরা, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল, সবচেয়ে বড় কথা, ওরা ছিল ভয়াবহ খুনী। শোনা যায়, ওদের এই ড্যাগারটা নাকি অভিশপ্ত।'

'কি অভিশাপ?'

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে, যেন ভয়াবহতা বোঝানোর জন্যেই ফিসফিসিয়ে বলল মুসা, 'ছুরিটা ছোঁয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যাবে ছুরির মালিক।'

*

অন্ধকারে ম্যানশনের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

প্রাসাদের ছাত থেকে উঠে গেছে চারটে মোচা আকৃতির মিনার, দুর্গের

টাওয়ারের মত। বিশাল গাড়িবারান্দাকে ঘিরে রেখেছে আঙুরলতা আর ফুলের বেড। চারদিকে যতদূর চোখ যায়, ছড়ানো লন গিয়ে মিশেছে বনের সঙ্গে। আর কোন বাড়িঘর চোখে পড়ে না। রাতের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে জোরাল বাজনার শব্দ। দোতলার মস্ত চারটে জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাইরে, ভোরের রোদের মত।

ইয়ার্ডের পিকআপটা পার্ক করে রেখে ভেতরে ঢুকল তিনজনে। মুসার গাড়িটা আনার সাহস পায়নি। প্রচণ্ড শব্দে পাড়া জাগিয়ে দিতে চায়নি। বলা যায় না, পার্টির লোকে খেপেও উঠতে পারে।

ঢুকেই যেন ধাক্কা খেলো মুসা, তার নীল সুট বেমানান লাগল তার নিজের কাছেই। দুই ধরনের মেহমান আছে পার্টিতে, পরনে দুই ধরনের পোশাক। একদলের পরনে অতিরিক্ত দামী টাক্সিডো আর ইভনিং গাউন, আরেক দলের পরনে সুট, তবে ওগুলোর দামও কম নয়। মুসারটা ওগুলোর কাছে কিছুই না। ফিটফাট পোশাক পরা, রগ বের হওয়া একজন লোক মেহমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে হলদে প্যাডে কি যেন লিখছে।

'খবরের কাগজের লোক হবে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'সোসাইটি কলামিস্ট।'

'আরি, কিশোর। এসে গেছ। এসো, এসো,' জোর গুঞ্জনকে ছাপিয়ে ভেসে এল ডায়নার কণ্ঠ। 'রবিন। মুসা। এসো তোমরা।'

অকারণেই হাসছে একঝাঁক লোক, তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল সে।

চমৎকার পোশাক পরেছে ডায়না। ঘরের এই পরিবেশে পরী মনে হচ্ছে তাকে। কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কালচে বাদামী চুলওয়ালা এক তরুণের কাছে। ছয় ফুটের ওপরে লম্বা। সিনেমার পর্দা থেকে নেমে এসেছে যেন।

'কিশোর···রবিন···মুসা,' পরিচয় করিয়ে দিল ডায়না। 'আর এ হলো ডিন রুজভেল্ট।'

'হাল্লো,' বলে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ডিন। ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। এত সাদা, চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায়।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ছোটখাট একজন মহিলা। সাদা চুল। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। তিন গোয়েন্দাকে যখন পরিচয় করিয়ে দিল ডায়না, মহিলার ভারী লেন্সের চশমার ওপাশে ঝিলমিল করে উঠল যেন ধূসর-সবুজ চোখ।

'আর ইনি হলেন,' মহিলার পরিচয় দিল ডায়না, 'ডক্টর নরিয়েমা ডিলারয়, আমার সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনজন। এই দুনিয়ার সবার চেয়ে বেশি চিনি আমি এঁকে।'

হাসার সময় কাঁধে ঝাঁকি লাগে ডক্টর ডিলারয়ের। 'ও আমার ব্যাপারে সব কিছুই খুব বাড়িয়ে বলে। ওয়েলকাম টু ক্লিফসাইড হাইটস। দিনের বেলা এসো একদিন। কি সুন্দর বাগান আছে ডায়নার, দেখবে।'

'আরেকটা পরিচয় আছে ইনার,' ডায়না বলল। 'ইনি আমার খালা, নরিখালা। চাকরি থেকে অর্ধেক অবসর নিয়েছেন বলা যায়। ক্লিফসাইড কান্ট্রি

ক্লাবে এখন পার্টটাইম কাজ করেন। বাকি সময় বাগানের যত্ন করেন। আমার বাগানেও, নিজের বাগানেও। ফুল গাছের পাগল।'

সৌজন্য দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চারপাশে তাকাল। বিশাল এক পারলারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। দেয়ালে ঝোলানো অসংখ্য ছবি, সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই, ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। এককোণে বুককেস আর সাইডবোর্ডের মাঝের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক যোদ্ধার একটা মার্বেলে তৈরি বিশাল মূর্তি।

এই সময় দরজার ঘণ্টা বাজল।

'জিন, রান্নাঘর থেকে আরও কয়েকটা কাপ নিয়ে এসো, প্লীজ,' ডায়না বলল। তারপর 'এক্সকিউজ মি,' বলে দরজা খুলতে এগোল।

'কালেকশনগুলো দেখলে এসো,' তিন গোয়েন্দাকে আমন্ত্রণ জানালেন নরিয়েমা। 'ডায়নাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, এগুলো এখানে রাখা ঠিক না, মিউজিয়ামেই ভাল। তবে এখানে যতক্ষণ আছে দেখতে অসুবিধে নেই। এসো।'

ঘরের মাঝখান থেকে শুরু করে মার্বেলের মূর্তিটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা টেনিস কোর্টের সমান খাবার টেবিল। সেটার দিকে লোলুপ নয়নে একবার তাকিয়ে নরিয়েমার সঙ্গে পুরানো সাইডবোর্ডটার দিকে এগোল মুসা।

খোদাই করা কাঠের বেদির ওপর রাখা হয়েছে একটা কাঁচের বাক্স। ওটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার জ্যাকেট পরা দু'জন তরুণ আর একজন তরুণী।

'এক্সকিউজ মি, নেলি,' মেয়েটাকে বললেন ডক্টর।

সরে দাঁড়াল তিনজনেই।

এগিয়ে গিয়ে আঙুল তুলে বাক্সের ভেতরটা দেখালেন তিনি। ভেতরে বেগুনী মখমলের গদির ওপর শুয়ে আছে চমৎকার একটা ছুরি। লম্বা ফলা, আর মূল্যবান পাথর বসানো সোনার বাঁট ঝকঝক করছে উজ্জ্বল আলোয়।

'মরগান কালেকশনের সবচেয়ে বিখ্যাত জিনিস এটা,' নরিয়েমা জানালেন। 'বোরজিয়া ড্যাগার। নিশ্চয় নাম শুনেছ।'

'ও, এটাই? সাংঘাতিক!' বলে বাক্সের ডালা তুলে ছুরিটা বের করে আনল নেলি।

হঠাৎ গমগম করে উঠল আরেকটা কণ্ঠ, 'বলেছিলাম না, এই রকমই করবে! করছে কি দেখো না! খেলনা ভেবেছে এত দামী দুর্লভ জিনিসগুলোকে!'

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ছুটে আসছে জুভেনার, পেছনে ডায়না। নেলির হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে আগের জায়গায় রেখে দিল কিউরেটর।

'বাধা দিয়ে তখন অন্যায় করেছি, মিস মরগান,' জুভেনার বলল। 'ভাবলাম, যাই। গিয়ে মাপ চেয়ে, শান্ত ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাকে, যে এ সব জিনিস ঘরে রাখা ঠিক নয়।' ইশারায় ছুরিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাম কল্পনা করতে পারেন ওটার?'

মিষ্টি হাসল ডায়না। 'নিশ্চয়ই।' ছুরিটা বের করে হাতে নিল সে। ফলাটা ওপরের দিকে তুলে ধরে ওটা নিয়ে এগোল খাবার টেবিলের দিকে, মেহমানরা যেখানে রয়েছে। চোখের পলকে থেমে গেল গুঞ্জন। একেবারে চুপ সবাই, ফিসফিসানিটুকুও নেই।

স্তব্ধতা ভাঙতে ভয় লাগছে যেন, এমনি ভঙ্গিতে খুব নরম গলায় বলল এক তরুণ, 'ডায়না, অভিশাপের কথা ভুলে গেছ! ওটার মালিক...'

ঝটকা দিয়ে পেছনে মাথা কাত করে ফেলল ডায়না, নেচে উঠল লাল চুল। হা-হা করে হাসল সে। জুভেনারের দিকে ফিরে ছুরিটা তার বুকে বসিয়ে দেয়ার ভান করে বলল, 'জুভেনার, খুব খিদে পেয়েছে মনে হয়? দেব খাইয়ে?'

সাদা হয়ে গেল কিউরেটরের মুখ।

ছুরি দিয়ে এক টুকরো পনির কাটল ডায়না। সেটাকে ছুরির মাথায় গেঁথে বাড়িয়ে দিল জুভেনারের দিকে। মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

আধ সেকেন্ড পর দপ করে নিবে গেল ঘরের সমস্ত বাতি। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল বাজনা। নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে পার্টির সব লোক, যেন কোনদিনই আর ফেলতে পারবে না।

অন্ধকারে ধড়াস করে পড়ে গেল কি যেন!

তারপরেই শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার!

ডায়নার!

চার

আবার আলো জ্বলল। দেখা গেল, মার্বেলের মূর্তিটা ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে। সাইডবোর্ডের খানিকটা ভাঙা। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচের টুকরো।

সাইডবোর্ডের নিচে জবুথুবু হয়ে বসে আছে ডায়না। চেহারা সাদা। হাতে ধরে রেখেছে এখনও ছুরিটা।

তার পাশে গিয়ে বসল কিশোর, মুসা আর ডক্টর নরিয়েমা।

'লেগেছে কোথাও?' ডায়নাকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

মূর্তির টুকরোগুলোর কাছে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে জুভেনার 'গেল তো তেইশশো বছরের পুরানো...' গলা ধরে এল তার। মূর্তির শোকে চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে।

ভয় পেয়ে গেছে ডায়না। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল। ফুঁপিয়ে উঠে হাত থেকে ছেড়ে দিল ছুরিটা। তারপর লাফিয়ে উঠে এসে আঁকড়ে ধরল কিশোরের হাত, 'আরেকটু হলেই মারা গেছিলাম আজ!'

গুঞ্জন করে উঠল মেহমানরা।

গলায় সহানুভূতি ঢেলে কিশোর বলল, 'কিছুই হয়নি আপনার। আসুন। বসুন এখানে।'

একটা সোফায় প্রায় জোর করে ডায়নাকে বসিয়ে দিল সে। তারপর চারপাশে তাকাতে লাগল। অস্বস্তি বোধ করছে।

'এই যে, কি হয়েছে?' ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

চোখ তুলে কিশোর দেখল, ডিন কথা বলছে। দাঁত বের করা সেই ঝকঝকে হাসিটা উধাও, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে।

'অ্যাক্সিডেন্ট,' কিশোর জবাব দিল।

'কিছুই বুঝতে পারছি না, ডিন,' ডায়না বলল। 'আলো নিবে গেল। কে যেন ফেলে দিল রোমান মূর্তিটা...'

'রোমান না, গ্রীক!' শুধরে দিল জুভেনার। মূর্তি ভাঙার কষ্ট সইতে না পেরে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মেঝেতেই বসে পড়েছে।

ছুরিটা তুলে নিয়ে গিয়ে আবার কাঁচের বাক্সে ভরে রাখল রবিন।

একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন নরিয়েমা। ডায়নার পাশে বসে তার কপালে চেপে ধরলেন। তাদেরকে ঘিরে দাঁড়াল মেহমানেরা।

ডায়নার হাত ধরে স্নেহের হাসি হেসে কোমল গলায় ডক্টর বললেন, 'দেখো, ভয়ের কিছু নেই। কুসংস্কার বিশ্বাস করা উচিত না। ওসব অভিশাপ-টভিশাপ সব ফালতু।' মেহমানদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আবার। 'কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করে বসে আছে দেখছি।'

ঢোক গিলল ডায়না। ভুরুর ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। 'অভিশাপের কথা জানো তুমি, নরিখালা?'

'ওসব চিন্তার দরকার নেই এখন।'

'প্লীজ, খালা, আমি ভয় পাব না। তুমি বলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নরিয়েমা। 'বেশ, শুনতেই যখন চাও...' সোফায় হেলান দিলেন তিনি। চুপচাপ ভাবছেন যেন কোথা থেকে শুরু করবেন। আরও কাছে ঘেঁষে এল মেহমানেরা।

'কুসংস্কার বিশ্বাস করলে এই গল্প শুনে ভয়ই পাবে মানুষ,' বলতে শুরু করলেন ডক্টর। 'ষোলোশো শতকে ইটালির অত্যন্ত ধনী আর ক্ষমতাশালী পরিবার ছিল বোরজিয়ারা। তাদের কয়েকজন তো ছিল ভয়াবহ, প্রায় উন্মাদ।' আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি। 'ইতিহাস অবশ্য স্বীকার করে না সে-কথা। তবে লোকের মুখ তো আর বন্ধ থাকে না। গুজব ছড়ায়ও বেশি, এবং রঙ ছড়িয়ে। কিংবদন্তী আছে, বোরজিয়াদের যে লোকটার নাম শুনলেই কেঁপে উঠত লোকে, তার নাম আরমান্ডো বোরজিয়া। ডিউকের ভাইপো ছিল বেসমেন্টে চমৎকার একটা কালেকশন ছিল তার, স্টাফ করা মানব-দেহের কালেকশন।'

মুসা লক্ষ করল, কেঁপে উঠেছে ডায়না।

ডায়নার কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিলেন ডক্টর, 'এমন করছ কেন? এটা নিছকই গল্প, একটা হরর স্টোরি আরকি, আর কিছু না। ঠিক আছে, ভয়ই যখন পাচ্ছ, আর বলব না।'

'না না, বলো! আমি ভয় পাব না

ডায়নার চেহারার ভয় ভয় ভাব চোখ এড়াল না মুসার। বুঝতে পারল, গল্পটা চলতে থাকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে মেয়েটা।

ব্যাপারটা নরিয়েমাও লক্ষ করলেন। বললেন, 'অনেক সময় ভয়ের গল্প পুরোটা শুনে ফেললে ভয় কেটে যায়। বলেই ফেলি।'

'হ্যাঁ, বলো তুমি,' ডায়না বলল। 'আমি ভয় পাব না।'

আবার গল্প বলতে লাগলেন ডক্টর, 'বলা হয়, আরমান্ডো বোরজিয়া ছিল

ইটালির সবচেয়ে নিষ্ঠুর জমিদার। এমন ভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দিত গরীব প্রজাদের ওপর, সেটা শোধ করতেই হিমশিম খেয়ে যেত তারা। কোনদিনই পুরোপুরি শোধ করতে পারত না। বিয়ে করেছিল অনেকগুলো। যতক্ষণ ভাল লাগত, রাখত। অপছন্দ হলেই ঘাড় ধরে বের করে দিত রাস্তায়। এমনকি তখনকার বিখ্যাত সুন্দরী ম্যারিজল অ্যালেগ্রার বরাতেও এইই জুটেছিল…'

'ছুরিটার কথা বলো, খালা। এ সব শুনতে ভাল লাগে না।'

'হ্যাঁ, বলছি। নিজের প্রাসাদ আর বাগানের বাইরে খুব কমই বেরোত আরমান্ডো। একদিন বেরিয়ে ভীষণ চমকে গেল। রাস্তায় শুধু ভিখিরি আর ভিখিরি। এক সময় ভালই ছিল লোকগুলো, জমিজমা ছিল, ওদেরকে পথে নামতে বাধ্য করেছে আরমান্ডোই, এ কথা জানা ছিল না তার। জানার চেষ্টাও অবশ্য করল না। তার কাছে মনে হলো ওগুলো শুধুই জঞ্জাল, মানব-জঞ্জাল।'

'মেরে ফেলল?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ডায়না।

'সব ক'জনকে, এক এক করে। ওদেরকে প্রাসাদে দাওয়াত দিল সে। গোসল করতে দিল, পেট ভরে খাওয়াল। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে চোখে পানি এসে গেল ওদের। তারপর ওদেরকে মদের ভাঁড়ার দেখার দাওয়াত দিল আরমান্ডো। দেখতে নামল ওরা, কিন্তু একজনও উঠতে পারল না আর। শোনা যায়, প্রত্যেকটা মানুষকে আরমান্ডো খুন করেছে একটা রত্নখচিত ছোরা দিয়ে। হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়েছে ছুরি। লাশগুলো ফেলে রেখেছে মাটির নিচের ঘরে। সাতদিন পর একটামাত্র কবরে দাফন করা হয়েছিল ওগুলো।'

চোখের কোণ দিয়ে কিশোর দেখল, ঝড়ের গতিতে হলুদ প্যাডে লিখে যাচ্ছে সোসাইটি কলামিস্ট।

'বাইরের কেউ কিছু জানল না,' বলে গেলেন ডক্টর নরিয়েমা। 'তবে সবাই একদিন দেখল, রাস্তা ভিখিরি মুক্ত হয়ে গেছে। একজনও নেই।'

হঠাৎ খাদে নেমে গেল ডক্টরের কণ্ঠ। শ্রোতারা ভালমত শোনার জন্যে আরও কাছে সরে এল।

'একরাতে তন্দ্রা লেগেছে আরমান্ডোর। তার দরজা খুলে গেল। সে ভাবল, চাকর। ঘুমের ঘোরেই গাল দিয়ে পাশ ফিরল সে। কিন্তু চাকর নয়। মাটির নিচের ঘরে নিয়ে যাওয়া এক ভিখিরি। ছুরিটা তার হৃৎপিণ্ডে লাগেনি, ফলে মরেনি সে। একে জখম, তার ওপর না খেয়ে খেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। তবু শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে কোনমতে উঠে এসেছে ভাঁড়ার থেকে। রক্তমাখা ছুরিটা ফেলে এসেছিল আরমান্ডো, সেটা তুলে নিয়ে এসেছে ভিখিরি।'

'কিন্তু আরমান্ডোর বেডরূম চিনল কি করে, খালা?' ডায়নার প্রশ্ন। 'প্রাসাদটা নিশ্চয় অনেক বড় ছিল, আর অনেক ঘর ছিল…'

'ছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো চিনত না। কিন্তু ভিখিরি আসলে ভিখারিনী। ম্যারিজল। আরমান্ডোর ত্যাগ করা স্ত্রীদের একজন। রাস্তায় থেকে থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। চেহারা শরীর সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আরমান্ডোও চিনতে পারেনি তাকে ছুরি মারার সময়। জানালা দিয়ে তখন চাঁদের আলো আসছে। ছুরি মারার সময় আরমান্ডোর নাম ধরে এত জোরে গাল দিয়েছিল

ম্যারিজল, লোকে বলে, সেই শব্দে জানালার কাঁচ নাকি চুরচুর হয়ে গিয়েছিল।'

পারলারে স্তব্ধ নীরবতা। থমথমে পরিবেশ। সবাই যেন শুনতে পাচ্ছে নিজেদের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি।

'চাকরেরা এসে দেখল,' নরিয়েমা বললেন, 'বিছানায় পড়ে আছে দুটো লাশ। মরার আগে নিজের নিয়তি বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়েছিল আরমান্ডো। বড় বড় হয়ে গিয়েছিল চোখ। তার কপালে ছুরি দিয়ে কেটে একটা অক্ষর, 'বি' লিখে দিযেছিল ম্যারিজল। 'বি' বোরজিয়ার নামের আদ্যক্ষর। নাকি ব্যাড বোঝাতে চেয়েছিল সে-ই জানে। এরপর থেকেই গুজব রটে যায়, ওই ছুরিটার মালিক যে-ই হবে, ছোঁয়ার চার মাসের মধ্যেই অপঘাতে মৃত্যু হবে তার।'

শ্রাগ করলেন ডক্টর। ফিক করে ছোট্ট একটা হাসি দিলেন। 'আরে, মুখ অমন করে কেন রেখেছ তোমরা? এ-তো একটা গল্প। সত্যি না-ও হতে পারে। আর অভিশাপের কথা যে ঠিক নয়, তার তো প্রমাণই রয়েছে। কত দিন ধরে মিউজিয়ামে রইল ছুরিটা, কিন্তু কই, মালিক তো মরল না। কি বলেন, জুভেনার?'

টেনেটুনে টাইয়ের নট ঢিলে করল কিউরেটর। আমতা আমতা করে বলল, 'সত্যি কথাটাই বলি। মিউজিয়ামে থাকার সময় কেউ ওটা ছুঁতে সাহস করেনি।'

*

মেহমানদের যাবার সময় হলো।

ডায়না বলল, 'নরিখালা, গেস্টদের এগিয়ে দিয়ে এসো, প্লীজ। আমি এখানেই থাকি। শরীরটা ভাল্লাগছে না!'

'নিশ্চয়ই,' ডক্টর নরিয়েমা বললেন। 'এত ভয় কেন? কিচ্ছু হবে না, দেখো। সব ফালতু কথা।'

'আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকি?' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। 'সাহায্য-টাহায্য লাগতে পারে।'

আড়চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা করল, ওদের মনোভাবটা কি। মুখ দেখেই বুঝল, সম্মতি আছে।

ডায়নাও আপত্তি করল না।

মেহমানদের মধ্যে প্রথম যে মানুষটা বেরিয়ে গেল, সে কিউরেটর জুভেনার। রাগে, ক্ষোভে গটমট করে চলে গেল সে। তারপর একে একে গেল অন্যেরা। সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ডক্টর নরিয়েমা, ডায়নার হয়ে 'গুডবাই' জানাচ্ছেন সবাইকে।

পার্টিতে কাজ করার জন্যে ভাড়া করে লোক আনা হয়েছে। ওদেরকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। টেবিল থেকে সমস্ত বাসন-কোসন সরাতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না। সোফাতেই গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ডায়না। অভিশাপের ভয়ে কাবু হয়ে গেছে। তাকে বিরক্ত করল না গোয়েন্দারা। বেরিয়ে এল বারান্দায়।

'কি ভাবে থাকা যায় এখানে বলো তো?' কিশোর বলল। 'খানসামা-টানসামা হয়ে যাব নাকি?'

মুসা বলল, 'থাকাটা কি ঠিক হবে? ছুরির গল্পটা শুনলে না! রোম খাড়া করে দেয়!'

'আমার কাছে যেন কেমন কেমন লাগছে!' কিশোর বলল।

'জুভেনারের কথা বলছ?' রবিনের প্রশ্ন। 'ও এখানে আসার আগে কিন্তু সব ঠিকঠাকই ছিল।'

'হ্যাঁ। আর ডায়না এত ভয় পাচ্ছে দেখেও গল্পটা চালিয়েই গেলেন ডক্টর নরিয়েমা। থেমে যাওয়া উচিত ছিল। না বললেও পারতেন।'

'একবার ভেবেছি, নিষেধ করি বলতে...' থেমে গেল মুসা। তাকিয়ে রয়েছে বাড়ির পাশের দিকে।

'কি হলো?'

'শ্‌শ্‌শ্‌! সার্ভেন্টস কটেজ!'

ঘুরে তাকাল কিশোর। কটেজের জানালা গলে কালো পোশাক পরা একটা মূর্তিকে নামতে দেখল। 'বাড়ির সামনের দিকে যাচ্ছে,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'চলো, চমকে দিই।'

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল তিনজনে। ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। লুকিয়ে পড়ল একটার ভেতরে।

'আমাদের দেখল নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'বোঝা যাবে এখুনি।'

বোঝা গেল। হঠাৎ বরফের মত জমে গেল তিন গোয়েন্দা।

ঠিক ওদের মাথার পেছনে ধরা একটা সিলভার-প্লেটেড রিভলভারের নল।

'বেরিয়ে এসো,' মোলায়েম গলায় আদেশ হলো। ছায়ার কাছ থেকে সরে গেল লোকটা, কিন্তু রিভলভার উদ্যতই রয়েছে। ট্রিগার ছুঁয়ে আছে আঙুল। বার্ব এনুডা।

পাঁচ

'গুলি করার দরকার নেই,' হাত তুলে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মুসা।

'সাহস আছে তোমাদের,' বলল এনুডা। 'তবে একটা উপদেশ মনে রাখবে। এ কথা যেন ডায়না না শোনে...'

'কে ওখানে?' সিঁড়ির ওপর থেকে জিজ্ঞেস করল ডায়না। 'বার্ব, করছ কি? ওটা নামাও!'

'না, নামাব না! তোমার সব কথাই মানতে হবে নাকি?'

ডায়নার পাশে এসে দাঁড়াল ডিন। এনুডার হাতে রিভলভার দেখে ভয় দেখা দিল চোখে। 'এই, সরাও, সরাও ওটা!'

'খবরদার! ওভাবে কথা বলবে না আমার সঙ্গে! ডায়না...'

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, বার্ব,' কোমল কণ্ঠে বলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ডায়না। হাত বাড়িয়ে দিল। 'দাও। নইলে আবার পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। এবার কিন্তু আর বাঁচাতে পারব না। বেআইনী ভাবে ঢুকে চুরির দায়ে হাজতে ঢোকাবে।'

'চুরি!' চমকে গেল এনুডা। 'এটা তোমার আব্বা আমাকে দিয়েছেন, তুমি জানো। এখানে ফেলে গিয়েছিলাম। আমার জিনিস আমি নিতে এসেছি, একে কি চুরি বলে?' হঠাৎ নাটকীয় ভাবে নলটা নিজের মাথায় ঠেসে ধরল সে। 'থাক, আর কাউকে মরতে হবে না, আমিই মরব। এইবার আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না কেউ...'

'মরতে চাইলে কিছু গুলি কিনে আনতে হবে তোমাকে।' আশ্চর্য শান্ত ডায়নার কণ্ঠ। 'আব্বা এটা তোমাকে দিয়েছিলেন চোর-ছ্যাঁচোড়কে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যে। গুলি ভরে দেননি, আমি জানি। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এটা তোমাকে একেবারে দিয়ে দেননি আব্বা। আর আব্বার জিনিস মানেই আমার জিনিস। পুলিশের সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক ভাল না। কাজেই বুঝতেই পারছ,' হাতের তালু মেলে ধরল ডায়না। 'প্লীজ!'

চঞ্চল হয়ে উঠল এনুডার চোখের তারা।

'দিয়ে, ভাগো এখান থেকে,' সিঁড়ির গোড়ায় ডায়নার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিন। 'গিয়ে ঘুমাও। বিশ্রাম দরকার তোমার।'

নেহায়েত নিরুপায় হয়েই যেন অস্ত্রটা নামাল এনুডা। 'বেশ,' গলা কাঁপছে তার, 'জাহান্নামেই ফিরে যাচ্ছি আমি! বাড়ি তো না, নরক! গুলি খেয়ে নাহয় নাই মরলাম। মরার আরও পথ আছে। শুয়ে শুয়ে গিয়ে সেই উপায়ই ভেবে বের করব এখন।'

যেন ছবিতে অভিনয় করছে, এমন ভঙ্গিতে রিভলভারটা ডায়নার ছড়ানো তালুতে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এনুডা। লম্বা লম্বা কদমে হাঁটতে শুরু করল ড্রাইভওয়ে ধরে।

সে চোখের আড়ালে চলে গেলে ডায়নাকে বলল কিশোর, 'একা থাকতে আপনার অসুবিধে হবে না তো? আমরা...'

'একা থাকছে না ও,' বাধা দিয়ে বলল ডিন। 'আজ রাতে যাচ্ছি না। আমি থাকছি, ডক্টর নরিয়েমা থাকবেন। কাল যাতে সারাদিন ক্লাবে গিয়ে মন ভাল করতে পারে ডায়না, সেই ব্যবস্থাও করব। ওর কোন অসুবিধে হবে না।'

'বেশ,' বলে দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। 'এসো, যাই। গুড নাইট, ডায়না। দাওয়াতের জন্যে ধন্যবাদ।'

'এসেছ, খুশি হয়েছি। সময় পেলে আবার এসো। যে কোন সময়।'

পিকআপে এসে উঠল ওরা।

কিশোর বলল, '*যে কোন সময় এসো* কথাটা কি সত্যি সত্যি বলল? নাকি কথার কথা?'

'কিছু একটা ভাবছ তুমি,' রবিন বলল। 'কি, বলো তো?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'বড় ধরনের কোন একটা গোলমাল ঘটছে এখানে। গোলমালটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চলতে শুরু করেছে গাড়ি। মুসা চালাচ্ছে। সামনের পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিকই বলেছ। এনুডাকেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে। তার পাগলামিটা অভিনয়ও হতে পারে।'

'হ্যাঁ। ফিউজ বক্সটা কোথায় আছে, তার জানার কথা। আলো নেভাতে অসুবিধে হবে না তার। আর রিভলভার নিতে এসেছে রাতের বেলা চুরি করে, এটাও খোঁড়া যুক্তি মনে হয়েছে আমার।'

'তবে সে একলা পারেনি, দু'জনের দরকার। সে যদি আলো নিভিয়ে থাকে, মূর্তিটা ঠেলে ফেলেছে আরেকজন। আরেকজন কে, বোধহয় আন্দাজ করতে পারি...'

'জুভেনার!' বলে উঠল রবিন।

পথে আর কথাবার্তা তেমন হলো না। মুসা নীরবে গাড়ি চালাল, আর চুপচাপ বসে বসে ভাবল কিশোর। রবিন পেছনের সীটে বসে চিলতে একটুকরো ঘুম দিয়ে নিল।

কিশোর ভাবল, শুধু ডায়নাকে ভয় দেখানোর জন্যেই ওরকম একটা দুর্লভ মূর্তি ভেঙে ফেলল জুভেনারের মত অ্যানটিক-পাগল একজন মানুষ? আর যদি এনুডার কাজই হয়ে থাকে, কাজ সেরেই পালাল না কেন সে, দেখা দেয়ার জন্যে কেন বসে থাকল?

আরও অনেক প্রশ্ন জাগল তার মনে। জবাব মিলল না কোনটারই। ভাবছে মুসাও। দু'জনের ভাবনার মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল রয়েছেঃ সেটা হলো, বোরজিয়া ড্যাগারের অভিশপ্ততার কাহিনী কি শুধুই গল্প? না কিছুটা সত্য রয়েছে এর মধ্যে?

*

'কিশোর, ওই ডক্টর মহিলাকেও কিন্তু খুব একটা সুবিধের লাগেনি আমার। এত কথা বলতে গেল কেন?' রবিন বলল কিশোরকে।

ফ্রিজ থেকে খাবার বের করছে কিশোর। স্যান্ডউইচ। ফলের রস।

কথা হচ্ছে কিশোরদের বাড়িতে। পরদিন সকালে। খাবার বের করে নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে এসে বসল কিশোর। রবিনের প্রশ্নের জবাব দিতে যাবে, এই সময় ঘরে ঢুকল মুসা। 'শুরু করে দিয়েছ দেখি তোমরা। দেরি করে ফেললাম না তো? খাওয়ার আগে, না পরে?'

'ঠিক সময়েই এসেছ। এসো, বসে পড়ো,' কিশোর বলল।

'তা জরুরী তলব কেন?' চেয়ারে বসতে বসতে বলল মুসা।

'যাব এক জায়গায়।'

'কোথায়? আবার ডায়নার ওখানে?'

'নাহ্, ভাবছি মিউজিয়ামে যাব।'

সরু হয়ে এল মুসার চোখের পাতা। 'কি দেখতে যাবে? অ, বুঝেছি। জুভেনারের সঙ্গে কথা বলতে। দেখো কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না। কেস আমরা অনেক পাব ভবিষ্যতে। কিন্তু অভিশপ্ত ওই ছুরির কুদৃষ্টিতে না পড়লেই কি নয়?'

'অভিশপ্ত বলেই তো তদন্তটা আরও বেশি করে করব। দেখব, সত্যি সত্যি অভিশাপ বলে কিছু আছে কিনা।'

*

মিনিট কয়েক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর আর মুসা ইয়ার্ডের একটা পিকআপে উঠল।

রবিন ওদের সঙ্গে যাবে না। সে বাড়ি যাবে। জরুরী কাজ আছে। সে গেটের দিকে এগোল।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। পাশে বসা কিশোরের দিকে তাকাল। 'আগে কোথায় যাব?'

'রকি বীচ মিউজিয়াম।'

গাড়িটা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানাল রবিন।

*

মিউজিয়ামের কাছাকাছি এসে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ল ওদের, তা হলো পার্কিং লট প্রায় শূন্য।

'রোববারে তো খোলাই থাকে, তাই না?' মুসার প্রশ্ন।

'থাকে।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'এগারোটা তিরিশ। এখন লোকের কাজের সময়।'

ভ্যান থামাল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে মিউজিয়ামে ঢুকল দু'জনে। টিকিট কেটে এসে ঢুকল মেইন এক্জিবিট রুমে।

ঢুকেই বুঝতে পারল জুভেনারের এতখানি মর্মপীড়ার কারণ। দেয়ালগুলো প্রায় শূন্য। বড় বড় ছবি ঝোলানো ছিল ওসব জায়গায়, দাগ দেখেই বোঝা যায়। অসংখ্য কাঁচের বাক্স খালি পড়ে রয়েছে। এক কোণে আরামে চেয়ারে বসে দিবানিদ্রা দিচ্ছে মিউজিয়ামের দারোয়ান।

'কবরও তো এর চেয়ে ভাল!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

'জিনিস নেই, কে আসবে পয়সা খরচ করে? মরগানদের কালেকশনগুলোই ছিল এই মিউজিয়ামের মেরুদণ্ড।'

ওদের পেছনে হলওয়েতে পদশব্দ শোনা গেল।

'বাড়ি চলে যাও, নিরো,' বলে উঠল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

চমকে জেগে গেল দারোয়ান।

'বসে থেকে আর কি করবে। ভাবছি, বন্ধই করে দেব...' কিশোর-মুসার ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল কিউরেটর। 'আরি, দর্শক আছে দেখছি! অন্তত আজকের ইলেকট্রিক বিলের পয়সাটা পাওয়া গেল। কেন এসেছ তোমরা? মিউজিয়াম দেখতে? নাকি ডায়না পাঠিয়েছে? আবার কিছু নষ্ট করেছে?'

'মূর্তিটার জন্যে সত্যিই খারাপ লাগছে, মিস্টার জুভেনার,' সহানুভূতি দেখিয়ে বলল কিশোর। 'আমরা এসেছি আসলে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই।'

'আমার সঙ্গে দেখা করে আর কি হবে!' চুপ হয়ে গেছে জুভেনার। একবার কিশোরের দিকে, আরেকবার মুসার দিকে তাকাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে কিছু। অবশেষে হাত নাড়ল, 'এসো। বরং আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি।'

হল পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। চৌকাঠের ওপরে সাদা প্লাস্টিকের ফলকে লেখা: **অথরাইজড পার্সনস ওনলি**।

ভেতরে মস্ত অফিস, ছয়টা ডেস্ক। ঘরের অন্য প্রান্তে ওদেরকে নিয়ে এল

জুভেনার। আরেকটা দরজা পড়ল, পুরোটাই কাঁচের। তার ওপাশে কয়েকটা আলাদা আলাদা অফিস, প্রতি রূমে একজন করে বসার ব্যবস্থা।

নিজের অফিসে ঢুকল জুভেনার। কিশোররা ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল। জানালার পর্দা টেনে দিল।

'বসো। তা তোমাদের কথাটা আগে বলো। কি জানতে চাও?'

'প্রথমেই আপনার মিউজিয়ামটার কথা বলুন,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর।

ডেস্কে কনুই রেখে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল জুভেনার। 'দেখো, সোজা করেই বলি। মিউজিয়ামের এখন সময় খুবই খারাপ। টেকে কিনা সন্দেহ। জিনিসগুলো ফেরত না পেলে লোকে দেখতে আসবে না। নেইই কিছু, কি দেখতে আসবে? লোক না এলে বিগড়ে বসবে কোম্পানি আর এজেন্সিগুলো, আমাদেরকে ফান্ড দিতে চাইবে না আর। কতবড় সর্বনাশ হয়ে যাবে ভাবো! আর এর সব কিছুর মূলে ওই ডায়না মরগান। বেআইনী ভাবে জিনিসগুলো জোর করে নিয়ে গেছে সে।'

'দলিলটা খুঁজে বের করতে বলেন আমাদেরকে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না,' চেয়ারে হেলান দিল জুভেনার। 'লোক লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পাবে কিনা জানি না। আমার ভয় হচ্ছে, একেবারেই হারিয়ে গেছে ওটা, কিংবা নষ্ট হয়ে গেছে। ফেরত পাব না।' চুপ করে থাকল এক মুহূর্ত। 'অন্য কথা ভাবছি আমি। তোমরা তো ডায়নার বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তবে পরিচয়টা নতুন হয়েছে।'

'নতুন হলেও তোমাদেরকে বেশ গুরুত্ব দেয় ডায়না, দেখেই বুঝেছি আমি। তোমাদেরকে একটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ করব আমি।' ডেস্কের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলল কিউরেটর। 'মিউজিয়ামের একটা ইমারজেন্সী ফান্ড আছে। খুব অল্পই টাকা। কয়েক বছর ধরে তিল তিল করে জমানো হয়েছে। এতদিন ওটা থেকে খরচের দরকার পড়েনি কখনও। এই টাকাটা আমি তোমাদের দিয়ে দেব। বিনিময়ে তোমরা ডায়নাকে বোঝাবে কালেকশনগুলো আবার মিউজিয়ামকে ফেরত দিতে। কি করে বোঝাবে জানি না আমি, কিন্তু বোঝাবে।'

ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করল সে। বেশ পুরু। মুখ খুলে উপুড় করল ডেস্কের ওপর। ঝরে পড়ল অনেকগুলো কড়কড়ে একশো ডলারের নোট।

'দশ হাজার ডলার আছে এখানে। আমার কাজটা করে দাও। এগুলো সব তোমাদের হবে।'

ছয়

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

তারপর কথা বলল কিশোর, 'দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে, আপনি বলছেন ডায়নার সঙ্গে কথা বলব আমরা। দরকার হলে তার বাড়িতে থাকব। একসঙ্গে

বসে খাবার খাব। তাকে বোঝাব কালেকশনগুলো ফেরত দিতে।'

'হ্যাঁ,' হাসল জুভেনার।

'তারমানে ঘুস দিচ্ছেন।'

'ঘুস ভাবছ কেন? বরং ভাবো না, তোমরা একটা কাজ করে দিয়ে টাকাটা কামিয়ে নিচ্ছ।'

চেয়ারে হেলান দিল দু'জনেই। কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি বুঝলে?'

'যা বোঝার বুঝলাম,' কিশোর বলল।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল জুভেনার। ওদের কথাবার্তার মানে বুঝতে পারছে না। 'দেখো, দশ হাজার ডলার অনেক টাকা, অনেক কিছু কিনতে পারবে তোমরা। এই বয়েসে কত কিছুই তো কিনতে ইচ্ছে করে।' দু'জনের মুখের দিকে তাকাল একবার করে। 'তোমাদের বয়েসে আমি হলে এক লাফে রাজি হয়ে যেতাম।'

'কিন্তু আমরা ওরকম লাফাতে রাজি নই,' জবাব দিয়ে দিল কিশোর।

'বুঝেছি, আরও বেশি চাও!' রেগে গেল জুভেনার। থাবা মারল ডেস্কে। 'এত্তো লোভ! ওই মেয়েটার মতই চামার! সব এক! কি ভেবেছ এটাকে? ব্যাংক...'

'আপনি ভুল করছেন,' আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। 'দশ হাজার অনেক টাকা। কিন্তু ঘুস দিয়ে কিনতে পারবেন না আমাদের। মানুষের জন্যে কাজ আমরা করি, তবে অন্য ভাবে।'

'কোন্ ভাবে শুনি?'

'আর যে ভাবেই হোক, বেআইনী ভাবে নয়।'

'কোনটাকে বেআইনী বলছ?' মুসার দিকে আঙুল তুলে বাতাসে খোঁচা মারল জুভেনার। 'ডায়না যে কাজটা করল, সেটা বেআইনী নয়?'

'আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি আমরা, মিস্টার জুভেনার,' কিশোর বলল। 'বুঝি, কালেকশনগুলোর কোন দরকার নেই ডায়নার। কিন্তু মিউজিয়ামের আছে। আমি সত্যিই চাই, দলিলটা আপনি পেয়ে যান। আর যদি না পান, আদালতে গিয়ে নালিশ করুন...'

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল জুভেনার। 'বেরোও!' দরজা দেখাল সে। 'ভাগো! আর যেন এখানে না দেখি! আমাকে উপদেশ দিতে আসো! মাসের পর মাস ধরে শুধু আদালতে যেতে থাকি আর আসতে থাকি আমি। আর ওদিকে সব ভেঙেচুরে জিনিসগুলোর সর্বনাশ করে দিক মাথামোটা মেয়েটা। পাগল!'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

পেছনে এত জোরে দরজা বন্ধ করল জুভেনার, শব্দ শুনে মনে হলো বন্দুকের গুলি ফাটল।

*

'এসে কোন লাভ হলো না, তাই না?' মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বলল মুসা। একসারি নিউজপেপার ভেনডিং মেশিনের পাশ দিয়ে চলেছে। 'ঘুস দিতে চায় আমাদেরকে! মরিয়া হয়ে গেছে লোকটা!'

কয়েকটা খুচরো পয়সা মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা রকি বীচ টাইমস-এর

কপি বের করে নিল কিশোর। 'লোকটা ছ্যাঁচড়া!'

'কিন্তু খুন পর্যন্ত কি এগোবে? এত প্রিয় যে সব জিনিস, তারই একটা ভেঙে ফেলবে খুন করার জন্যে? ভাঙা মূর্তিটাকে দেখে তার মুখের কি অবস্থা হয়েছিল লক্ষ করেছ?'

'সেটা অভিনয়ও হতে পারে। নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে করে থাকতে পারে কাজটা। ডায়নাকে আতঙ্কিত করে দিয়ে জিনিসগুলো ফেরত নেয়ার চেষ্টা হতে পারে। আর যদি মূর্তি গায়ে পড়ে ডায়না মরেই যেত...'

'...আরও সহজ হয়ে যেত কাজটা। অনেকটা আপনা থেকেই জিনিসগুলো আবার ফিরে যেত মিউজিয়ামে।'

'ঠিক। চলো বাড়ি যাই। কম্পিউটারের ক্রাইম ডাটা বেজ দেখি জুভেনারের কথা কি বলে। বেরিয়েও যেতে পারে চমকপ্রদ কোন তথ্য।'

পিকআপে উঠল দু'জনে।

পার্কিং লট থেকে গাড়ি বের করে আনল মুসা।

সীটে হেলান দিয়ে খবরের কাগজটা খুলল কিশোর। হেডলাইনের দিকে তাকিয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'এই, শোনো, শোনো! লিখেছেঃ অভিশাপ, না কাকতালীয় ঘটনা? অভিশপ্ত বোরজিয়া ড্যাগার ছুঁয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন মরগানদের উত্তরাধিকারী!'

'রসাল গল্প লিখেছে মনে হয়। পড়ো তো শুনি।'

'গতরাতে ক্লিফসাইড হাইটসের মরগান ম্যানশনে এক সাংঘাতিক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। তখন রাত প্রায় এগোরোটা। আকাশে ভরা চাঁদ, ঘরের ভেতরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। যারা উপস্থিত ছিল ওখানে তখন, কেউ ভুলতে পারবে না...'

'বাহ্, গরুও পেয়েছে,' টিটকারির সুরে বলল মুসা, 'দুধও ভালই দুইয়েছে।'

'হ্যাঁ। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লিখেছে এরপর। শেষটুকু পড়ি। কিছু মেহমান তখন বেরিয়ে গেছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে ওরা। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, অভিশাপের কবল থেকে মুক্তি নেই মিস ডায়না মরগানের। মিস মরগানকেও বলতে শোনা গেছে—বাকি জীবনটা কি আমি এই অভিশাপ নিয়েই কাটাব? টাইমসকে কথা দিয়েছেন মিস মরগান, আজ ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে একটা সাক্ষাৎকার দেবেন...'

'উচিত হবে না,' আবার বাধা দিল মুসা। 'পত্রিকাওলাদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত ওর, সেকথা বোঝাতে হবে। রিপোর্টাররা সারাক্ষণ লেগে থাকলে তদন্ত করতে অসুবিধে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ। বোরজিয়া ড্যাগারেরও বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি। কে কখন আবার কোত্থেকে এর মালিকানা দাবি করতে চলে আসে কে জানে। ঝামেলা পাকাবে।'

'না-ও আসতে পারে। অভিশাপের ভয় আছে।'

বাড়ি পৌছেই সোজা নিজেদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে গেল দুই গোয়েন্দা।

কম্পিউটার নিয়ে বসল কিশোর। পাশে বসল মুসা।

জুভেনারের বিরুদ্ধে কিছুই বলল না কম্পিউটারের ডাটা বেজ।
মুসা বলল, 'বার্ব এনুডার কথা কি বলে, দেখো তো?'
কিছুটা অবাক হয়েই পর্দার দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে। জোরে জোরে তথ্যগুলো পড়ল মুসা, 'বিশ বছর আগে এক দোকান থেকে এক টিন মাছ চুরি করেছিল...এগারো বছর আগে চেঁচিয়ে সংলাপ বলে পড়শীদের শান্তি নষ্ট করেছিল...দুই বছর আগে, নো-পার্কিং জোন থেকে একটা লিমোজিন গাড়ি সরানোর সময় একজন টো-ট্রাকের অপারেটরকে মেরে বসেছিল।'
'নাহ্, খুনীর সারিতে পড়ে না,' মাথা নাড়ল কিশোর।
বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, কিশোর!'
তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল কিশোর ও মুসা।
'তোর ফোন,' মেরিচাচী বললেন। 'থানা থেকে করেছে। পল নিউম্যান।'
দৌড় দিল দুই গোয়েন্দা।
রান্নাঘরে এসে ঢুকল।
রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। 'হালো?'
'কে, কিশোর?' পল নিউম্যান বলল। 'খবর শুনেছ?'
'কিসের খবর?'
'ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে!'
'ডায়না মরগান না তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'হ্যাঁ। গুলি করা হয়েছে। ভাবলাম, খবরটা তোমাকে জানানো দরকার।'

সাত

ঝড়ের গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। পিকআপে উঠল। টায়ারের ওপর অত্যাচার চালিয়ে গাড়ি ঘোরাল রবিন। ছুটল পুবমুখো।
রাস্তায় সাইনবোর্ড রয়েছে: **এনটারিং ক্লিফসাইড হাইটস**।
তারপর থেকে নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে এলাকার চেহারা। শহরতলির ছিমছাম সুন্দর বাড়িগুলোর পরেই শুরু হয়েছে ঘন বন। রাস্তায় তীক্ষ্ণ মোড় রয়েছে, ফলে সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে মুসাকে। তবে কিছুতেই গতি কমাল না সে।
বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আলসেদের জন্যে তৈরি করেছে এই রোড! এ ভাবে চালানো যায়?'
আরও খানিকদূর এগিয়ে আরেকটা সাইনবোর্ড দেখা গেল। তাতে ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লেখা: **সি সি সি**। তীর চিহ্ন এঁকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কোনদিকে যেতে হবে। বাঁয়ের খোয়া বিছানো পথটায় গাড়ি নামাল মুসা।
'কায়দা-টায়দা তো বেশ ভালই করেছে।'
'করবে না?' কিশোর বলল। 'এত দামী ক্লাব।'
রাস্তার মাথায় বন কেটে সাফ করা হয়েছে। ঘোরানো একটা ড্রাইভওয়ে।

হাসিখুশি, বাদামী ইউনিফর্ম পরা একজন লোক ওদের পথ আটকাল।

ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। জানালার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'কার কাছে…?'

'ডায়না মরগান,' বলেই ব্রেক ছেড়ে দিল মুসা। লাফিয়ে সরে গেল গার্ড।

ক্লাবহাউসের সামনে এসে আবার জোরে ব্রেক কষল মুসা। পাথরের তৈরি তিনতলা একটা বাড়ি। চারপাশে সুন্দর ফুলের বাগান। দু'দিকের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল দু'জনে। পেছনে শুনতে পেল গার্ডের চিৎকার, 'এই শুনুন, শুনে যান!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। সামনে কথা শোনা যাচ্ছে। বাড়ির পাশ ঘুরে এল দু'জনে। বেশ বড় ছড়ানো একটা চত্বর, ঘাসে ঢাকা, চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে বন। চত্বর না বলে মাঠই বলা যায় ওটাকে। মাঠের মাঝখানে অনেক মানুষ, কয়েকজন পুলিস অফিসারও আছে। ওদের কাছ থেকে দূরে একটা অস্থির ঘোড়াকে শান্ত করার চেষ্টা করছে জিনস পরা একজন লোক। আর ভিড়ের মাঝে সেই রিপোর্টারকে দেখা গেল, সোসাইটি কলামিস্ট, ঘুরে ঘুরে লোকের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করছে।

বার বার 'এক্সকিউজ মি' বলতে বলতে লোকজনকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ভিড়ের মাঝখানে এসে ঢুকল কিশোর-মুসা। ডায়নাকে শুয়ে থাকতে দেখল ঘাসের ওপর। ফোঁপাচ্ছে। পাশে বসে আছেন ডক্টর নরিয়েমা। ভেজা একটা কাপড় দিয়ে তার কপালের রক্ত মুছে দিচ্ছে ডিন।

'কেমন আছে ও?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মুখও তুলল না ডিন, কথাও বলল না। তবে ডক্টর হাসলেন। 'অ, তোমরা! তোমরাও যে মেম্বার, জানতাম না। ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে ডায়না। ভাগ্য ভাল, ব্যথা তেমন পায়নি।'

'পায়নি, পেতে পারত, থমথমে হয়ে আছে ডিনের মুখ। 'মরেও যেতে পারত। খুন করার চেষ্টা করেছে কেউ!'

'কি হয়েছে বলতে পারব না,' কাঁপা গলায় বলল ডায়না। ভীষণ ভয় পেয়েছে। 'সাক্ষাৎকার দেয়ার পর থেকেই খারাপ লাগছিল। ভাবলাম, ঘোড়ায় চড়ে খানিকক্ষণ ঘুরলে ঠিক হয়ে যাবে। ঘুরছি, এই সময় শুনলাম গুলির শব্দ।'

'লেগেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। পড়ে গেলাম।'

'কে করেছে দেখেছেন?' মুসার প্রশ্ন।

'না, পুলিশকে বললাম…'

দূরে চিৎকার করে উঠল কেউ। ঝট করে বনের দিকে ঘুরে গেল সব ক'টা চোখ। তিনজন পুলিশ অফিসার, দু'জন লোক, আর একটা ছেলে বেরিয়ে এসেছে। একজন সিভিলিয়ানের হাতে সিলভারপ্লেটেড একটা রিভলভার। দু'জন অফিসার জোর করে টেনে আনছে রবিনকে।

'আরি! রবিন!' মুসা অবাক।

অবাক কিশোরও হয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারছে না। 'ও কি করে এল!'

'হাতকড়া লাগিয়েছেন কেন!' চিৎকার করছে রবিন। 'খুলুন! খুলুন বলছি! আমি কি করলাম?'

'অনেক কিছুই করেছ,' একজন অফিসার বলল। 'বেআইনী ভাবে ঢুকেছ বনের ভেতর। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। হাতে রিভলভার। গুলি ছোঁড়া হয়েছে ওটা থেকে। অ্যারেস্ট করার জন্যে যথেষ্ট নয় কি?'

কিশোর-মুসাকে দেখে উজ্জ্বল হলো রবিনের চোখ। 'কিশোর, ওদেরকে বলো না, আমি কে!'

একজন অফিসার চিনে ফেলল কিশোরকে। 'বাহ্, গন্ধ পেয়ে গেছ!' রবিনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটা তোমাদের দলের নাকি?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল।

অফিসার বলল, 'আমাদেরকে ও অবশ্য তোমাদের কথা বলেনি। বলেছে, একটা জুনিয়র ডিটেকটিভ টীমের মেম্বার।'

ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রবিন। এই সময় ঘটল আরেক ঘটনা। ভিড় ঠেলে ভেতরে এসে ঢুকল দু'জন গার্ড, ওদের মাঝে সেই লোকটাও রয়েছে, যে কিশোরদের ভ্যান থামিয়েছিল। দু'জনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, এই তো! এদের কথাই বলেছি।' পুলিস অফিসারদেরকে বলল, 'না বলে জোর করে ঢুকে পড়েছে। ওদের আটকান।'

গুঞ্জন করে উঠল লোকেরা। জোরে সবাইকে শুনিয়ে বলল অফিসার রিম্যান, 'আপনারা অস্থির হবেন না। এরা গোয়েন্দা। এদের একজনকে আমি ভাল করেই চিনি। মিস মরগানও ভালই আছেন।'

আশ্বস্ত হয়ে এক এক করে সরে যেতে লাগল সদস্যরা।

ভিড় কমে গেলে কিশোর বলল, 'থ্যাংকস, মিস্টার রিম্যান।' রবিনের দিকে ফিরল। 'তুমি ওখানে কি করছিলে?'

'জিজ্ঞেস করেছি সে-কথা,' জবাবটা দিল রিম্যান। 'লুকিয়ে মিস মরগানের ওপর নজর রাখছিল। বলল, বনের ভেতর নাকি কুড়িয়ে পেয়েছে রিভলভারটা। আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি, তবে শহর ছেড়ে যেতে পারবে না। তোমাকে আমাদের দরকার হতে পারে। রিভলভারটা নিয়ে যাচ্ছি, পরীক্ষা করতে হবে।' রবিনের চোখে চোখে তাকাল অফিসার, 'মিথ্যে বলে থাকলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।'

নিজেদের গাড়ির দিকে এগোল পুলিসেরা। ডায়নার দিকে ঝুঁকল কিশোর। 'আমাদের পরিচয় তো জানলেন। বুঝতেই পারছেন এখন, আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে চাইছি। কেউ লেগেছে আপনার পেছনে, খুন করতে চায়...'

বাধা দিয়ে বলল ডায়না, 'আমি আগেই আন্দাজ করেছি, এ ধরনেরই কোন কাজ করো তোমরা।' আচমকা কিশোরের হাত চেপে ধরল, 'আমাকে সত্যিই সাহায্য করবে?'

গাল চুলকাল কিশোর। 'করব। আর সেজন্যে আপনাদের বাড়িতে আমাদের থাকা দরকার। কোনও একটা ছুতোয় যদি...'

'ছুতো করা লাগবে না। খুব সহজেই ব্যবস্থা করা যায়। আমার সিকিউরিটি অফিসার হয়ে যাও। জুনিয়র সিকিউরিটি। চাইলে বেতনও দেব। আমার নিরাপত্তা

দরকার, বুঝতেই পারছ। থাকতেও পারবে, তদন্তও করতে পারবে।'

'এখানে এ ভাবে বসে থাকলে তো হবে না,' তাড়া দিলেন নরিয়েমা। 'আমার অফিসে নিয়ে যাওয়া দরকার তোমাকে। কিছু ওষুধপত্র তো লাগবে।'

মুসা, ডিন আর নরিয়েমা সাহায্য করলেন ডায়নাকে। ধরে ধরে তাকে নিয়ে চলল ক্লাবহাউসের দিকে। কয়েক গজ পেছনে রইল কিশোর আর রবিন। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বনের মধ্যে কি করছিলে, বলো তো?'

রবিন বলল, 'বাড়ি যেতেই মা বলল, কাজটা করা লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ইয়ার্ডে গিয়ে দেখলাম, তোমরা চলে গেছ। মেরিচাচী বললেন, পুলিস ফোন করেছিল। ডায়না নামে কে নাকি গুলি খেয়েছে। ঠিকানা বলতে পারলেন না। টেবিলে ফেলে রাখা পেপারের দিকে চোখ পড়ল। দেখি, তাতে লেখা, আজ এই ক্লাবটাতে আসবে ডায়না, সাক্ষাৎকার দেবে। বুঝলাম, অঘটনটা এখানেই ঘটেছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম। গার্ডেরা ভেতরে ঢুকতে দিল না। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। ভাবলাম, চুরি করে ঢুকব।'

দম নেয়ার জন্যে থামল রবিন।

'তারপর?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'বনে ঢোকাটাও সহজ হলো না। বেড়া ডিঙিয়ে বনে ঢুকলাম। ক্লাবহাউসটাকে খুঁজতে লাগলাম, এই সময় কানে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এগিয়ে দেখি, ডায়না ঘোড়ায় চড়েছে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ গুলির শব্দ হলো। লাফ দিয়ে পেছনের পায়ের ওপর খাড়া হয়ে গেল ঘোড়াটা। মাটিতে পড়ে গেল ডায়না। বুঝলাম, গুলি তার গায়ে লাগেনি। তাই সেদিকে না গিয়ে গেলাম যেদিক থেকে গুলির শব্দ শোনা গেছে সেদিকে। কে গুলি করেছে দেখলাম না, তবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম রিভলভারটা।'

'এনুডারটার মতই দেখতে,' আনমনে বলল কিশোর।

দ্রুত হেঁটে অন্যদের কাছে চলে এল দু'জনে। হাত তুলে বাগানের একটা জায়গা দেখাচ্ছেন ডক্টর নরিয়েমা। বেশ খানিকটা জায়গার মাটি কোপানো। কাছে পড়ে আছে হোস পাইপ, নানা রকমের বোতল, বীজের প্যাকেট। কোপানো জায়গায় ঘাস ছিল, কিছু নষ্ট হয়েছে কোপানোয়, বাকিগুলোও কেমন জ্বলা জ্বলা।

'আর্সেনিকের কাজ,' বুঝিয়ে বললেন ডক্টর। 'ঘাস সহজে মরে না। কুপিয়ে নষ্ট করে ফেললেও আবার ওঠে। তাই মাটিতে আর্সেনিক ঢেলে দিয়েছিলাম। মরেছে এখন, আর উঠবে না। ভাবছি, এ বছর ওখানে টমেটো লাগাব।'

'ভাল।' গুঙিয়ে উঠল ডায়না 'বড্ড খারাপ লাগছে, খালা! শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে!'

ক্লাবহাউসের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। নিচতলায় ডক্টরের অফিস। সুন্দর করে সাজানো গোছানো। একটা সিংক, একটা চেয়ার, একটা ডেস্ক, একটা কট, আর কয়েকটা তাক বোঝাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

কটে শুয়ে পড়ল ডায়না। গুঙিয়ে উঠল আবার। 'উফ্, মাথার ব্যথায় মরে গেলাম!'

'দাঁড়াও, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে,' কোমল গলায় বললেন নরিয়েমা। 'দুটো ব্যথার বড়ি খেলেই, ব্যস...'

তাকগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একটা শিশি পাড়লেন। 'চুপ করে থাকো,' ডায়নার দিকে তাকালেন না তিনি, 'যা করার আমি করছি। ডিন, এক গেলাস পানি।'

ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে রবিন।

বড় একটা গেলাস ভর্তি করছে ডিন।

ডায়নার মাথার নিচে বালিশ দিয়ে আরামে শোয়ার ব্যবস্থা করছে মুসা।

আর পুরো ব্যাপারটাই কেন যেন অপছন্দ হচ্ছে কিশোরের। চেহারায় যেন শ্রাবণের কালো মেঘ জমেছে। তাকিয়ে আছে ডায়নার দিকে।

বড়িগুলো হাতে নিয়েছে ডায়না। মুখে তুলতে যাবে। হঠাৎ কি ভেবে তাক থেকে শিশিটা পাড়ল কিশোর। লেভেলটা পড়ল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

শিশির গায়ে লেখা রয়েছেঃ **আর্সেনিক!**

আট

সাবধান করে থামানোর সময় নেই। লাফ দিয়ে এসে ডায়নার হাতে থাবা মারল কিশোর। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল বড়িগুলো।

চিৎকার দিয়ে উঠল ডায়না।

কিশোরের কলার চেপে ধরল একটা হাত। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিন, 'এটা কি করলে?'

'ওর প্রাণ বাঁচালাম।' আর্সেনিকের বোতলটা তুলে ধরল কিশোর।

নীরব হয়ে গেল ঘরটা।

ককিয়ে উঠল ডায়না। কটে বিছানো চাদরের মতই সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'সর্বনাশ!' কিশোরের হাত থেকে ছোঁ মেরে শিশিটা কেড়ে নিলেন নরিয়েমা। 'আ-আ...আমি এটা কি করছিলাম!'

'আর্সেনিকের বোতল কেন এখানে?' জানতে চাইল কিশোর।

'সর্বনাশ! কি করছিলাম আমি! সর্বনাশ!' কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না যেন নরিয়েমা। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। 'কতবার ভেবেছি, কোন্ দিন এ রকম কিছু ঘটে যাবে! তবু সাবধান হলাম না! আজকে তো দিয়েছিলাম শেষ করে! ওষুধের দোকান থেকে আমিই কিনে আনি ওগুলো, পানিতে মিশিয়ে জমিতে ছিটাই আগাছা মারার জন্যে। অন্যান্য কেমিক্যাল আর ওষুধের সঙ্গে এখানেই রাখি। উচিত হয়নি, একেবারেই উচিত হয়নি! এই পোড়া চোখেও আজকাল আর ভাল দেখি না ছাই!...ডায়না, তোর কিছু হয়ে গেলে কি করতাম আমি, মা!'

'তো-তোমার কোন দোষ নেই খালা,' পানিতে ভরে গেছে ডায়নার চোখ। 'আমার কপাল! তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে কোনও একটা শক্তি, বাধা দেয়ার

ক্ষমতাই ছিল না তোমার! জাস্ট করে ফেললে কাজটা!'

'কি বলতে চাস?'

'বোরজিয়া ড্যাগারের অভিশাপ! তোমার ওপর ভর করেছিল!' চেঁচিয়ে উঠল ডায়না, হতাশায় ভরা কণ্ঠ, 'শেষ হয়ে গেছি আমি! একবার যখন ছুঁয়ে ফেলেছি, আর কেউ বাঁচাতে পারবে না আমাকে! কেউ না! কোথাও গিয়ে আর বাঁচতে পারব না!'

'কিছুই হবে না,' অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। 'সাধারণ দুর্ঘটনা এগুলো। অভিশাপ বলে কিছু নেই।'

'ও ঠিকই বলেছে, ডায়না,' নরিয়েমা বললেন। 'ভুলটা আমারই। আরও সাবধান হব। এখন ঘুমাও। ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথার নিচে বালিশটা ঠিকঠাক করে দিলেন তিনি। 'ঘুমাও। আমি আর ডিন রইলাম, কোন ভয় নেই। এখানে কিশোরদের না থাকলেও চলবে।'

পরিশ্রমে যতটা না তার চেয়ে বেশি ভয়ে কাহিল হয়েছে ডায়না। চোখের পাতায় কাঁপন জাগল। মুদে এল আপনাআপনি। ডিন আর নরিয়েমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, নিঃশব্দে অফিস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর, মুসা আর রবিন।

'বুড়িটাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না আমি,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। 'বলছে ভুল হয়েছে। কি করে হলো? সব সময় কেমিক্যাল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যে, তার এ রকম ভুল হয় কি করে?'

'কি জানি,' গাল চুলকাল মুসা, 'ভুল সব মানুষেরই হতে পারে। যে রকম নার্ভাস হয়ে পড়ল, তাতে তো মনে হলো সত্যিই অ্যাক্সিডেন্ট। আসলে কি দিচ্ছে খেয়ালই করেনি।'

'আমিও মানতে পারছি না ব্যাপারটা,' যোগ করল কিশোর।

*

চল্লিশ মাইল গতিতে বিপজ্জনক মোড় নিল পিকআপ।

'করছে কি বলো তো!' গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আত্মহত্যা করতে চায় নাকি?'

ক্লিফসাইড রোড ধরে ছুটছে দুটো গাড়ি। আগেরটা নীল কনভারটিবল, পেছনেরটা সবুজ পিকআপ। আগের গাড়িটার খোলা ছাত। ড্রাইভারের সীটে বসা মেয়েটার লাল চুল লম্বা হয়ে উড়ছে বাতাসে।

'ওটা ওর দুই নম্বর গাড়ি,' মুসা বলল। 'আর ক'টা আছে এ রকম?'

'আছে নিশ্চয় অনেকগুলো। টাকার তো অভাব নেই। তবে তৃতীয় গাড়িটা একটা মডেল টী হলে খুশি হতাম। বিশ মাইলের বেশি স্পীড তুলতে পারত না। আসলে, ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'বললাম তো কত করে, রাজি হলো না।'

ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছে ডায়না। কমলা রঙের রোদ পড়েছে বনের গাছে গাছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। মরগানদের সীমানায় ঢুকে পড়ল নীল গাড়িটা। খোয়া বিছানো পথে ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে গিয়ে স্কিড করে থামল একটা গ্যারেজের সামনে। চারটে গাড়ি রাখার জায়গা আছে ওটাতে।

পিকআপের গায়ে হালকা ধুলো জমেছে। রঙ কালো বলে ধুলোগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি। উইন্ডশীল্ড ওয়াইপারটা চালু করে দিয়েছে মুসা, কাঁচ থেকে ধুলো মোছার জন্যে।

'ডিরেক্টরি ঘেঁটে ইচ্ছে করলে ডায়নার ফোন নম্বরটা বের করে নিতে পারবে রবিন, তাই না?' কিশোর বলল।

'পারবে। আমাদেরকে খুঁজে বের করাও কঠিন হবে না। মরগান ম্যানশনটা কোথায়, ডিরেক্টরি খুললেই জেনে যাবে।'

'তুমিই কিন্তু ডায়নার বডিগার্ড সাজতে রাজি করালে আমাকে,' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'আমি?' মুসা অবাক। 'এই, কি বলছ...'

'ওয়েলকাম! ওয়েলকাম!' গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল ডায়না।

'ডায়না...'

কিশোরকে কথা শেষ করতে দিল না মেয়েটা। 'ঘুম থেকে উঠে খুব ভাল লাগছে। কটেজে গিয়ে ঘর দেখে এসো। আমাকে আসতে হবে?'

মাথা নাড়ল দু'জনেই।

আর কিছু বলল না ডায়না। দ্রুত রওনা হয়ে গেল ম্যানশনের দিকে।

'জড়তার লেশও নেই,' পিকআপের দরজা খুলতে বলল কিশোর।

গাড়ি থেকে নামল দু'জনে। বাড়ির আশপাশে ঘুরল খানিকক্ষণ। তারপর চলল ডায়না কি করছে দেখার জন্যে। কটেজে পরেও যাওয়া যাবে. ভাবল। বসার ঘরে পাওয়া গেল ডায়নাকে। একটা টেলিফোন অ্যানসারিং মেশিনের ক্যাসেট রিওয়াইনড করছে।

'খুব ভাল লাগে আমার এ সব যন্ত্র,' ডায়না বলল। 'সেক্রেটারির চেয়ে অনেক ভাল। ভুল করে না, ছুটি চায় না, খিদে পেয়েছে বলে বেরিয়ে যায় না। যখনই দরকার, পেয়ে যাবে। তার খরচও অনেক কম'

'প্লে' টিপতেই চালু হয়ে গেল মেসেজ: *হালো, মিস মরগান। জুভেনার বলছি। আপনার দাদার দলিলটা খুঁজে পেয়েছে আমাদের কর্মচারী। অনেকগুলো ফাইলের নিচে চাপা পড়েছিল কাল নাগাদ হাতে পেয়ে যাব। মঙ্গলবারে দয়া করে বাড়িতে থাকবেন, জিনিসগুলো ফেরত আনতে যাব। আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, মূর্তিটার দামও আপনাকেই শোধ করতে হবে। গ্রীক মূর্তিটার কথা বলছি! ওটা ভাঙার জন্যে আপনাকেই দায়ী করব আমি। আপনিই জোর করে জিনিসটা নিয়ে গেছেন মিউজিয়ম থেকে। ভাল থাকুন।*

চামড়ায় মোড়া গদিওয়ালা আর্মচেয়ারে নেতিয়ে পড়ল ডায়না। চকের মত সাদা হয়ে গেছে গাল।

'এ রকম কিছু হবে, আমি জানতাম,' মুসা বলল। খারাপ লাগছে মেয়েটার জন্যে।

'জানতে, না?' খেঁকিয়ে উঠল ডায়না। 'তা তো জানবেই! তোমার তো আর কিছু না!'

'সরি, ডায়না। ওভাবে বলতে চাইনি...'

'জানি, জানি!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ডায়না। 'একদিক থেকে ভালই হলো। হতচ্ছাড়া এই জিনিসগুলো শুধু ভোগাচ্ছেই আমাকে, ক্ষতিই করছে।' দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে। ওগুলো ফেরত দিতে কষ্ট হবে, চোখ দেখেই বোঝা গেল।

'জিনিসগুলো দেয়ার পরও কিন্তু আমাদের তদন্ত বন্ধ হবে না,' কিশোর বলল।

অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিল যেন ডায়না, বাস্তবে ফিরে এল। 'ঠিক!' কিশোরের চোখে চোখে তাকাল। 'এরপর কি করবে?'

'পারলারে খুঁজতে যাব...'

'না!'

'না কেন?'

ডায়নার নিচের ঠোঁট সামান্য কাঁপল। আহত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তুমি আমাকে একা ফেলে যাবে না। সিকিউরিটি অফিসার হয়েছ, মনে আছে?'

'তা আছে।' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে, তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। সূত্র খুঁজে বের করো। পারবে তো?'

'পারব।' দরজার দিকে এগোতে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি তো গার্ড দেবে ওকে, তোমাকে গার্ড দেবে কে?'

'কি বললে?'

'না, কিছু না।' বেরিয়ে গেল মুসা।

*

কাঁচের বাক্সে আগের জায়গায়ই রয়েছে বোরজিয়া ড্যাগার। সাবধানে ডালাটা তুলল মুসা। অস্বাভাবিক কোন কিছু নেই তো বাক্সটায়? এই যেমন ইলেকট্রিক সুইচ, চোর ঠেকানোর কোন যন্ত্র...

আস্তে করে ছুরিটা তুলে আনল সে। মখমলের গদির নিচে খুঁজল হাত দিয়ে টিপে টিপে। কিছু নেই। ছুরিটা আবার রেখে দিয়ে এসে দেখল মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানটা। না, এখানেও চোখে পড়ার মত কিছু নেই।

তার মনে হচ্ছে, কিছু না কিছু আছেই ঘরে। ও দেখতে পাচ্ছে না এই যেমন সার্কিট ব্রেকারের বাক্স, লুকানো টেলিভিশন ক্যামেরা...

এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওক কাঠে তৈরি দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বোলাচ্ছে সারা ঘরে। নড়তে গিয়ে খোদাই করা একটা জিনিসে কনুই লাগল। সরে গেল ওটা।

লাফিয়ে সরে এল মুসা। আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে জিনিসটা।

কিরিচ্‌চ্‌ করে একটা শব্দ হলো, তারপর ঝাঁকুনি। অবাক হয়ে দেখল সে, বুককেসটা সরে যাচ্ছে, নাড়া লেগে পড়ে গেল কয়েকটা বই। পেছনে দেয়াল-টেয়াল কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার।

একটা গোপন কুঠুরি, ভাবল মুসা। পুরানো গোয়েন্দা গল্পের সিনেমাগুলোতে যেমন থাকে।

অতি সাবধানে ভেতরে পা বাড়াল সে। মনে করল, সিঁড়িটিড়ি। আছে। কিন্তু কিছুই ঠেকল না পায়ে। শুধু মাকড়সার জাল। এত সতর্ক থেকেও দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না। পড়ে গেল, গিলে ফেলল যেন তাকে অন্ধকার!

নয়

সিমেন্টের মেঝেতে পড়ল সে। একটা মুহূর্ত পড়ে থাকল চুপচাপ। দম নিল। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। নেড়েচেড়ে দেখল হাত-পা। না, ঠিকই আছে, ভাঙেনি।

ধীরে ধীরে চোখে সয়ে এল অন্ধকার। চারপাশে তাকাল সে। যেখান দিয়ে পড়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে আলো আসছে আবছাভাবে। বেশ বড় একটা ঘরে পড়েছে সে। জিনিসপত্র নেই। অন্য পাশের দেয়ালে একটা ছোট দরজা।

উঠে এসে দাঁড়াল ওই দরজাটার কাছে। ঢোকার আগে দ্বিধা করল একবার। দরজাটা এত নিচু, মাথা নুইয়ে ঢুকতে হলো তাকে। খুব সতর্ক রইল যাতে আগের বারের অবস্থায় না পড়ে। দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দেখল, দেয়ালের খসখসে প্লাস্টার লাগে হাতে। মাথা সোজা করতে যেতেই ছাতে বাড়ি লাগল, নিচু করে ফেলল আবার। একটা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে সে, বুঝতে পারল। আলোর অভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পা বাড়াল সামনে। কোথায় যাচ্ছে, বোঝার উপায় নেই। শুধু এটুকু বুঝল, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সুড়ঙ্গটা।

মাথা নিচু করে রেখে, দু'হাতে দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোল সে। প্রথমে ধীরে, তারপর গতি বাড়াল। কোন একটা জায়গায় নিশ্চয় পৌঁছবে, ভাবল সে। স্টোররুম, বয়লার রুম, কিংবা···

ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই কিসে যেন বাড়ি খেলো। কপাল ডলল, যেখানে লেগেছে। আরেক হাত বাড়িয়ে দিল সামনে, একটা দরজা লাগল হাতে। হাতড়ে বের করল নব। ওটা ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা।

আরেকটা অন্ধকার ঘর। ভেতরে পা দিল সে। পায়ের নিচে পড়ল কি যেন, আরেকটু হলেই উল্টে পড়ে যেত, সময়মত ধরে ফেলল দরজার পাল্লাটা। সুইচবোর্ডের আশায় হাতড়াতে লাগল দেয়ালের পাশে।

হাতে ঠেকল ধাতব বোর্ডটা। সুইচ টিপতে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট আলোয় ভরে গেল ঘর। এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে এই আলো অসহ্য লাগল চোখে, বন্ধ করে ফেলল। আবার খুলে মিটমিট করল। ঠিক হয়ে এল ধীরে ধীরে। নানা রকম জিনিসে বোঝাই। ট্রাংক, বাক্স, বাগানে কাজ করার যন্ত্রপাতি, আরও নানা রকম জিনিস। দেখল, যেটাতে পা দিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, সেটা একটা ধাতব রোলার-স্কেট।

একপাশের দেয়ালে দেখতে পেল সার্কিট ব্রেকারের ধাতব বাক্সটা। বাক্সের সামনে দরজাটা টেনে খুলল সে। সুইচ আছে মোট বিশটা। নিচে লেখা রয়েছে কোন্‌টা কোন্‌ ঘরের: রান্নাঘর, বসার ঘর, পারলার···। সুইচগুলোর নিচে একটা বড় মেইন সুইচ। 'এখান থেকেই ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে,' বিড়বিড় করে বলল

সে নিজেকেই। 'পুরো ম্যানশন অন্ধকার করে দেয়া হয়েছিল, সুইচ অফ করে দিয়ে!'

আরেক পাশের দেয়ালে দুটো কাঠের সিঁড়ি লাগানো। ওপরে দুটো দরজা। কোথায় ঢুকেছে সে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেসিমেন্টে চলে এসেছে, মাটির তলার ঘরে। সার্কিট ব্রেকার বক্সের দরজাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে এসে একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল একটা দরজা। নাকে এসে লাগল ফুলের সুবাস। বাল্কহেড ডোর দিয়ে মাথা বের করল রোদের মধ্যে।

পেছনে তাকাতে চোখে পড়ল মরগানদের প্রাসাদটা। ওর দুই পাশেই ফুলের বাগান। সামনে খোয়া বিছানো রাস্তা। চলে গেছে ওটা গেস্ট কোয়ার্টার পর্যন্ত।

এক চিলতে হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। প্রায় দৌড়ে চলল প্রাসাদের দিকে। বসার ঘরের একটা জানালার নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় কানে এল ডায়নার কণ্ঠ, 'একটা কথা বলি, শোনো, সিকিউরিটি অফিসার হয়ে...'

মাথা তুলে দেখল মুসা, কাউচের কিনারে সোজা হয়ে বসে আছে কিশোর। অস্বস্তি বোধ করছে। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে হাত রাখল ডায়না।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চোখ পড়ল জানালার দিকে। 'মুসা! ওখানে কি করছো?'

'বিরক্ত করলাম না তো?' মুচকি হেসে বলল মুসা।

'না না, এসো, ভেতরে এসো।'

ঘুরে এসে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মুসা।

'ছিলে কোথায় এতক্ষণ? সেই কখন থেকে ভাবছি আসবে, আসবে...'

'কোথায় ছিলাম, চলো, দেখাব।' ডায়নার দিকে তাকাল মুসা। 'ডায়না, টর্চ আছে?'

'আছে। লাগবে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

তাড়াতাড়ি টর্চ আনতে চলে গেল ডায়না । ফিরে এল বড় একটা টর্চ নিয়ে।

'এসো আমার সঙ্গে,' কিশোরকে বলে পারলারের দিকে এগোল মুসা। কিশোর আর ডায়না তার পিছে পিছে চলল।

বুককেসের কাছে ফোকরটা দেখে হাঁ হয়ে গেল ডায়নার মুখ।

'নিচে একটা ঘর আছে।' ফোকর দিয়ে ভেতরে আলো ফেলল মুসা। 'বেশি নিচে না। লাফ দিলেই নামা যায়। সিঁড়ি থাকলে আর লাফানোর দরকার পড়ত না।'

ফোকরের মুখে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরটা আলো ফেলে দেখল সে। একপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটা লোহার মই।

'সব বুঝলাম,' বলল মুসা। 'এই ঘর থেকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে স্টোর রুমে। সার্কিট ব্রেকার আছে ওখানে। ডায়নাকে যে খুন করতে চেয়েছে, সুড়ঙ্গ ধরে উঠে এসেছে এই ঘরে। তারপর মই বেয়ে উঠে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মূর্তিটা।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল ডায়না।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দু'জন নয়, একজনেই করেছে কাজটা।'

'হ্যাঁ,' মুসাও একমত। 'আস্ত শয়তান। প্রথমে আলো নিভিয়েছে। তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে দৌড়ে চলে এসেছে এই ঘরে, মই বেয়ে উঠেছে, বুককেসটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে মূর্তিটা ফেলেছে, তারপর আবার বুককেসটা আগের জায়গায় সরিয়ে রেখেছে। নেমে গিয়ে সুইচ অন করে আলো জ্বেলে দিয়েছে।'

'তার মানে এমন একজন লোক কাজটা করেছে, এই বাড়ির সমস্ত গলিঘুপচি যার চেনা...'

'এবং অন্ধকারেও যে কাজ সারতে পারে,' কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। ডায়নার দিকে ফিরল। 'বুককেসটা যে আসলে দরজা, জানেন আপনি?'

হাত নাড়ল ডায়না। 'জানলে কি আর বলতাম না? মূর্তিটা পড়ার পরপরই আগে ওটা সরিয়ে দেখতাম।'

'তা ঠিক।'

'এ সব ভাল লাগছে না আমার,' শিউরে উঠল ডায়না। 'গোপন দরজা, গোপন সুড়ঙ্গ—নাহ্, একেবারে ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে! কালই দেয়াল তুলে ওই ফোকর বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। যথেষ্ট হয়েছে...'

ডায়নার হাত ধরল কিশোর। 'এত ভয়ের কিছুই নেই। যেভাবে আছে থাকুক। সতর্ক করার দরকার নেই। ভুল করে বসতে পারে লোকটা। আর তাতে সূত্র পেয়ে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ।' মুখের কাছে হাত তুলল সে। হাই আসছে।

'আরও বিশ্রাম দরকার আপনার,' কিশোর বলল। 'ঘুমানগে। আমাদের কাজ কালও করতে পারব।'

মাথা ঝাঁকাল ডায়না। 'হ্যাঁ, আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। কটেজে চলে যাও। সকালে দেখা হবে।'

দোতলায় চলে গেল ডায়না। নিচতলার জানালাগুলো ভালমত বন্ধ করল দুই গোয়েন্দা মিলে। বেরিয়ে এসে ঘরে ঢোকার সমস্ত দরজা আটকে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর ওদের ব্যাগ বের করল পিকআপ থেকে।

কটেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'কার কাজ, আন্দাজ করতে পারছি।'

'জুভেনার আর ডক্টর নরিয়েমাকে সন্দেহ থেকে বাদ দেয়া যায়। ঘটনাটা ঘটার সময় পারলারেই ছিল দু'জনে।'

দাঁড়িয়ে গেল মুসা। 'ওই দেখো।'

'কি দেখব? একটা রাস্তা,' মাথা চুলকাল কিশোর। 'খোয়া বিছানো। কি বলতে চাও?'

'পার্টি শেষে এই পথ দিয়ে কাকে আসতে দেখেছিলাম?'

'এনুডা! বার্ব এনুডা! তাই তো! এ পথে এসে সহজেই স্টোর রূমে ঢুকে মেইন সুইচ অফ করে দিতে পারে!'

'ঠিক। জুভেনার কিংবা নরিয়েমার হয়েও কাজটা করতে পারে সে।' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'ভাবছি, কাল একবার গিয়ে দেখা করে আসব এনুডার সঙ্গে।'

*

পঁচাশি ডিগ্রি!

চোখ ডলল মুসা। আউটডোর থারমোমিটারের রীডিং বিশ্বাস করতে পারছে না। 'বাপরে বাপ!' বলল সে। 'সকাল বেলাও তো এত ছিল না! পুড়ে যাব আজকে!'

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে ডায়নাকে খুঁজতে চলল দুই গোয়েন্দা। দেখল, কাপড় পরে বসে আছে ডায়না, ওদের জন্যেই। 'গুড মর্নিং,' টেনে টেনে সুর করে বলল সে, তারমানে মেজাজ ভাল। 'আমিই যাচ্ছিলাম সাঁতার কাটতে যাবে কিনা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে।'

'সাঁতার?' মুসা বলল। 'পোশাক তো...'

'আছে, অনেক। কটেজের চেঞ্জিং রুমে খুঁজলেই পেয়ে যাবে। মেহমানদের জন্যে এক্সট্রা বেদিং সুট রেখে দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু তারচেয়ে...'

কনুইয়ের গুঁতো মেরে মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'না, সাঁতারই কাটতে যাব।'

'ঠিক আছে। তোমরা গিয়ে কাপড় বদলে এসো। আমি ডিনকে ফোন করছি। সকালে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে ও।'

ফোন করতে গেল ডায়না। বেরিয়ে এল কিশোর-মুসা। সিটিং রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে এল ডায়নার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'ছেলেমানুষী কোরো না!...নিশ্চয়ই না!...নির্বোধ ভাবছ কেন ওদের? আমার তো ধারণা, তোমার চেয়ে অনেক চালাক ওরা!

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। কিশোর বলল, 'সমস্যাটা আমাদেরকে নিয়ে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ভেবেছিলাম ডিনের সাহায্য পাব। কিন্তু ও তো আমাদের শত্রু ভাবছে। এসো।'

দ্রুত বেদিং সুট পরে নিল দু'জনে।

চেঞ্জিং রুম থেকে আগে বেরোল কিশোর। দৌড়ে চলল সুইমিং পুলের দিকে। ডাইভিং বোর্ডে উঠে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো। ঠিক ওই সময় পুলের নিচে ইলেকট্রিকের তারটা চোখে পড়ল তার। স্বচ্ছ পানিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তারের একটা মাথায় লাগানো প্লাগ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা আউটডোর সকেটে।

শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। ঝাঁপ দেয়া থেকে বিরত থাকল। তার পেছনেই উঠে এসেছে মুসা। পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গেল।

'নাআ! নাআ!' বলে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে ডাইভ দিল মুসা।

দশ

বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরবে তার বন্ধু, তারই চোখের সামনে, অথচ সে কিছুই করতে পারবে না, এ-দৃশ্য সইতে পারবে না সে। চোখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।

ঝুপ করে শব্দ হলো পানিতে পড়ার। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর হুসস করে ভেসে ওঠার শব্দ। বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মরার পর কি সাথে সাথেই ভেসে ওঠে লাশ? কতটা কুৎসিত লাগে দেখতে ওটাকে?

'কিশোর, চোখ বুজে আছো কেন?' মুসার ডাক শোনা গেল।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। আস্তে চোখ মেলে তাকাল। মুসাই। পানিতে মাথা তুলে ডাকছে। বহাল তবিয়তেই আছে। কিছুই হয়নি ওর!

ডাইভিং বোর্ড থেকে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড়ে পুলের একপাশে এসে সকেট থেকে একটানে খুলে ফেলল প্লাগটা।

'সর্বনাশ!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'মরলাম না কেন?'

'আল্লাহই জানে!'

ডায়না এসে হাজির হলো। পরনের বেদিং সুটটা লাল-কমলা ডোরাকাটা। 'এই, কি হয়েছে? কিসের কথা বলছ?'

'এই তারটা পানিতে ছিল,' দেখিয়ে বলল কিশোর। 'প্লাগ সকেটে ঢোকানো।'

'নিশ্চয় রাতের বেলা পাতা হয়েছে,' বলল মুসা। 'মৃত্যুফাঁদ!'

'স্ট্রেঞ্জ!' নিমেষে সাদা হয়ে গেছে ডায়নার মুখ, হাসি উধাও। 'আমার জন্যে পেতেছিল! জানে, সকালবেলা সাঁতার কাটতে নামি!' ঢোক গিলে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল পুলের পাশের একটা চেয়ারে। হাত-পা কাঁপছে। 'কে···কে খুন করতে চায় আমাকে?'

'বলতে পারব না, ডায়না,' কিশোর বলল। 'তবে এনুডাকে সন্দেহ করা যায়।'

'মুসা পানিতে নামার আগেই তারটা খুলেছ?'

'না। পরে। কি করে যে বেঁচে গেল, বুঝতে পারছি না!'

'আমি পারছি,' ডায়না বলল। স্বস্তি ফিরে এসেছে কিছুটা। 'আমি নামলেও মরতাম না। সকেটটা খারাপ কয়েক বছর ধরেই। সারাবে সারাবে করেও সারায়নি বাবা। ভাগ্যিস ভুলে গিয়েছিল!'

'সাঁতার আপাতত থাক,' কিশোর বলল। 'এনুডাকে গিয়ে ধরব এখন।'

মাথা নাড়ল ডায়না। 'আমার মনে হয় না ওর কাজ। আমাকে দেখতে পারে না, ঠিক, কিন্তু খুন করতে আসবে না।'

'চলুন না গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি?'

'না। আমি ওর সামনে আর যাব না।'

'কিশোর, তুমিই যাও,' পানি থেকে উঠতে উঠতে বলল মুসা। 'আমি

ডায়নাকে পাহারা দিই।'

'তাই করো,' প্রস্তাবটা পছন্দ হলো কিশোরের। 'আমি রবিনকে ফোন করছি। ওকেও যেতে বলব। দরকার হতে পারে।'

মুসা চলে গেল চেঞ্জিং রুমে, কাপড় বদলাতে। আর কিশোর গেল কটেজে রবিনকে ফোন করতে। এনুডার ঠিকানা দিয়ে বলল, রবিন যেন ওখানে দেখা করে। তারপর তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। দৌড়ে চলল ড্রাইভওয়ের দিকে।

পিকআপে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ডায়নাকে ডেকে বলল, 'ডায়না, দুশ্চিন্তা করবেন না। চলে আসব কাজ শেষ করেই।'

পিকআপ ছেড়ে দিল কিশোর। ড্রাইভওয়েতে থাকতেই দেখল উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছে। ব্রেক কষল সে। গাড়িটা কাছে আসতেই জানালা দিয়ে মুখ বের করে হেসে বলল, 'গুড মর্নিং, ডিন। খুব গরম, না?'

জবাব দিল না ডিন। মুখ কালো করে রেখেছে। হুস করে পিকআপের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।

*

ক্লিফসাইডের মাইল চারেক দূরে থাকে এনুডা। রকি বীচের একটা পুরানো এলাকা এটা। বাড়িঘরগুলো সব পুরানো, কোন কোনটা ধসে পড়েছে ইতিমধ্যেই, বাকিগুলোর অবস্থাও কাহিল। কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আছে। এক সময় লন ছিল সামনে, এখন সেখানে ঘাস আর আগাছার রাজত্ব, ফুলের নামগন্ধও নেই। বাতাস ভীষণ গরম। বাইরে কেউ নেই। মাঝে মাঝে বাচ্চা ছেলের চিৎকার আর নেড়ি কুকুরের ডাক ছাড়া কোন শব্দও নেই। দু'চারটে জানালায় মানুষের মুখ দেখা গেল। একটুখানি হাওয়ার আশায় বসেছে খোলা জানালার ধারে। হাতপাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করছে। পিকআপের শব্দ পেয়ে কিশোরের দিকে তাকাচ্ছে কঠিন দৃষ্টিতে। কেন এই বিরক্তি, ওরাই জানে।

ডানে মোড় নিল কিশোর। বাড়ির নম্বর খুঁজতে লাগল। তার আগেই এসে হাজির হয়েছে রবিন। কিশোরকে আসতে দেখে গাড়ি থেকে নামল। হাত নেড়ে ডাকল। এনুডার বাসার সামনেই পার্ক করেছে সে।

কিশোর গাড়ি থেকে নামতেই বলল, 'এত দেরি করলে।'

'তোমার চেয়ে দূর থেকে আসতে হয়েছে আমাকে।'

'ডায়না কেমন আছে?' একটা ভুরু উঁচু করল রবিন।

'আছে বোধহয় ভালই। এতক্ষণে নিশ্চয় হেভি মারপিট লাগিয়ে দিয়েছে ডিন আর মুসা,' হেসে রসিকতা করল কিশোর।

'ভাল। তুমি মুক্তি পেলে।' বলে কিশোরের হাত ধরে এনুডার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল রবিন।

ছোট্ট একটা বাড়ি। দেয়ালে কতদিন রঙ পড়ে না কে জানে। একপাশের দেয়াল ধসে পড়েছে। সামনের খুদে চত্বর ঘিরে বেড়া দেয়া। পুরানো সেই বেড়ায় কাত হয়ে ঝুলছে একটা টিনের প্লেটে লেখা সাইনবোর্ড।

'পড়তে পারছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন। সামনের দরজাটা ঠেলে খুলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও! লেখা আছে···হইতে সাবধান!'
'কি হতে সাবধান?'
'সেটুকু তো মুছে গেছে। বোধহয় কুকুর···'
'এই, কুত্তা! সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
বিশাল কালো একটা প্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে আসছে।
ধক্ করে উঠল কিশোরের বুক। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাল একটা হাতিয়ারের জন্যে। মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল একটা ডাল। তুলে নিল ওটা। দৌড়ে এসে দাঁড়াল রবিনের সামনে, কুকুরটার মুখোমুখি।
'এই, এই কুত্তা! সর্, সর্!' ধমক দিয়ে বলল সে।
দাঁড়িয়ে গেছে জানোয়ারটা। দাঁত খিঁচাল বিকট ভঙ্গিতে।
এক পা আগে বাড়ল কিশোর। ডাল নেড়ে হুমকি দিল। গর্জে উঠল কুকুরটা। তবে পিছিয়ে গেল এক পা।
'রবিন, সরে যাও!' আস্তে করে বলল কিশোর। 'সামনের দরজাটা গিয়ে খোলো। আমি আটকে রাখছি এটাকে!'
'পারবে?'
'চেষ্টা করি। যাও!'
কিশোরের পেছন থেকে বেরিয়ে রবিন পা বাড়াতেই লাফ দিয়ে এগোল কুকুরটা।
কষে ওটার নাকেমুখে এক বাড়ি মারল কিশোর। কেঁউ করে পিছিয়ে গেল কুকুরটা। আবার বাড়ি তুলল কিশোর। লাঠির দিকে তাকিয়ে আছে ওটা, আর এগোনোর চেষ্টা করছে না।
অবাক কাণ্ড তো! ওরকম করে তাকাচ্ছে কেন? আরে, আবার লেজও নাড়তে আরম্ভ করেছে! কি ভেবে লাঠিটা একপাশে নাড়ল কিশোর। ঠিক সেই দিক সই করে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করল কুকুরটা। দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের গায়ে এসে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই।
'কি কুত্তা ওটা?' রবিনও অবাক হয়েছে। 'ওরকম করছে কেন?'
'বোধহয় রিট্রিভার!' ঝুঁকিটা নিল কিশোর। লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন কুকুরটার শরীরে। চোখের পলকে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল কুড়িয়ে আনার জন্যে। ওটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গেটটা লাগিয়ে দিল কিশোর।
'রিট্রিভারই।' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল কিশোর। 'দাঁত আছে প্রচুর ওটার, মগজ নেই।'
সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে। হলদে একটা কাগজে নোট লিখে টেপ দিয়ে সাঁটানো রয়েছে দরজায়:

ডিয়ার ফ্র্যাঙ্ক,
মলে যাচ্ছি আমি। পাঁচতলায় পাবে। ওখানে শূটিং হতে পারে আজ। ৬টায় দেখা হবে।
এন.বি.

গাধা নাকি লোকটা?' কিশোর বলল। 'এ ভাবে খোলাখুলি লিখে রেখে যায় কেউ?'

'জলদি চলো! খুন করে ফেলার আগেই ধরা দরকার! শূটিং হতে পারে বলছে...,' গেটের দিকে দৌড় দিল রবিন। কিন্তু কাছে যাওয়ার আগেই থমকে গেল। গেটের বাইরে দাঁতের ফাঁকে লাঠি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে কুকুরটা। ফিরে চেয়ে বলল, 'এই কিশোর, কি করব?'

'দাঁড়াও।' গেটের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। 'আমি খুললেই তুমি বেরিয়ে যাবে। সোজা গাড়িতে!'

'তোমাকে যদি কামড়ায়?'

'কামড়াবে না।' গেটটা সামান্য ফাঁক করতেই ঢুকে পড়ল কুকুরটা। লাঠিটা ধরল কিশোর। এই সুযোগে চট করে বেরিয়ে গেল রবিন।

কুকুরের মুখ থেকে লাঠি নিয়ে দূরে আরেকদিকে ছুঁড়ে দিল কিশোর। জানোয়ারটা সেটা আনতে ছুটতেই বাইরে এসে গেট লাগিয়ে দিল সে। পিকআপে উঠে পড়ল।

*

রবিনের গাড়িকে অনুসরণ করে মলে চলে এল কিশোর। ইনডোর লটে গাড়ি পার্ক করে রেখে এলিভেটরের কাছে চলে এল। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। ভেতরে লোক ঠাসাঠাসি।

দরজা টেনে ধরল কিশোর। 'এক্সকিউজ আস!' বলেই কারও প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। রবিনও ঢুকল। কেউ পছন্দ করল না ব্যাপারটা। তবে কিছু বললও না।

'পাঁচতলা,' মিষ্টি করে হেসে বলল রবিন। অপারেটরের মন ভেজানোর জন্যে।

গোমড়া মুখে সামান্যতম হাসি ফুটল না ছিপছিপে রোগাটে মানুষটার। বোতাম টিপে দিল।

ওই কয়টা তলা পেরোতেই যেন সারা জীবন লেগে যাবে, কিশোরের মনে হলো। প্রতিটি তলায় থামছে লিফট। গাদাগাদি হয়ে থাকা মানুষের মধ্যে দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে নামছে পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলো।

অবশেষে পাঁচতলায় পৌঁছল লিফট। দরজা খুলল। নামতে যাবে দু'জনে, হাত বাড়িয়ে ঠেকাল ওদেরকে একজন দাড়িওয়ালা লোক।

ঠিক ওই মুহূর্তে দুটো গুলির শব্দ হলো। দাড়িওয়ালার পেছনের নীল সুট পরা একটা লোক দিল খিঁচে দৌড়, যেন এই ছোটার ওপরই জীবন নির্ভর করছে তার।

অটোম্যাটিক পিস্তল হাতে তার পেছনে ছুটল বার্ট এনুডা।

এগারো

'ধরো, ধরো ওকে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'থামাও!'

'যেও না, যেও না!' বাধা দিতে গেল কিশোর। 'ওর হাতে পিস্তল...'

শুনতে পেল না বোধহয় রবিন। দাড়িওয়ালার হাত ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে গেল, দৌড় দিল এনুডার পেছনে।

চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে লোকে, বাজার করতে এসেছে ওরা মনে। কেউ কেউ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। কারও দিকেই তাকাচ্ছে না এনুডা। চোখ লাল, কঠিন চেহারা, তার নজর নীল সুট পরা লোকটার দিকে। মুহূর্তের জন্যেও সরাচ্ছে না। রবিনের বাড়িয়ে দেয়া পা-টাও দেখতে পেল না সে-জন্যে।

পায়ে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল এনুডা। ধড়াস করে পড়ল যেন ময়দার বস্তা। হাত থেকে ছুটে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। দোকানের জানালা-দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে খরিদ্দারেরা। বাধা দিতে বা কোন কিছু করতেই এগোচ্ছে না কেউ।

'এই, থামো!' খ্যানখ্যান করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'ছেলেটা কে?'

'চিনি না, টম,' জবাব দিল দাড়িওয়ালা লোকটা। 'আমার হাত সরিয়ে দৌড় দিল।'

ঘুরে তাকাল রবিন। সার্চলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলো প্রতিটি কোণ থেকে এসে পড়েছে তার ওপর। মেঝেতে এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে ইলেকট্রিকের তার। হেসে উঠল কয়েকজন মানুষ, টিভি ক্যামেরা হাতে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন চিৎকার করে বলল, 'ফিল্মটা রেখে দিও টম। দারুণ দৃশ্য! কাজে লাগবে পরে!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল প্রথম কণ্ঠটা। 'এই সরাও তো সব, পরিষ্কার করো। দশ মিনিটের মধ্যেই আবার শূটিং করব।'

গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে। এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল ওরা। কয়েকজন এগিয়ে গেল একটা টেবিলের দিকে, হালকা খাবার আর কোমল পানীয় রাখা ওটাতে।

ঢোক গিলল রবিন। দাড়িওয়ালা লোকটাকে তার দিকে আসতে দেখে লাল হয়ে গেল গাল। 'সব ভজকট করে দিয়েছ। আবার নতুন করে করতে হবে পুরো দৃশ্যটা।'

'সরি, স্যার, আমি ভেবেছিলাম…'

'যা করার করেছ। আর করবে না।'

দাড়িওয়ালা লোকটা চলে গেলে ফিরে তাকাল রবিন। কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। রবিন কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'ওরকম ভুল সবাই করতে পারে। তুমি না করলে আমি করতাম, বাধা দিতে যেতাম এনুডাকে।'

পেছন থেকে বলে উঠল এনুডা, 'আবার আমার পেছনে লেগেছ!'

ফিরে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'ভুল হয়ে গেছে, মিস্টার এনুডা। দেখলেনই তো…'

'একেবারে স্পষ্ট দেখেছি!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল এনুডা, 'এনুডা এনুডা করবে না। এখানে আমি নিভার ব্রাউন। আমার ক্যারিয়ার ধ্বংস করতে এসেছ নাকি?'

'না, মিস্টার এনুডা। জানতে এলাম, ডায়না মরগানকে খুনের চেষ্টা আপনি কেন করছেন?'

বড় বড় হয়ে গেল এনুডার চোখ। বুক চেপে ধরে মাতালের মত টলে উঠল। ইংরেজি নাটকের সংলাপ নকল করে বলে উঠল, *'ইউ ভাইল, ইভিল জুভেনাইল ডেলিংকোয়েন্ট!* এত্তোবড় সাহস তোমার, আমাকে খুনী বলতে এসেছ...'

'করব না-ই বা কেন? প্রাসাদে সে-রাতে রিভলভার হাতে কাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি? যে পথে দেখা গেছে আপনাকে, ওই পথ দিয়েই সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে এসে প্রাসাদের বেসিমেন্টে নামা যায়, সার্কিট ব্রেকারগুলো যেখানে আছে।'

'সার্কিট ব্রেকার? কি বলছ!'

'আরও বলতে পারি। আপনার সিলভার-প্লেটেড রিভলভারটাই বনের মধ্যে পাওয়া গেছে। গতকাল। ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে ডায়নাকে গুলি করার পর।'

'ফালতু কথা রাখো! আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হওয়ার ভয় আছে, নইলে ধরে তোমাকে এখন এমন ধোলাই দিতাম! তুমি বলছ কান্ট্রি ক্লাবে গিয়েছিলাম, আর আমি বলছি সারাদিন আমি এখানে ছিলাম। আমার পার্ট আসার অপেক্ষায়।' এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা খাতা নিয়ে এল। 'ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, এই যে দেখো, আমার হাজিরা।'

কিশোর পড়ল:

ব্রাউন, নিভার।

এসেছে–সকাল ৭.৩০।

বেরিয়েছে–বিকাল ৬.৩৫।

'বিশ্বাস হলো তো? আরেকটা কথা, আমি বেসিমেন্টে ঢুকিনি।'

'কি করে বুঝব? সেরাতে গিয়েছিলেন ম্যানশনে। চাকরদের ঘরে ঢুকেছিলেন...'

'পার্টি চলছিল। সবার চোখ এড়িয়ে কটেজে ঢোকার উপযুক্ত সময় ছিল ওটা।'

'পাঁচ মিনিট!' চিৎকার করে বলল একটা ভারী কণ্ঠ। 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট। সবাই রেডি?'

গুঙিয়ে উঠল এনুডা। 'হায়, হায়, অনেক সময় নষ্ট করলাম বকবক করে! আমি যাই!' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে।

'এখনও আমি বিশ্বাস করি না ওকে,' কিশোর বলল।

'এখানে থেকেও আর লাভ নেই। এনুডার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। চলো।'

ওদের পেছনে হুস্ করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ঢুকে পড়ল দু'জনে। এবার ভেতরে আর একজনও নেই, শুধু ওরাই।

'আমার অন্য কাজ আছে,' কিশোর বলল। 'তুমি এখানে থেকে এনুডার ওপর নজর রাখতে পারবে?'

'খুব পারব,' আগ্রহের সঙ্গে বলল রবিন।

'ও কি করে না করে সব দেখবে। দরকার হলে ওর বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে যাবে। সাবধান, ও যেন তোমাকে চিনতে না পারে।'

পিকআপের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানা রকম জিনিস আছে। বাক্স খুলে একটা

সবুজ ইউনিফর্ম বের করল কিশোর, শ্রমিকের কাজের পোশাক। 'নাও, পরে ফেলো। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ হাতে নিয়ে ময়লা টোকানোর ভান করবে। পারবে তো?'

'দেখোই না,' হেসে বলল রবিন। পোশাকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আসছি। এক মিনিট।' মহিলাদের টয়লেটের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

ফিরে এল একটু পরেই। ঠিকমত লাগেনি পোশাকটা। সামান্য ঢলঢলে হয়েছে। হাত আর পায়ের নিচের অংশ ভাঁজ করে মুড়ে রাখতে হয়েছে।

হেসে ফেলল কিশোর। 'দেখো, টিভির পরিচালক না আবার দেখে ফেলে। অভিনয়ের জন্যে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে তাহলে।'

'ভালই হবে,' হাসতে হাসতে বলল মেয়ে সেজে আসা রবিন।

তাকে রেখে পিকআপ নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। রকি বীচ মিউজিয়ামে রওনা হলো। শহরের ঠিক মাঝখানে এসে লাল আলো দেখে থামল সে। এই সময় একটা লাল গাড়ি চোখে পড়ল, একধারে থেমে রয়েছে। পরিচিত লাগল গাড়িটা। ল্যামবোরগিনি।

চিনে ফেলল। ডায়নার গাড়ি। সামনে না এগিয়ে গাড়িটার পেছনে এনে পিকআপ রাখল কিশোর। কাছের একটা স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ডিন রুজভেল্ট, হাতে একগাদা পত্র-পত্রিকা।

হাত নেড়ে ডাকল কিশোর, 'হাই, ডিন!'

ফিরে তাকাল ডিন। কিশোরকে দেখেই চোখ জ্বলে উঠল। 'কী?'

'ডায়না এসেছে নাকি?'

'না, এল আর কই? বডিগার্ডের সঙ্গে রয়ে গেছে!' বডিগার্ড শব্দটা ব্যঙ্গের সুরে বলল সে।

'আমাদের ওপর অযথাই রেগে আছো। হাহ্ হাহ্! তা কি জন্যে এসেছ?'

'গ্যারেজ থেকে গাড়িটা নিতে,' ল্যামবোরগিনিটা দেখাল ডিন। 'ডায়নাই অনুরোধ করল।'

পিকআপ থেকে নামল কিশোর। 'এত পত্রিকা কার জন্যে?'

'ওর জন্যেই। আজকের কাগজেও ওর ছবি বেরিয়েছে। বলল সব ক'টার একটা করে কপি কিনে নিয়ে যেতে।'

'ওর কাজ করে দিতে আপনার ভাল লাগে, না?'

'লাগলেই বা কি? তোমার জ্বালায় কিছু করতে পারব নাকি? আর তোমাকেই বা দোষ দিয়ে কি হবে? যতবারই ওর কাছাকাছি যেতে চাই, কেউ না কেউ এসে মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবেই।'

'এ-জন্যেই আমার ওপর রাগ, না?' হেসে বলল কিশোর। 'বিশ্বাস করুন, বাগড়া দিয়ে শয়তানি করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'তাহলে ওভাবে পিছে লেগে রয়েছ কেন?'

'রহস্যের লোভে। দারুণ একটা কেস পেয়ে গেছি। বোরজিয়া ড্যাগারকে ঘিরে জমে উঠেছে রহস্য। এর কিনারা করার জন্যেই ঘোরাফেরা করি ম্যানশনে।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ডিন। মনে হলো না, কথাটা বিশ্বাস করেছে।

'ডিন, আপনাকে পেয়ে ভালই হলো। হয়তো বুঝতে পারছেন, ডায়নাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে সাহায্য করেন না কেন?'

'ডায়নার ওপর কড়া নজর রাখছি আমি।'

'কই আর রাখলেন? এই তো, চলে এলেন এখানে। যদি এই সময়ের মধ্যে কিছু হয়ে যায়?'

'কেন, তোমার বন্ধু আছে না ওখানে?'

'হ্যাঁ, আছে। সে-জন্যেই তো বলছি, চোখ রাখার দরকার নেই। অন্যভাবে সাহায্য করুন আমাদেরকে।'

'কি ভাবে?'

'আসুন আমার সঙ্গে। রকি বীচ মিউজিয়ামে যাব। এ সবের পেছনে জুভেনারের হাত থাকতে পারে। তাহলে তাকে ঠেকাতে হবে। সাহায্য দরকার আমার। আপনি এলে ভাল হয়।'

কি যেন ভাবল ডিন। তারপর মাথা নাড়ল, 'বেশ, চলুন তাহলে।'

*

মিউজিয়ামে ঢোকার সময় চুলে হাত চালাল ডিন, অস্বস্তি বোধ করছে। শেষে বলেই ফেলল, 'কিশোর, আমি গোয়েন্দা নই। এ সব কাজ আমাকে দিয়ে কি হবে? তারচেয়ে আমি ম্যানশনে চলে যাই, ডায়নার কাছে কাছে থাকলে কাজ হবে।'

'আসুন। বেশিক্ষণ লাগবে না। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব শুধু জুভেনারকে।'

রিসিপশনিস্ট জানাল, অফিসে নেই জুভেনার। কোথায় গেছে, বলতে পারল না। ফিরতে দেরি হবে। বসা যাবে কিনা, জিজ্ঞেস করল কিশোর। রিসিপশনিস্ট বলল, 'ঠিক আছে, ওঁর অফিসে গিয়ে বসো।'

এসে বসে আছে তো আছেই ওরা। জুভেনারের দেখা নেই।

উঠে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, বিশেষ করে ডিনের চাপাচাপিতে বিরক্ত হয়েই অনেকটা, এই সময় দরজা খোলার শব্দ হলো। ফিরে তাকাল দু'জনে।

জুভেনার নয়। বাদামী সুট পরা দু'জন বিশালদেহী লোক।

'জুভেনার কই?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'তার জন্যেই তো বসে আছি আমরা,' জবাব দিল কিশোর।

'আসবে কখন?'

'জানি না। সেক্রেটারি বলল, দেরি হবে। কোথায় গেছে, জানে না।'

'হারামজাদাকে পেলে মজা দেখাতাম আজ!' হাত মুঠো করে ফেলেছে লোকটা। 'টাকা দেবে না, ওর বাপ দেবে!'

'এই, কি বলছ!' ধমক দিয়ে বলল দ্বিতীয়জন। 'মাথা সব সময়ই গরম হয়ে থাকে! চলো, পরে আসা যাবে।'

প্রথম লোকটাকে প্রায় টেলে বের করে নিয়ে গেল দ্বিতীয়জন।

টানাটানিতে একজনের কোটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে হোলস্টার. কিশোরের চোখ এড়ায়নি সেটা। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'দেখলেন?'

'কী?' অবাক হলো ডিন।

'পিস্তল। দু'জনের কাছেই পিস্তল আছে।'

'বলে কি!' ভয় পেয়ে গেল ডিন। 'তবে কি জুভেনারকে খুন করতে এসেছিল?'

'কি জানি!'

'আমি আর বসব না। চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'হ্যাঁ, সাড়ে চারটে বাজে। চলুন।'

সেক্রেটারির কাছে এসে জুভেনারের বাড়ির ঠিকানা চাইল কিশোর।

একটা কাগজে খসখস করে কিছু লিখে বাড়িয়ে দিল সেক্রেটারি।

লেখাটা পড়ে কিশোর বলল, 'হার্ড লেক। পাশের শহরটাই। ডায়নাদের বাড়ি থেকে দূরে না।' ডিনের দিকে তাকাল। 'যাবে নাকি?'

'না, বাবা, আমি পারব না!' দু'হাত নাড়ল ডিন। 'পারলে তুমি যাও। আমি ম্যানশনে যাচ্ছি।'

হাসল কিশোর। 'এত ভয় পেলেন? চলুন, আমিও যাব। মুসার সঙ্গে কথা আছে।' রসিকতার ভঙ্গিতে চোখ টিপল সে। 'দেখি, ও সরতে রাজি হয় কিনা। তাহলে খানিকক্ষণের জন্যে একলা পাবেন আপনি ডায়নাকে। ওর বডিগার্ড হওয়ার খায়েশটা পূরণ হবে।'

*

মরগান ম্যানশনের কাছে পৌঁছল দুটো গাড়ি। লাল ল্যামবোরগিনিটা আগে আগে রয়েছে, পেছনে কিশোরের পিকআপ।

ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে আসতেই গাড়ি-বারান্দায় আরেকটা গাড়ি চোখে পড়ল।

ওটার কাছে এসে পিকআপ থামিয়ে নামল কিশোর।

'এই যে, তোমরা এসেছ। ডায়না কোথায়?'

ফিরে তাকাল কিশোর। প্রাসাদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন তার দিকে ডক্টর নরিয়েমা। প্রশ্নটা তিনিই করেছেন।

ল্যামবোরগিনির দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল ডিন। 'কেন, মুসার সঙ্গেই তো ছিল! এখানেই থাকার কথা!'

অবাক হলেন ডক্টর। 'বলো কি? আমি এসে দেখি, দরজা খোলা। ওরা নেই!'

কিশোর আর ডিনও অবাক হলো। শঙ্কা ফুটল ডিনের চোখে।

'খোঁজ করা দরকার!' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। ডিনকে পাঠাল প্রাসাদে খুঁজতে। সে চলল গ্যারেজে দেখতে।

চারটে দরজাই খোলা। লনে কাজ করার যন্ত্রপাতি আর কিছু গ্রিল পড়ে থাকতে দেখা গেল গ্যারেজের দুটো ঘরের ভেতরে, বাকি দুটো পুরো খালি।

গাড়ি নিয়ে গেছে, ভাবল কিশোর। ফিরে চলল প্রাসাদে।

মাঝপথে থাকতেই দরজায় দেখা দিল ডিন। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে

ডাকল

দৌড় দিল কিশোর।

'ড্যাগার! ড্যাগার!' চেঁচিয়ে বলল ডিন।

'কি হয়েছে?' কিশোর জানতে চাইল।

ডিনের চোখে ভয়। 'নেই ওটা!'

ডিনের পাশ কাটিয়ে ছুটে পারলারে ঢুকল কিশোর। আবার জায়গামত ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে বুককেসটা, ছবিগুলো ঝোলানো রয়েছে ঠিকমতই। সোজা সাইডবোর্ডের দিকে এগোল সে। পড়ে রয়েছে কাঁচের বাক্স। ডালা খোলা। ছুরিটা নেই ভেতরে। দরজায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডক্টর নরিয়েমার দিকে তাকাল সে।

'ডিন, ওপরতলায় খুঁজুন,' কিশোর বলল। 'ডক্টর, আপনি হলওয়ে আর সিটিংরূমে দেখুন। আমি এখানে দেখছি। বলা যায় না, মুসাও লুকিয়ে রেখে যেতে পারে।'

সমস্ত পারলারে তন্নতন্ন করে খুঁজল কিশোর। ড্রয়ার, কার্পেটের নিচে, বইয়ের ফাঁকে—মোট কথা ছুরি লুকানো যায় এ রকম কোন জায়গা বাদ দিল না

নেই।

ডিন আর ডক্টর নরিয়েমা ফিরে এল শূন্য হাতে। দু'জনেই মাথা নাড়ল।

'কি হতে পারে বলো তো?' ডিনের প্রশ্ন। 'ডায়নাকে কিডন্যাপ করল নাকি কেউ? সেই সাথে ছুরিটাও নিয়ে গেল?'

'আমার তা মনে হয় না। গাড়ি নেই যেহেতু মুসাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরোতে পারে। বসে থেকে থেকে বোর হয়ে গিয়েছিল হয়তো। কোথায় যেতে পারে, বলুন তো?'

'কান্ট্রি ক্লাব!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ডিন।

'কিংবা মলে!'

'বেশ। ডক্টর, আপনি আর আমি চলুন ক্লাবে যাই। ডিন, আপনি মলে যান।'

বাইরে বেরোতেই দেখা গেল একটা গাড়ি আসছে। ডায়নার ওটা। গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল ওটা। দরজা খুলে নেমে এল ডায়না আর মুসা। অবাক দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ডায়না জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?

'কোথায় গিয়েছিলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'ঘুরতে। ভাল্লাগছিল না বসে থেকে থেকে। কিন্তু হয়েছেটা কি? মুখ অমন করে রেখেছ কেন? কি ব্যাপার?'

'আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।'

'আমার জন্যে? কেন? সাথে তো মুসাই আছে। আর আমি কচি খুকি নই। বেরোতেই পারি যখন খুশি।'

'তা পারেন। ভাবতাম না, যদি বোরজিয়া ড্যাগারটা গায়েব না হয়ে যেত।'

'কি বললে!'

'ঠিকই বলছে,' বললেন নরিয়েমা। খুলে বললেন, কি হয়েছে।

থমথমে হয়ে গেছে ডায়নার চেহারা। একটা কথাও আর না বলে চুপচাপ

ঘরে ঢুকস, ছুরির বাক্সটা দেখার জন্যে।

*

'আমি জুভেনারের ওখানে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল কিশোর। 'সারাটা বিকেল ওর অফিসে বসে থেকে এসেছি। ফেরেনি। সে-ও এসে ছুরিটা চুরি করে নিয়ে পালাতে পারে।'

'তা পারে,' ডায়না বলল। 'কারণ বাড়ির দরজা-জানালা খোলাই ছিল।'

'ভুল করেছ,' গম্ভীর হয়ে বললেন ডক্টর। 'এত দামী দামী জিনিস রয়েছে ঘরে। তালা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

'যায়নি যখন, কি আর করা?' কিশোর বলল। 'জুভেনারের বাসার ঠিকানা নিয়ে এসেছি। কারও ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।'

মাথা নাড়ল ডায়না আর ডিন। আর ডায়না যেহেতু থাকছে, মুসাও যাবে না। ডক্টর নরিয়েমা বললেন, 'আমি যাব। লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে আমার। জিজ্ঞেস করব, মেয়েটাকে এত জ্বালাচ্ছে কেন!'

ক্লিফসাইড হাইটস পেরিয়ে এল ওরা। শর্ট নেক চেনেন নরিয়েমা, কিশোরকে পথ বলে দিতে থাকলেন। পথের দু'ধারে এখন ছোট ছোট বাড়ি আর টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া বিশাল ম্যাপল গাছ। বাড়িঘরগুলো দেখতে সব প্রায় একই রকম। সাদা রঙ করা দেয়াল, ছিমছাম লন আর সুন্দর ফুলের বাগান। ঠিকানাটা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে কিশোর। নম্বর দেখছেন নরিয়েমা। একটা বাড়ি দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওটাই।'

অন্য বাড়িগুলোর মত পরিচ্ছন্ন নয় এটা। আগাছা সাফ হয় না বহুদিন। সর্বত্র অযত্নের ছাপ।

'গাড়িটাড়ি তো দেখছি না,' কিশোর বলল। 'বোধহয় বাড়ি নেই।'

'এখন কি করবে তাহলে?'

'আপনি গাড়িতে বসুন। আমি দেখে আসি।'

শূন্য ড্রাইভওয়ে ধরে হেঁটে চলল কিশোর। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ময়লা, জঞ্জাল ফেলে রেখেছে যেখানে সেখানে। নোংরা করে রেখেছে জায়গাটা।

সামনের দরজায় এসে ঘণ্টা বাজাল সে।

জবাব নেই।

আবার বাজাল। সাড়া মিলল না এবারেও। তৃতীয়বার বাজিয়ে, জবাব না পেয়ে পাশের একটা জানালার কাছে চলে এল। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল কেউ নেই। ফিরে এল পিকআপের কাছে।

'কি? আছে?' জিজ্ঞেস করলেন নরিয়েমা।

'না। বিছানা এলোমেলো। টেবিলে পড়ে আছে অধোয়া থালা-বাসন। দেখে মনে হয়, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেছে।'

'তার মানে পালিয়েছে। ছুরিটা চুরি করে।'

'হতে পারে। কিন্তু এর কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না আমি। জুভেনার চায় সমস্ত জিনিস যেগুলো মিউজিয়াম থেকে নিয়ে এসেছে ডায়না। শুধু একটা ছুরি চুরি করে পালাবে কেন?' প্রশ্নটা এখন হঠাৎ করেই উদয় হলো কিশোরের মাথায়।

বারো

'একটা মুহূর্তও আর এ ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার,' ডায়না বলল। 'কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।'

'তা ঠিক,' মাথা দোলালেন নরিয়েমা। 'ভাল না লাগলে, চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। রাতের খাওয়াটাও কোন রেস্টুরেন্টে সেরে নেয়া যাবে। চলো, আজ আমিই খাওয়াব তোমাদের।'

'আইডিয়াটা মন্দ না,' কিশোর বলল। 'কোন্ রেস্টুরেন্টে যাবেন?'

'ডিলমারস প্লেস।'

'চমৎকার জায়গা!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'রান্না খুবই ভাল। দামও বেশি।'

'দামের জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের,' হাসলেন ডক্টর।

মুসার দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'ঠিক আছে, তুমি যাও ওদের সঙ্গে। আমি রবিনকে নিয়ে চলে আসব সময়মত। মলে রেখে এসেছি ওকে, এনুডার ওপর নজর রাখার জন্যে।'

*

পিকআপটাকে দেখে হাসল রবিন। তার গাড়ির পেছনে পিকআপ থামাল কিশোর। এনুডার বাড়ি থেকে ব্লকখানেক দূরে।

নেমে এগিয়ে এল সে। জানালার কাছে ঝুঁকে বলল, 'মলে গিয়েছিলাম। দেখলাম, শূটিং শেষ। তুমি নেই, এনুডা নেই। ভাবলাম, এখানেই এসেছ। তা খবর কি?'

'বিরক্ত হয়ে গেছি। শূটিং শেষ করে সোজা বাড়ি চলে এসেছে এনুডা। তারপর সেই যে গিয়ে ঘরে ঢুকেছে, বেরোনোর আর নামই নেই।'

'সন্দেহ হয় এমন কিছু চোখে পড়েছে?'

'নাহ্। একটা দৃশ্যেরই ছবি তোলা হলো কয়েকবার করে। অনেক দর্শক ভিড় করে বসে থাকল চারপাশে গোল হয়ে। কাজ শেষ করে ঘণ্টা দুয়েক আগে বাড়ি চলে এসেছে এনুডা।'

'কেউ দেখা করেছে তার সঙ্গে?'

'করেছে, একটা মোটা লোক। মাথায় টাক। চোখে ভারী চশমা ; ছ'টার সময় ওকেই দেখা করতে বলেছে বোধহয় এনুডা। ওর নামই হয়তো ফ্র্যাঙ্ক।'

'হু। ভেতরেই আছে এখনও?'

'না। এসে, কয়েক মিনিট থেকেই চলে গেছে।'

'বোঝা গেছে। এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের।' ভুরু নাচিয়ে মিটিমিটি হাসল কিশোর। 'রাতে খাবে কোথায়?'

'কেন, বাড়িতে!' অবাকই হলো রবিন।

'চলো না, কোন রেস্টুরেন্টে চলে যাই?'

কিশোরের দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। 'ব্যাপারটা কি, বলো

তো? হঠাৎ এ ভাবে খাওয়ার দাওয়াত?'

খুলে বলল সব কিশোর, ছুরি হারানো থেকে শুরু করে, সব।

*

ডায়নার মনমেজাজ খারাপ থাকায় খাওয়াটা তেমন জমল না। বিল মিটিয়ে দিলেন নরিয়েমা। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কোথায় যাবে?'

'বাড়ি,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল ডায়না। 'ঘুম পেয়েছে আমার।'

গাড়ি মোট তিনটে। ডায়নার ল্যামবোরগিনি, কিশোরের পিকআপ, আর রবিনের গাড়ি। তিনজনকে ড্রাইভ করতে হবে।

কিশোরকে অনুরোধ করে বসল ডায়না, 'কিশোর, তুমি চালাও না আমারটা! আমার চালাতে ইচ্ছে করছে না!'

ঝট করে ডিন আর রবিনের দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। ডিনের চোখে রাগ। রবিনের মিটিমিটি হাসি। বোধহয় কিশোরকে ডায়নার শোফার হিসেবে কল্পনা করেই হাসি পাচ্ছে তার।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ডিন আর রবিনের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসল কিশোর।

কিশোর আর ডায়না উঠল ল্যামবোরগিনিতে। রবিনের গাড়িতে রবিন একা। পিকআপে মুসা আর ডক্টর নরিয়েমা। ডিন কারও গাড়িতে উঠল না। সে আশা করেছিল গাড়িটা চালাতে বলবে ওকে ডায়না। সে-অপেক্ষাতেই ছিল। সেটা যখন হলো না, মেজাজ খারাপ করে চলে গেল সে। হুমকি দিয়ে গেল, ছুরিটা আর ফেরত পাবে না ডায়না!

সবাই চলল ওরা মরগান ম্যানশনের দিকে। ডিনই বা এ কথা বলল কেন, আর ডায়নাই বা ডিনকে উঠতে না দিয়ে কিশোরকে গাড়ি চালাতে বলল কেন, দুর্বোধ্য ঠেকল সবার কাছে। তবে এ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না কেউ।

পথে নরিয়েমার বাড়িতে তাঁকে নামিয়ে দেয়া হলো।

রাস্তায় কোন অঘটন ঘটল না।

তবে বাড়ি পৌঁছে ডিনের ছুরি না দেয়ার কথাটা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কিশোর। প্রথমে রেগে উঠল ডায়না। তারপর আমতা আমতা করতে লাগল। চেপে ধরল তাকে কিশোর, 'ছুরিটা কোথায় আপনারা জানেন, তাই না?'

'না না…আ-আমি…কিছু…' থেমে গেল ডায়না। তারপর রেগে উঠল, 'আমাকেই চোর ভাবছ?'

'সব কথা জানতে চাই আমি, ডায়না,' ভারী হয়ে গেছে কিশোরের কণ্ঠস্বর। 'খুলে বলুন।'

এমন কিছু ছিল কিশোরের কণ্ঠে, প্রতিবাদ করার সাহস করল না আর ডায়না। ঠোঁট কেঁপে উঠল তার। ধপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়। ঝাঁকুনি লেগে চুল এসে পড়ল মুখের ওপর, সরানোর চেষ্টা করল না। 'আমাকে খুন করার চেষ্টা কে করেছে, জানি,' মোটা খসখসে হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।

'কে? এনুডা?'

মাথা নাড়ল ডায়না। 'না। এনুডাও নয়, জুভেনারও না।'

'তাহলে?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল ডায়না। চোখে পানি নিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে, যেন করুণার আশায়।

'কে, ডায়না?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখের পানি আর ঠেকাতে পারল না ডায়না। 'আমি আর ডিন! সমস্ত ব্যাপারগুলো ছিল সাজানো!'

চমকে যাওয়া সব ক'টা মুখের দিকে এক এক করে তাকাল সে। আর পেটে রাখতে পারল না কথা, গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল সব, 'আব্বার রেখে যাওয়া সব টাকা বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে, বেহিসেবী খরচ করে শেষ করেছি আমি। উড়িয়ে দিয়েছি কিছুদিনের মধ্যেই। টাকা ওড়ানো যে এত সহজ, জানতাম না! হঠাৎ একদিন দেখি খালি হয়ে গেছে অ্যাকাউন্ট। চাকর-বাকরের খরচ দিতে পারছি না। বিদেয় করে দিতে হলো ওদেরকে। শুধু যে অ্যাকাউন্টই খালি হয়েছে, তা নয়, ধারও হয়েছে অনেক। ম্যানশনটা বিক্রি করে দিলেও সে-ধার শোধ করে খুব সামান্যই বাকি থাকে। ওই টাকা দিয়ে রকি বীচে কোনমতে ছোটখাট একটা বাড়ি কেনা যায়। খাওয়া-পরার জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না আমার। সে-জন্যেই মিউজিয়াম থেকে আর্ট কালেকশনগুলো ফেরত নিয়ে এসেছি আমি,' বলে গেল ডায়না। 'জানি, বেআইনী ভাবেই করেছি কাজটা। দলিলটা হারিয়ে ফেলেছে জুভেনার, এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। নিয়ে এসেছি বিক্রি করার জন্যে।' চোখের পানির সঙ্গে কালো মাসকারা গাল বেয়ে নামছে তার।

'বলে যান,' কিশোর বলল। 'এর সাথে ড্যাগার চুরি আর খুনের চেষ্টার সম্পর্ক কি?'

'বোরজিয়া ড্যাগারটা নিয়ে বিজ্ঞাপন করা হয়েছে বেশি, নানা রকম ভাবে, গল্প বলে, সিনক্রিয়েট করে। খুনের চেষ্টাগুলো সব সাজানো—বন থেকে আমাকে সই করে গুলি ছোঁড়া, সুইমিং পুলে তার ফেলে রাখা, সব।'

'কেন?'

'বললাম না, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের জন্যে। রিপোর্টাররা এসেছে। ফলাও করে খবর ছেপেছে। বিখ্যাত হয়ে পড়েছে বোরজিয়া ড্যাগার। ভাল দাম আশা করেছিলাম আমরা। তা-ই হতে যাচ্ছিল। দু'একজন মোটা টাকা অফারও দিয়ে ফেলেছে। ডিন আমাকে ভালবাসে,' চোখ নামিয়ে দিল ডায়না। 'আমি বাসি না। কিন্তু তার এই দুর্বলতাটা কাজে লাগিয়ে তাকে দিয়ে এ সব করিয়ে নিয়েছি আমি। একটা মানুষকে কতদিন আর গাধা বানিয়ে রাখা যায়? বুঝতে পেরে সরে গেছে সে!'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

তারপর মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ছুরিটা কোথায়?'

'বাগানে। একটা ফুলের বেডের মধ্যে রেখেছিলাম...'

'কখন?'

'তুমি তখন বাথরুমে গিয়েছিলে। এই সুযোগে ওটা বাক্স থেকে বের করে

নিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। দরজার দিকে রওনা হলো।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ডায়না। 'পাবে না। এতক্ষণে নিয়ে গেছে নিশ্চয় ডিন।'

'তাহলে তাকে খুঁজে বের করব।'

ঠিক এই সময় দপ করে নিভে গেল সমস্ত আলো।

তেরো

'ডিন, ডিনের কাজ!' চিৎকার করে বলল ডায়না। 'আমাকে খুন করবে এবার! প্রতিশোধ নেবে! পাগল হয়ে গেছে!'

'আল্লাহই জানে, কি করবে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'হাতে ছুরি আছে যখন...'

'আছে কোথায় ও?' রবিনের প্রশ্ন।

'আউফ!' করে উঠল অন্ধকারে মুসা।

'কি হলো!' কিশোর উদ্বিগ্ন।

'কে যেন পা মাড়িয়ে দিল! ডায়নাই হবে!'

'তোমার পা?' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ডায়না। 'আমি টর্চ খুঁজছি...'

ড্রয়ার খোলার শব্দ হলো। অন্ধকার চিরে দিল টর্চের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।

'দুটো আছে,' ডায়না বলল।

'আমাকে একটা দিন,' বলল মুসা।

'এই, চুপ! শোনো!' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। সবাই শুনতে পেল বিচিত্র শব্দটা। থেমে গেল হঠাৎ।

'এল কোত্থেকে?' বুঝতে পারছে না ডায়না।

'কি জানি!' বুঝতে পারল না মুসাও। 'মনে হয় নিচে কোন জায়গা থেকে। দেখি, আলোটা জ্বালানো যায় কিনা।'

সেলারের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। টান দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকল। সারকিট ব্রেকারের বাক্সটার কাছে এসে আলো ফেলল। মেইন সুইচ অফ করা। টান দিয়ে তুলে দিল ওটা। নিশ্চয় আলো জ্বলেছে, নিজেকে বলল সে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল আগের মতই অন্ধকারে রয়েছে প্রাসাদ। আলো জ্বলেনি।

'মেইন লাইনের তারটার কেটে দিয়েছে,' অনুমান করল কিশোর। 'আলো নেভাল,' চিন্তিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ, 'অথচ আসছে না! ও কিছু করার আগে আমাদেরই ওকে খুঁজে বের করা উচিত। এসো তো।'

টর্চের আলোয় পথ দেখে সামনের দরজার দিকে এগোল চারজনে। গ্রীষ্মের রাতের ভ্যাপসা গরম, আঠা আঠা করে দেয় ঘাম। এই পরিবেশে ওদের মনে হলো সব কিছুই যেন খুব ধীরে ঘটছে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত। পুরানো কাঠ আর ধুলোয় ঢাকা কার্পেটের গন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে। একের পর এক ঘরে

ঢুকছে ওরা, আর একই রকম গন্ধ পাচ্ছে।

হঠাৎ থ্যাক করে একটা শব্দ হলো। ঝটকা দিয়ে মুখ তুলল কিশোর। ওপরে তাকাল। এক দৌড়ে হল পেরিয়ে এসে উঠল সিঁড়িতে। ঠিক পেছনে রয়েছে মুসা। সিঁড়ির মাথায় উঠে হলঘরে টর্চের আলো ফেলে দেখল। শূন্য ঘর।

'ভুল করছেন আপনি, ডিন,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'আমরা চারজন, আর আপনি একা। কিছুতেই পারবেন না। গোলমাল না করে বেরিয়ে আসুন। কিছু বলব না আপনাকে।'

সাড়া নেই।

'ডান দিকে হয়েছিল শব্দটা,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

দেয়ালের দিকে পিঠ করে পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল সে আর মুসা। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধ। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটা সেকেন্ড।

তারপর হঠাৎ এক লাথি মেরে পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর। পরক্ষণেই সেঁটে গেল দেয়ালের সঙ্গে।

ঝটকা দিয়ে খুলে দেয়ালের সঙ্গে খটখট করে বাড়ি খেলো পাল্লাটা। কেউ বেরিয়ে এল না ঘর থেকে। টর্চ জ্বেলে ঘরে আলো ফেলল কিশোর। বড় একটা বিছানা রয়েছে, চারপাশে বেশ কিছু আসবাবপত্র। একটা আলমারির কাছে এসে টান দিয়ে খুলল দরজা। ভেতরে তিনটে কোট ঝুলছে হ্যাঙারে।

'পালিয়েছে,' মুসা বলল।

'কিন্তু কোন্ পথে?' কিশোরের প্রশ্ন। আবার বেরিয়ে এসে হলঘরে আলো ফেলল। 'ডায়না আর রবিনই বা কোথায়? কোন সাড়া নেই!'

তার কথার জবাবেই যেন উল্টো দিক থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

দৌড় দিল দু'জনে। একটা ঘরে শব্দ শোনা গেল। ছুটে ভেতরে ঢুকল ওরা। মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে একটা দেহ, টর্চের আলো পড়ল তার ওপর।

'রবিন!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। 'কি হয়েছে, রবিন?' হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে।

'উফ, কানটা...!' কান চেপে ধরে আছে রবিন।

'দেখি তো,' রবিনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে কানের দিকে তাকাল কিশোর। 'আরি, রক্ত পড়ছে তো! অবশ্য বেশি কাটেনি।'

'এখানে কি করছিলে তুমি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি আর ডায়না ভাবলাম পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই। ও সোজা তিনতলায় উঠে গেল। আমি দোতলায় উঠতেই একটা শব্দ কানে এল।'

'তারপরেই তুমি এখানে এসে ঢুকেছ?' কিশোর বলল। 'টর্চ ছাড়া?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'এখানে ঢুকতেই শুনলাম, পেছনে কে যেন ফিসফিস করে ডায়নার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে চেয়ে আবছা একটা মূর্তিকে দেখলাম, ডিনের মতই লাগল। ছুরি চালাল। সরে গিয়েছিলাম, ফলে শুধু কানে একটু খোঁচা লেগেছে। চিৎকার করে উঠলাম। ও বুঝে ফেলল আমি কে। গাল দিয়ে উঠে

দৌড়ে চলে গেল।' কেঁপে উঠল রবিন। 'লোকটা পুরো পাগল হয়ে গেছে!'

'ভাগ্যিস কান ছাড়া আর কিছু কাটতে পারেনি,' কিছুটা রসিকতা করেই বলল মুসা।

কান দিল না রবিন। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না! ডিনের মাথা এখন খারাপ! ডায়নাকে পেলে ছাড়বে না। জলদি চলো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো!'

ওপরতলা থেকে হঠাৎ আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। প্রতিধ্বনি তুলল প্রাসাদের দেয়ালে। ছুটতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে কিশোর, মুসা আর রবিন। বড় একটা চিলেকোঠায় এসে ঢুকল।

ঢালু হয়ে নেমে গেছে কাঠের সিলিং। শেষ প্রান্তে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডিন আর ডায়না।

'সরো, জানোয়ার কোথাকার!' হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচিয়ে উঠল ডায়না। ছুরিটা তুলে ধরেছে ডিন। একবার টেবিলের এ পাশ ঘুরে, আরেকবার ওপাশ ঘুরে পৌঁছতে চাইছে ডায়নার কাছে।

'এই, ফেলো ওটা!' দরজার কাছ থেকে বলল কিশোর।

ঝট করে ঘুরে তাকাল ডিন। মুখে পড়েছে কিশোরের টর্চের আলো।

বিকট চিৎকার করে টেবিলের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ডিন। প্রায় পিছলে চলে এল আরেক পাশে। ছুরি তুলে ছুটে এল কিশোরকে মারার জন্যে। কাছে এসে প্রথমেই থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে টর্চটা ফেলে দিল। মেঝেতে গড়াতে শুরু করল ওটা, তবে আলো নিভল না। থাবা দিয়ে ধরতে গিয়েও পারল না কিশোর, চলে গেছে আওতার বাইরে।

'বোরাজয়া ড্যাগারের স্বাদ দেখো কেমন লাগে!' সাপের মত হিসহিস করে উঠল ডিন।

দাঁড়িয়ে রইল না মুসা। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল টর্চটা, দু'জনের গায়ের ওপর ফেলে দেখল, ডিনের ছুরিধরা হাতটা ধরে ফেলেছে কিশোর। কব্জির ওপরটায় একহাতে ধরে মোচড় দিয়ে আরেক হাতে কিছু একটা করল সে, ছুরিটা প্রায় উড়ে চলে গেল ডিনের হাত থেকে। খটাং করে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ঘরের সবাই ছুটল ওটার দিকে। কিশোর, ডিন, রবিন, মুসা, ডায়না, সব্বাই। একসাথে হাত বাড়াল ওটা তুলে নেয়ার জন্যে। শুধু একজনের হাত পৌঁছল ওটার ওপর।

'সরো! সরে যাও!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করল রবিন আর ডায়নাকে।

মাথার ওপর ছুরিটা তুলে ঘোরাতে লাগল ডিন।

হঠাৎ লাফিয়ে এসে পড়ল ডায়নার ওপর। বাহু দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরল। চেঁচানোর চেষ্টা করল ডায়না, স্বর বেরোল না ঠিকমত, 'আ-আ···মার···দম···'

ছুটে গেল কিশোর-মুসা।

'সরো!' ছুরিটা ডায়নার গলায় ঠেকিয়ে ধমক দিয়ে বলল ডিন।

মাঝপথেই দাঁড়িয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

'এ রকম হওয়ার কথা তো ছিল না, ডায়না!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে ডিনের কণ্ঠ। 'কত কষ্ট করে, আলাপ-আলোচনা করে প্ল্যান করেছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা সুখে কাটাব দু'জনে। কিন্তু তুমি সব নষ্ট করেছ। সব শেষ করে দিয়েছে তোমার লোভ। কি, করেনি?'

'ডি-ডিন, ছাড়ো…!' শরীর মুচড়ে গলা ছাড়ানোর চেষ্টা করল ডায়না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

প্যাঁচ আরও শক্ত করল ডিন। 'আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ, স্বীকার করো সে-কথা! করতে লজ্জা লাগছে? বলো, নীলামের সমস্ত টাকা মেরে দেয়ার ফন্দি করোনি তুমি? আমাকে ফাঁকি দিতে চাওনি?'

'নাআআ…!' হাঁসফাঁস করছে ডায়না। 'ছাড়ো, প্লীজ…'

ঠেলে নিয়ে চলল তাকে ডিন। ধাক্কা দিয়ে ফেলল একটা কেবিনেটের ওপর। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ওটার দরজা। অসংখ্য প্লেট আর রূপার তৈজসপত্রের ফোয়ারা ঝরতে লাগল যেন। ওপর দিকে তাকাল সে। কিছুটা ঢিল হয়ে গেল বাহুর বাঁধন।

সুযোগটা কাজে লাগাল ডায়না। ঝাড়া মেরে গলা ছোটাল, তবে বাসনে পা পিছলে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ঝনঝন করে পড়ছে জিনিসপত্র।

আলো নিভিয়ে দিল মুসা। নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হলো লড়াই। শেষ হলো ভোঁতা একটা ধুপ্ শব্দ দিয়ে।

আবার যখন আলো জ্বালল মুসা, দেখা গেল ডিনের ভূপাতিত নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। ডান হাতের আলগা মুঠোয় পড়ে আছে বোরজিয়া ড্যাগার।

'বেশি জোরে মারলাম না তো?' হাতের টর্চটা নেড়ে হেসে বলল মুসা। 'মরে না গেলেই বাঁচি।'

'আরে নাআহ্, ঠিক হয়ে যাবে,' ডায়নাকে টেনে সরিয়ে নিতে নিতে বলল কিশোর।

'মেরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই!' ফুঁপিয়ে উঠল ডায়না।

'আর পারবে না,' অভয় দিল কিশোর।

বাইরে একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো।

'কে এল?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি!' মুসা বলল।

এখনও কাঁপছে ডায়না। ধরে ধরে তাকে এনে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল কিশোর।

'সব আমার দোষ, কিশোর,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ডায়না। 'আমি আর ডিনই সব করেছি…'

'এক মিনিট,' হাত তুলল রবিন। হাতের টর্চটা ঘোরাল ডায়না আর ডিনের ওপর। 'একটা ব্যাপার বাদ পড়ে যাচ্ছে। ধরলাম, বনের ভেতর থেকে গুলি করেছিল ডিন। সুইমিং পুলে বিদ্যুতের তার ফেলে রাখাটাও ওর কাজ। কিন্তু

সেদিন পার্টিতে ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিয়ে মূর্তিটা ঠেলে ফেলল কে: সেটা তো তার কাজ হতে পারে না?'

ডায়নার দিকে তাকাল কিশোর-মুসা। পেছনের সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ হলো।

'কি, জবাব দাও?' ডায়নার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন। দরজার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল ডায়না। ঘরে ম্লান আলো এসে পড়ল।

ফিরে তাকাল অন্যেরা।

হাতে একটা কেরোসিনের বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর নরিয়েমা। মুখে কুৎসিত হাসি। হাতের পিস্তলটা তুলে বললেন, 'এই যে তোমার জবাব।'

চোদ্দ

'ডায়না, সব ভণ্ডুল করে দিয়েছ তুমি,' নিমের তেতো ঝরল যেন ডক্টরের কণ্ঠে। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'সব ঠিকঠাক চলছিল। এ রকম যে ঘটবে ভাবতেই পারিনি।'

'আমাদেরকে খুন করবেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ডায়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াও তোমরা তিনজন,' তিন গোয়েন্দাকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'ডিনের কাছে। ডায়না, সরো। সেটটা এমনভাবে সাজাব, যাতে মনে হয়, তিনজনকে খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে ডিন।' খিকখিক করে হাসলেন তিনি। 'খবরের কাগজে হেডিং কি বেরোবে, এখনই আন্দাজ করতে পারছি। দারুণ খবর ছাপবে ওরা। সব দোষ পড়বে ছুরিটার ঘাড়ে। ফলাও করে ওরা লিখবে, বোরজিয়া ড্যাগারের রক্তলালসার কারণে মারা পড়ল এতগুলো তরুণ প্রাণ। আহারে!' পিস্তল নাড়লেন তিনি। 'দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও।'

ধীরে ধীরে ডিনের দিকে এগোল ওরা।

'প্লীজ, খালা…'

'চুপ! এখানে এসো! আমার পাশে!'

পিস্তলটা এখন কিশোরের দিকে ধরে রেখেছেন ডক্টর। উঠে দাঁড়াল ডায়না, টলমল করছে পা, যেন যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। 'আমি…আমি আপনাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, খালা। আপনাব কথা বলিনি ওদেরকে। কেন এলেন? কারোই তেমন কোন ক্ষতি হত না…'

'আমার হত! সব টাকা পানিতে যেত! জুভেনার সমস্ত মাল ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমার টাকাগুলোর কি হত?' মাথা নাড়লেন ডক্টর। 'আমি তা হতে দিতে পারি না।'

ভাবনার ঝড় বইছে কিশোর-মুসার মাথায়। চোখ বোলাচ্ছে সারা ঘরে। মুক্তির উপায় খুঁজছে।

'হাত তোলো!' কড়া আদেশ দিলেন ডক্টর। 'সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তোমাদের ফন্দি বুঝতে পারছি না আমি মনে করেছ?'

কিছু করার নেই ওদের। আদেশ মানতে বাধ্য হলো। হ্যারিকেনের আলো কেমন ভূতুড়ে ছায়া ফেলেছে ঘরের ভেতর। ডিনের কাছাকাছি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। ডায়না এগোল দরজার দিকে।

'এই মেয়ে, জলদি করো না!' খেঁকিয়ে উঠলেন ডক্টর। 'সারারাত দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?'

বুকের ওপর ঝুলে পড়তে চাইছে ডায়নার মাথা, এতই ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাকে। তবে নরিয়েমার আদেশ পালন না করে পারল না।

'ধরো,' হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর। 'শক্ত করে ধরে রাখো। খবরদার, ছাড়বে না!' ডায়না বাতিটা হাতে নিতেই দু'হাতে ধরলেন পিস্তলটা, যাতে গুলি করার সময় না নড়ে। প্রথমে কিশোরের দু'চোখের মাঝখানে নিশানা করলেন।

'মারতে খারাপই লাগছে। চালাক-চতুর ছিলে। স্বভাবও ভাল,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর। 'কিন্তু উপায় নেই।'

তারপর ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা। অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে গেল ঘরের আলো। গুলির শব্দ হলো। শোনা গেল আরেকটা চিৎকার।

দরজার দিকে ঘুরে গেল কয়েক জোড়া চোখ। হ্যারিকেনের সলতে পুরো বাড়িয়ে দিয়েছে ডায়না। ডক্টরের চোখের সামনে ধরে রেখেছে।

'শয়তান!' উন্মাদ হয়ে গেছে ডায়না। 'যত নষ্টের গোড়া তুমি! ডিনকে জানোয়ার বানিয়ে ছেড়েছ! আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছ! তোমাকে শেষ করব এবার আমি...'

হ্যারিকেনটা ডায়নার হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন নরিয়েমা। টানাটানিতে ছুটে গেল ওটা ডায়নার হাত থেকে, ডক্টরও ধরে রাখতে পারলেন না, মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ, গড়িয়ে চলে গেল টেবিলটার তলায়। তবে আলো নিভল না।

'ভেবেছিলাম তোকে কিছু করব না!' ভীষণ রেগে গেছেন নরিয়েমা। 'এবার তোকেও শেষ করব!'

ডায়নার দিকে পিস্তল ঘোরালেন তিনি।

এটাই সঠিক সময়। নড়ে উঠল রবিন। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ডক্টরের সামনে। দা চালানোর মত করে কোপ মারল তাঁর হাতে। পিস্তলটা খসে পড়ে গেল।

আহত বিড়ালের মত চিৎকার করে উঠে পিস্তলটা তুলে নেয়ার জন্যে পা বাড়ালেন ডক্টর। লাথি মেরে পিস্তলটা সরিয়ে দিল রবিন। হ্যারিকেনের কাছে গিয়ে পড়ল ওটা।

দেখে প্রথমটায় কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। পুরানো কাঠের মেঝেতে কেরোসিন পড়েছে, আগুন ধরে গেছে তাতে। শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে টেবিলের পায়া, তাতেও আগুন ধরল।

'নেভাও! নেভাও!' চিৎকার করে বলল ডায়না।

'ফায়ার এক্সটিংগুইশার কোথায়!' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আমি জানি না...'

এর বেশি আর শোনার অপেক্ষা করল না কিশোর-মুসা। যেভাবে শুকিয়ে রয়েছে কাঠ, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে দেরি হবে না। একটানে রবিনকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল কিশোর। বেরোনোর আগে ডক্টরের হাতও চেপে ধরল। দু'জনকেই টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মুসাও দাঁড়িয়ে নেই। ডিনকে তুলে নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

ডায়নাকে কিছু বলতে হলো না। সে নিজে নিজেই ছুটে বেরোল দরজা দিয়ে।

যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ি দিয়ে নামল ওরা। সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল কামানের গোলার মত সবাই, শুধু মুসা বাদে। ডিনকে বয়ে নিতে হচ্ছে তাকে।

বাইরে বেরিয়ে দেখল পুলিসের একটা গাড়ি এসে থেমেছে। দু'জন পুলিস নেমে দৌড়ে এল প্রাসাদের দিকে।

'বেরিয়েছে!' চেঁচিয়ে বলল একজন।

কিশোরকে গালাগাল করতে করতে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন নরিয়েমা।

ছাড়ল না কিশোর। টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে এগোল পুলিসের গাড়ির দিকে। দু'জন পুলিসের একজন ওদের চেনা, পল নিউম্যান। উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে জানাল কিশোর, 'তিনতলায় আগুন লেগেছে!'

'দেখেছি,' জবাব দিল পল। 'ফোন করে দিয়েছি দমকলকে।' ভুরু কোঁচকাল সে। 'গুলির শব্দ শুনলাম মনে হলো?'

'দেখুন অফিসার,' অভিযোগ শুরু করলেন ডক্টর, 'এই গুণ্ডাটা আমাকে...'

'কিশোর, ওভাবে টানাহেঁচড়া করছ কেন মহিলাকে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? ছাড়ো, ছাড়ো...'

'মিস্টার নিউম্যান,' কিশোর বলল, 'গুলি যেটা শুনেছেন, এই মহিলাই ছুঁড়েছে। আমাকে মারার জন্যে।'

সন্দেহ মেশানো বিস্ময় দেখা দিল পলের চোখে। একবার মুসার দিকে একবার কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল। 'এই মহিলা!'

'হ্যাঁ।' মুসা জবাব দিল। 'তা আপনি এলেন কি করে এখানে?'

পাতলা পলিথিনের ব্যাগে করে সিলভার-প্লেটেড একটা রিভলভার নিয়ে এসেছে পল। সেটা দেখিয়ে বলল, 'ক্লিফসাইড কান্ট্রি ক্লাবে বনের ভেতর পাওয়া গিয়েছিল এটা, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়। আমাদের ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট পরীক্ষা করে বলেছে, এটা মিস্টার মরগানের জিনিস। সে-জন্যেই আমরা এসেছি, মিস মরগানকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।'

'হ্যাঁ, এটা এখন ডায়নারই!' চেঁচিয়ে উঠলেন নরিয়েমা। অ্যারেস্ট করুন ওকে, অ্যারেস্ট করুন!'

'হুঁম্‌ম্‌, বুঝলাম,' মাথা দোলাল পল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'পুরানো অভিশাপ...একজন বৃদ্ধা মহিলা, তরুণকে গুলি...এবং একটা মেয়ে, যাকে তার নিজের রিভলভার দিয়েই গুলি করা হয়েছে...তারমানে...'

'...ব্যাপার আছে,' ফস করে বসল মুসা।

চোখ স্থির হলো পলের। 'হ্যাঁ, ব্যাপার আছে। লম্বা কোন গল্প।' খপ করে

হাত চেপে ধরল ডায়না আর নরিয়েমার। 'আপনাদেরকে থানায় যেতে হবে। সারারাতই থাকতে হতে পারে ওখানে।'

পলের কথায় বিশেষ কান নেই ডায়নার। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে তিনতলার দিকে। ঘন ধোঁয়া উড়ছে এখন ওখান থেকে। 'আমি যাব না···যেতে পারব না···!' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'ওর বাড়ি পুড়ছে তো,' বুঝতে পেরে বলল দ্বিতীয় অফিসার। 'দাঁড়াও খানিকক্ষণ। দমকল আসুক। দেখেই যাই, কি হয়।'

'দমকল!' বিরক্ত ভঙ্গিতে নাক কুঁচকালেন নরিয়েমা। 'ওদের বুদ্ধি তোমাদের মত হলে আর দেখতে হবে না! সারারাতই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে!'

হাতকড়া বের করল পল। দেখে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত নিয়ে গেলেন ডক্টর।

কমলা আগুন নাচানাচি শুরু করেছে প্রাসাদের ছাতে।

পাহাড়ের গোড়া থেকে ভেসে এল সাইরেনের শব্দ।

কিশোরের পেছনে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে রবিন। কিশোর তাকাতে বলল, 'না, কিছু না। শক পেয়েছি তো, সামলাতে সময় লাগছে।'

'তা লাগবেই।' রবিনের হাত ধরে কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার জন্যেই এখনও বেঁচে রয়েছি আমি।'

প্রাসাদের ছাতে আগুন বাড়ছে। বিষণ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ডায়না। কারও দিকেই নজর নেই তার।

*

জ্যাকেটের বোতাম এঁটে পিকআপের জানালা খুলে দিল মুসা। 'তাহলে কি জিনিস তোমার পছন্দ?'

'দেখো, মুসা,' কিশোর বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'আর যা-ই হোক, এই হ্যালোইন ক্যান্ডি অন্তত নয়। ওগুলো বাচ্চাদের খাবার। কতবার বলেছি, তোমার ইচ্ছে হলে খাও যত খুশি, আমাকে সাধাসাধি কোরো না। আমার ভাল্লাগে না।'

'ভাল, খুব ভাল।' স্টিয়ারিং ঘোরাল মুসা। অক্টোবরের চমৎকার বাতাস। মলের দিকে চলেছে ওরা। 'তোমাকে অন্য কিছুই কিনে দেয়া হবে। রবিন, তুমি?'

'আমার ক্যান্ডি খেতে আপত্তি নেই,' হেসে বলল রবিন। 'কিশোরের মত তো আর ওজন বাড়ার আতঙ্ক নেই আমার।'

পার্কিং লটে এসে গাড়ি রাখল মুসা। তিনজনেই নামল। এলিভেটরে উঠল শুধু ওরাই, আর কেউ নেই। চারতলায় এসে আস্তে করে থামল কোন ঝাঁকুনি ছাড়া।

'খবরদার, মুসা!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। দরজা খুলতেই এলিভেটরের অন্য পাশে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেছে সে। লাফিয়ে সরে এল মুসাও।

খাটো, টাকমাথা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে মেশিনগান নিয়ে। মুখে মুখোশ। 'চুপ!' ধমক দিয়ে বলল কিচকিচে কণ্ঠ, 'একদম নড়বে না!'

'এই, কি করছ?' লোকটার পেছন থেকে বলল এক মহিলা। ঠেলে লোকটাকে এলিভেটরে ঢোকানোর চেষ্টা করল। 'ওদের ভয় দেখাচ্ছ কেন? বাজার করতে এসেছে বেচারারা। দাঁড়াও, আজ বাড়ি গিয়ে নিই। পাগলামি তোমার

ছাড়াব ভালমত। খেলনা কেনার শখ বের করব!'

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসে হাসল তিন গোয়েন্দা।

'চিড়িয়া একেকটা,' হেসে বলল মুসা। 'পাগল যে কত আছে এদেশে! বাচ্চাদের মত ছিনতাইকারী সাজার শখ হয়েছে।'

'হ্যাঁ। আরেকটা জুভেনার।'

'যা-ই বলো, কিশোর, ওটা অনেক বেশি বড় পাগল। মিউজিয়ামের জিনিস ফেরত নেয়ার জন্যে কি কাণ্ডটাই না করল। যেন ওর নিজের জিনিস। ফিরিয়ে নিয়ে তারপর ছাড়ল।'

'ছাড়ল আর কই? মূর্তিটার জন্যেও কেস করে দিয়েছে ডায়নার বিরুদ্ধে। টাকা আদায় করে তবে ছাড়বে।'

'মেয়েটার জন্যে খারাপই লাগে। শেষ পর্যন্ত বাপদাদার বসতবাড়িটাও বিক্রি করতে হবে। ভাগ্যিস আগুনটা নেভাতে পেরেছিল দমকল বাহিনী। নইলে বিক্রির জন্যে ওটাও থাকত না।'

'কোনও চাকরি-টাকরি এখন পেলে হয়।'

'পাবে। পেয়ে যাবে। পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞাপন হয়েছে তো। টিভিতেও চান্স পেয়ে যেতে পারে। অনেক দিন দেখা নেই, ভাবছি দেখা করব...'

ইলেকট্রনিক্সের একটা দোকানের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা, তীক্ষ্ণ চিৎকারে থেমে গেল। দোকানের ভেতর টিভি চলছে, চিৎকারটা এসেছে ওটার ভেতর থেকেই। পর্দায় দেখা গেল, পাগলের মত মাথার চুল ছিঁড়ছে আর চেঁচামেচি করছে একটা মেয়ে।

'খাইছে! বলতে না বলতেই হাজির!' অবাক হয়ে বলল মুসা। 'চিনেছ? আমাদের ডায়না মরগান! সত্যি সত্যি অভিনয় শুরু করে দিয়েছে টিভিতে!'

ঘরময় ছোটাছুটি করছে ডায়না। চেঁচাচ্ছে, কাপ-প্লেট ছুঁড়ছে, চেয়ার উল্টে ফেলছে। হাতের কাছে একটা ফুলদানী পেয়ে সেটা নিয়ে তেড়ে গেল কাঁচুমাচু হয়ে থাকা খানসামার দিকে।

'একেবারে নিজের জীবনের ঘটনা,' কিশোর বলল। 'সে-জন্যেই এত জীবন্ত।'

'যা-ই বলো, ট্যালেন্ট আছে মেয়েটা। নাম করে ফেলবে।'

'খানসামাটি কে, চিনতে পেরেছ?' ভুরু নাচাল রবিন।

'আরে তাই তো, বার্ব এনুডা!'

দু'জনের অভিনয় দেখতে দেখতে হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'ঠিকই হয়েছে। যেখানে যাওয়ার কথা ওদের, ঠিক সেখানেই গেছে।'

এক পর্যায়ে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না কিশোর। হো হো করে হেসে উঠল। চমৎকার হাসির অভিনয় করছে ডায়না আর এনুডা। হাসল মুসাও। তারপর হঠাৎই যেন সংবিৎ ফিরল। 'আরে, দাঁড়িয়ে আছি কেন এখনও! চলো! চলো!'

একটা দোকানের দিকে ছুটল সে। হ্যালউইন ক্যান্ডি কেনার জন্যে।

***

ভলিউম ৫১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০